সাহিত্য অকাদেমি

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৬৪

সাহিত্য অকাদেমি
৩০, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলিকাতা ৭০০ ০২৯
২১ হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০০৬
১৭২, নইগাঁও ক্রস রোড, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

শ্রীসলিল কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত ও সাহিত্য অকাদেমি
নতুন দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মিলন

কাণ্ডারিয়া পাহাড়ের তরাইয়ে জন্মাষ্টমীর মেলা বসিয়াছিল। দেবতা স্নানের জন্য নূতন জলে ভরা বৃষ্টি দুপুরবেলায় থামিয়া গিয়াছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো মেঘ পুব দিকে চলিয়াছে। সূর্য পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে।

তরাই কয়েক মাস চুপচাপ থাকার পর আজ নানা সাজে সজ্জিত যুবক যুবতীর উচ্ছ্বাসে সরব হইয়া উঠিযাছে। কোথাও মনে হইতেছিল যেন আলগোঝা[1] বাজিতেছে। পাহাড়ের তলায় পুরানো শিবমন্দিরের ঘন্টা বাজিয়াই চলিয়াছে। কখনও কখনও দোকানীদের আওয়াজ কোলাহলের উপর দিয়া যেন সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

একে তো যৌবন স্বভাবতই চঞ্চল, তাহাতে আবার তাহা ভাসিয়া আসিযাছে মেলায়। পাড-ভাঙা নদীর জলের মতো এই যৌবন আজ উছলিয়া পড়িতেছে। কেহ চুড়ি কিনিতেছে, কেহ জরি-জড়ানো কাপড়ের দড়ি কিনিতেছে, গোছা গোছা কিনিয়া নিজেদের আলগোঝা জরি দিয়া সাজাইতেছে। কেহ নারিকেল কিনিতেছে, কেহ শুকনো পাহাড়ে প্রফুল্ল মনে বেড়াইতেছে। আর যাহারা এসব কাজে লাগে নাই, তাহারা সামনা-সামনি কাণ্ডারিয়া পাহাড়ের উপর স্থাপিত যোরী আর কালনোয়ী মাতাকে দেখিতে যাইতেছে। দুই পাহাড়ের মধ্যে লোকগুলিকে দেখাইতেছে যেন ঝুলন্ত পুলের মতো।

শিবমন্দিরের ঠিক সামনে আর একটি পাহাড়ের গায়ে দোলার কাছে, যতই দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, ততই শেষ মজা লুটিবার আশায় যুবক-যুবতীদের ভিড় বাড়িয়া চলিয়াছে।

পশ্চিম হইতে আগত গানের লহরী ও গম্ভীরনাদী আলগোঝের শব্দ কাহারও কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। অনেকে মন্তব্য

১ আলগোঝা একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র।

করিতেছিল, 'মনে হচ্ছে যেন মাটি ফেটে যাবে।' কেহ কেহ হাসিয়া বলিতেছিল, 'বেলা তো হয়ে এল, এখন আর মিছিমিছি এলে কেন?' আর একজন উত্তর দিল, 'এরা হয়তো অনেক দূর থেকে এসেছে।' সঙ্গের একজন বলিল, 'যদি এদের ধুলো-পায়েই ফিরতে হয়, তাহলে আসার কি দরকার ছিল?'

কিন্তু চারটি যুবতী ও পাঁচটি যুবক মিলিয়া একটি দল—উহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিচিত্র। অল্পক্ষণের মধ্যে কেনাকাটা সারিয়া পাহাড় দুইটি ঘুরিয়া যাইবে, সে চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা নাগরদোলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চুপিচুপি উহাতে চড়িবার পরামর্শ করিয়া লইল। দলের মধ্যে চারজন এমন ছিল যাহাদের দোলায় উঠিলেই মাথা ঘোরে, এজন্য বাকি পাঁচজন—তিনটি যুবক ও দুইটি যুবতী দোলনায় চড়ার জন্য তৈরি হইল। দলের মধ্যে যে যুবক প্রথমেই সহজে আসন পাইল, সে প্রায় দশ সের ওজনের মোম দেওয়া কাপড়ের এক ছাতা একটি যুবতীকে দিতে দিতে বলিল, 'ওরে কালী, এই ছাতাটা একটু সামলে রাখিস।' পরে বলিল, 'দোলা থামলেই টপ্ করে লাফ দিয়ে উঠবি, নয়তো থেকে যাবি।' তারপর তাহার দিকে তাকাইয়া আছে এমন যুবতীদের বলিল, 'তোমরা কি মনে করেছ, কাণজী ভাই বসিয়ে দেবে আর আমরা বসে পড়ব, না—সে আর আজ হবে না।' তাহার পর সাথী যুবককে বলিল, 'কি রে হীরা?'

'একদম ঠিক। যদি সমস্ত দিন যাবার ইচ্ছে থাকত, এই ভিড়ের দিনে কি দিন শেষ হওয়ার আগে উঠতে পারতে?'

'তখনই বলেছিলাম, মেয়েরা, একে তো দেরি হয়ে গেছে, আর আমাদের আশায় থেকো না। তাতেও মানলে না। কাজেই মেলার মজাটা টের পাও।' এই বলিয়া কাণজী হাসিতে লাগিল।

কাণজীর বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তাহার শরীরের গড়নটা এমন যে তাহাকে পাঁচহাতি তাগড়াই জোয়ান বলা চলে। বড় বড় চোখ দুটিতে যেমন হাসির ঝলক লাগিয়া আছে তেমন উদাসীনতাও দেখা যায়। পায়ে আড়াই সের ওজনের নাল দেওয়া ফুঁদলা লাগানো জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, রঙদার কামিজ, তাহার উপর সাদা কোট, মাথায় গোলাপী জরিওয়ালা পাগড়ী। পাগড়ীর বাঁধনটা কিছুটা বিচিত্র। তাহাতে কলগী বাহির করা

—তাহা শুধু সেই জানিত। কোটের উপর জড়াইয়া বাঁধা নূতন জরিতে সুশোভিত আলগোঝের জরি কোটের পকেটে ঢোকানো। নূতন জরিতে সুশোভিত আলগোঝের উপর খোদাইয়ের ঢংয়ে যেন তাহার ভালবাসা ফুটিয়া উঠিতেছিল। কতকগুলি যুবক আলগোঝের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল—দুচার জনের মনে হইতেছিল, 'ভাই, বাজিয়ে দেখ আওয়াজটা কি রকম শোনা যাক।'

এতক্ষণে দোলা থামিয়া গিয়াছে। কাণজী দুইটি যুবতীর হাত ধরিয়া তুলিয়া সামনের দিককার আসনে বসাইয়া দিল। হীরার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তুমি এখন নিজেকে সামলাও—আর কোন চিন্তা নেই।'

কিন্তু একথা বলিবার পরও সে কোমল-স্বভাবের মনোরকে প্রথম সুযোগ দিল। নামিয়া আসা দোলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, 'ওহে হীরা, শেষ আসন রক্ষা কব, বুঝলে?' তারপর হাত তুলিয়া খাড়া হইয়া গেল। আসনে বসা দুই যুবতীর মধ্যে একজন যেই উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি তাড়াতাড়ি, 'ও হীবা বস, না হলে থেকে যাবি' এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িল। অপর যুবতী নাচে নামার আগেই ও ভিতরে আসিয়া বসিয়া পড়িল কিন্তু সে দেখিল অপব যুবতী, 'ওরে মণি, আব একবাব চক্কব লাগা, নেমে পড়ছিস্ কেন?' এই কথা বলিতে বলিতে ভিতরেই রহিয়া গেল। খুব জোবে আসনের ডাণ্ডা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকা হীরা হাঁ করিয়া রহিয়া গেল। নামিয়া পড়া মণি কতকটা চোখে, কতকটা মুখে বলিল, 'আবার কি? আগেই বলা উচিত ছিল। তুমি একাই থাক।' এইরূপঃবকিতে লাগিল। ওদিকে দোলাওয়ালা, 'পয়সা বার করো, জল্‌দি করো' বলিতে বলিতে হাত বাড়াইল। আসলে যুবতীটি 'হায়, আমার কাছে তো··· ওরে পয়সা দেত' এই কথা বলাতে কাণজী দোলাওয়ালার হাতে দুইটি পয়সা দিয়া দিল।

এক ঝাঁকানিতে আসন উপরে উঠিয়া গেল, হীরা আর মণি নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাণজীর আসনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল— দোলার গতি ধীরে ধীরে বাড়িল।

কাণজার কাছে বসা যুবতীটি বলিল, 'আমি নীচে নেমেই তোমার পয়সা দিয়ে দেব, কেমন?' কাণজী বলিতে চাহিয়াছিল যে যখন টাকা দিয়াও

পাশে বসার লোক পাওয়া যায় না, তখন পয়সার মূল্য কি? কিন্তু সে এসব কিছু না বলিয়া শুধু বলিল, 'পয়সা কি তোমার চেয়ে বড়?'

দোলা পুরা বেগে ঘুরিতে লাগিল। আসনে-বসা যুবতীরা গান করিতেছিল, কেহবা আলগোঝা বাজাইতেছিল। নীচে দাঁড়াইয়া মণি 'ওরে জীবী' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল কিন্তু জীবীর মন এ সময়ে যেন অন্য কোন জগতে ছিল। কাণজীর চোখে চোখ পড়িতেই সে প্রথম দৃষ্টি সামলাইয়া লইল, দ্বিতীয়বার কিন্তু সে নিজেই তাকাইয়া রহিল, আর হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এই যে আলগোঝা তুমি গুঁজে রেখেছ, ওকি বাজাবার জন্য?' সে উত্তর দিল, 'আগে দেখাবার ও পরে বাজাবার জন্য।' এই বলিয়া কাণজী আলগোঝা মুখে লাগাইল, অভ্যস্ত গানের দুইটি লাইন বাহির করিল, 'ফাল্গুনের বাতাসে আসা যৌবন বৈশাখের বাতাসে উড়ে যায়।'

পরে আলগোঝা বন্ধ করিয়া জীবীর দিকে তাকাইয়া কাণজী বলিতে লাগিল, 'কিছু বুঝেছ, না বোঝনি?' জীবী বুঝিয়াছে কিনা তাহা সে-ই জানে, কিন্তু সে কাণজীকে আড়চোখে দেখিল। সে চোখে কি ছিল কাণজী তাহা বুঝিতে পারিল না কিন্তু একথা অবশ্যই বুঝিল যে দৃষ্টির আদান প্রদান তাহার ভিতর হইতে কিছু তুলিয়া লইয়াছে এবং তাহার বদলে কিছু রাখিয়াও গিয়াছে। দুজনেই দুজনকে দেখিল, তাহার পর চার চোখই নত হইয়া গেল। তখন মনে হইল দুজনারই ঠোঁট সেলাই হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ের গতিও বদল হইয়া গিয়াছে।

পুরা তেজে ঘুরিয়া দোলার গতি মন্দ হইয়া আসিল। জীবীর পর কাণজী নীচে নামিল, কিন্তু নীচে নামিয়াছে সে বিশ্বাস তখন হইল যখন আসনে বসা হীরা বলিল, 'কিহে কাণজী, এখন থেকেই?' কিন্তু আর কি হইতে পারে? সব জায়গা তো ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জায়গা থাকিলেও সে আর বসিত না। স্বর্গে আসিলে যে রকম আনন্দ, স্বর্গ হইতে নামিবার দুঃখও তেমন ছিল।

চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকা কাণজীর কানে মধুর ধ্বনি প্রবেশ করিল, 'এই নাও তোমার পয়সা।' এই কথা বলিতে বলিতে জীবী হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কাণজী বিরক্তি ভরা চোখে জীবীর দিকে তাকাইল, আর

হাসিয়া বলিল, 'রেখে দাও। ধরে নাও তুমি যেন একলা আমার হয়েই বসেছ।'

জীবী কোন ঝঞ্ঝাট না করিয়া হাতটা সরাইয়া লইল কিন্তু তাহাদের পাশেই মণি দাঁড়াইয়া ছিল, সে না বলিয়া পারিল না, 'ওহে যার সঙ্গে আগে থেকে জানাশুনা নেই, এ রকম লোকের পয়সা কি রাখা যায়?' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাণজীর দিকে তাকাইল।

'জানাশুনা না থাকলে এর পয়সা ফেরত দিতে আমার দিকে হাত কি করে বাড়াল'—এই বলিয়া একটু হাসিয়া কাণজী জীবীর দিকে আড়চোখে তাকাইল, তাহার বিবাহের চিহ্নহীন হাতের দিকেও তাকাইল।

'আরে রেখে দে, নেবে না ত চল্' এই কথা বলিয়া মণি জীবীকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দিল। চলিতে চলিতে বলিল, 'এই পয়সা নিয়ে খেয়ে নিবি, আবার কি—'

'চল্, চুপ করে থাক্।' এই কথা বলিতে বলিতে জীবী পিছনে ঘুরিয়া কাণজীকে দেখিল।

যতদূর দেখা গেল কাণজী জীবীর দিকে তাকাইয়া রহিল। পাশে দাঁড়াইয়া কালী ও অন্য যুবতীরা কখনও পরস্পরকে দেখিয়া কখনও বা কাণজীকে দেখিয়া হাসিতেছিল, যেন বলিতেছে, 'জানি না এর মধ্যে কি মজা আছে যে কাণজী ভাই এক দৃষ্টে তাকাচ্ছেন।'

দোলা হইতে নামিয়া হীরা কাণজীর কাছে আসিয়া বলিল, 'এখন যদি পাহাড় দর্শন করতে হয় তা হলে আবার যাব।' আর ঈশান কোণের মেঘের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'মনে হচ্ছে রাস্তার মাঝেই বৃষ্টি এসে পড়বে।' 'এরকম না হলে মেলার পুরো মজা কি করে পাবে?' এই বলিয়া কাণজী যুবতীদের মেলার দিকে তাকাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

দুই পাহাড় ঘুরিয়া নীচে আসিতে আসিতে সূর্যও পুরোপুরি অস্ত গেল। উঠিয়া যাইবার সময়কার মেলার শব্দ বাড়িয়া গিয়াছিল। কাণজী বলিল, 'এস শেষবারের মতো একবার ঘুরে নি।' এই বলিয়া বাজারে ঘুরিতে বাহির হইয়া পড়িল।

গাড়িতে জোড়া বলদের মতো কাণজীর সব সময়ের সঙ্গী হীরা, জানা যায় না কি করিয়া, কখনও কখনও পিছনে থাকিয়া যাইতেছিল। কাণজীকে

এদিক ওদিক ঘুরিতে দেখিয়া হীরা বলিয়া ফেলিল, 'আমরা ত পিছনে পড়ে গিয়েছি, তুমি আগে আগে কি খুঁজছ ?' কাণজী হাসিয়া শুধু এই কথা বলিল, 'আমি মনে করেছিলাম তুমি আগে বেরিয়ে পড়েছ।'

উত্তরাইয়ের দুদিকেই জনস্রোত আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে আলগোঝার স্বরলহরী অথবা গানের রিমঝিম শব্দ ছিল না। কাণজীর দলও চলিতে লাগিল। তাহারা মেলার সীমা প্রায় ছাড়াইয়াছে এমন সময়ে কাণজী হঠাৎ থামিয়া গেল। 'ও হে, আমি ত ভুলেই গিয়াছিলাম যে বৌদি রত্নীর জন্য চুড়ি চেয়েছিল। তোমরা এগোও—আমি এলাম বলে' এই বলিয়া সে পিছনে সরিয়া গেল।

হীরা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল কাণজী তাহাকে এই প্রথম ছাড়িয়া যাইতেছে। তাহার পিছনে পিছনে যাইবার কথাও মনে আসিল কিন্তু তাহার মনে ভয়ও ছিল যে যদি সম্পূর্ণ দলকে—বিশেষতঃ মেয়েদের ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে কাণজী তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে। রাগতভাবে সে কাণজীকে চেঁচাইয়া বলিল, 'দেখ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো—আমরা সেই ঝরণার ধারে বসব।' আর মনে মনে বলিল, 'বৌদিদিই ত আসল। দু-আনা পয়সা দিয়েছে, তাতেও 'ছোট মেয়ের জন্য চুড়ি এনো।'

অপর একজন বলিল, 'এ রকম বাড়িতে কাণজীভাই-ই থাকতে পারে, আমার মতো লোক এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারত না।' হীরা বলিল, 'কী করে ? বুদ্ধিমান লোককে সবই সইতে হয়—তা না হলে তার বড় ভাই কি জানে না যে সেও অর্দ্ধেক অংশের মালিক। কিন্তু সে বেচারার জন্যে যদি সে ভাল মন্দ কিছু বলে তো বৌও বাপের বাড়ি চলে যাবে, আর মশলা পেষা, কুটনা কোটা, ধান ঝাড়া সবটা পুরোপুরি তাকেই করতে হবে।' কালী বলিল, 'কিন্তু এসব ততদিন চল্‌বে যতদিন কাণজীভাই সহ্য করছে, বিরক্ত হচ্ছে না। কিন্তু যদি সে রেগে যায়—তাহলে দাদা-বৌদি সবাইকে লোকসান সইতে হবে।'

হীরা বলিল, 'কাণজী যদি এরকম করে তবে ত। এরপর আবার কাণজীর দাদা এবং বৌদি তার বিয়ের কিম্বা তাকে ধরে রাখবার মতো কিছু চেষ্টা করছে না। এত সবে শুরু—পরে হয়ত এর ভাগের পাওনা

দেবে না।' এইভাবে নানা রকমের মনগড়া কথা বলিয়া তাহারা কাণজীর প্রতীক্ষা করিতে ঝরণার ধারে বসিয়া পড়িল।

ঈশান কোণ হইতে ওঠা কালো মেঘ আকাশের মাঝখান পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। মেঘগুলিতে ঢাকা পড়িয়া যাইবার ভয়ে সূর্য যেন তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ অস্ত যাইতেছিল। হীরা বলিল, 'আট ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হবে—এপর্যন্ত কাণজীর পাত্তা নেই।'

মনোর বলিল, 'আমাদের কাছে ছাতা আছে—কোন কষ্ট হবে না। আসল মজা এ'রা চারজনেই টের পাবেন।' 'তা তারাই জানে—তুই নিজের ছাতা খুলিস নি।' 'আমাদের জন্য ত কাণজী ভাইয়ের একটা ছাতাই যথেষ্ট' এই বলিয়া কালী মনোরের কাছে কাণজীর ছাতাটা দেখাইয়া দিল। মনোর বলিল, 'তোমাকে যদি দিয়ে ফেলে তা হলে সে নিজে কি করবে?'

কালী বাঁকা চোখে তাকাইয়া বলিল, 'তার জন্য তোমার ভাবনা কেন? তুমি নিজের ছাতার নীচে বেঁচে যাবে—কোন কুকুরও তার নীচে আসবে না।'

মনোর উত্তর দেওয়ার আগেই হীরা বলিল, 'নাও, চল, ওঠ, ঐ সে আসছে।' 'হাঁ, হাঁ, কাণজীই—চল, ও এসে পড়বে।'

ওরা কিছু দূর গিয়াছে, ইতিমধ্যে কাণজী আসিয়া পৌঁছাইল। সেই রকম আগে চলিতে চলিতে হীরা বলিল, 'চল, একটু জোরে চল। ওহে কাণজীভাই, চুড়িগুলো একটু দেখিয়ে দাও।' 'কতগুলো এনেছ?' কালী জিজ্ঞাসা করিল।

'এখন চলত, পরে দেখাব। এখন একটু পা চালাও।' কিন্তু যখন হীরাও তার সঙ্গে চলিতে পারিল না তখন বলিল, 'কিন্তু অত তাড়াতাড়ির কি আছে? রাত হয়—আমরা তো আছি—কোন গাছের উপর ত থাকতে হচ্ছে না।'

পিছনে যাহারা কষ্ট করিয়া আসিতেছিল তাহাদের মধ্যে এক যুবতী বলিল, 'এরকম তাড়াতাড়ি কাণজী আসবার সময়ে ত করেনি।' 'ভাল মানুষের ত অনেক বাধা দেবার লোক আছে' এই কথা কালী ব্যঙ্গ করিয়া বলিল। এ রকম কেহ ছিল না যে কথাটা বুঝিতে পারে।

কাণজী একটু আস্তে চলিতে থাকিল কিন্তু তাহার চোখ আগের মতোই জোরে দৌড়াইতেছে, কথা বলিবার মতো অবস্থা ছিল না। আবার সে বলিয়া ফেলিল, 'কতকদূর জোরে চল, আবার আস্তে আস্তে চল্‌ব।'

হীরাও উহাতে কিছু রহস্যের সন্ধান পাইল, বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ পা একটু জোরে চালানই উচিত' এই কথা বলিয়া কাণজীর চেয়েও জোরে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তা লোকে ভর্তি ছিল। কোন দল জোরে চলিতেছে, আবার কোন দল মজা করিতে করিতে যাইতেছে, কেহ কেহ বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়া আছে, আর কতকগুলি লোক নিজেদের কেনা বেচা, ঘোরা ফেরা প্রভৃতি বিষয়ে বলা কওয়া করিতেছে।

ইহাদের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কাণজীর দৃষ্টি দূরে দুইটি বালিকার উপর পড়িল। সে মনে মনে বলিল, 'তারাই যাচ্ছে। তারা ছাড়া আর কেউ এরকম পিছন ঘুরে দেখতেই পারে না।' বুঝিতে না বুঝিতে তাহার অধীরতা বাড়িয়া গেল। এই বয়সে কাণজীর কোন কোন যুবতীর সহিত পরিচয় হইয়া থাকিতে পারে, কাহারও কাহারও উপর অনুরাগও হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু আজকার মতো বুদ্ধিবিবেচনা ভুলাইয়া দিবার মতো ব্যাপার কখনও হয় নাই।

কোলাহল করিতে করিতে যাওয়া সেই দুই তরুণীর কাছে আসিতেই তাহার গতি ধীর হইয়া পড়িল। পিছনে একটু তাড়াতাড়ি আসিতে আসিতে মনোর জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে কাণজী, অত পিছনে পড়েছ কেন?' কাণজীর আগেই হীরাই বলিয়া উঠিল, 'তাঁরা যে পিছনে আসছেন, তাঁদের জন্যই ত।' তাহার পর জোরে চেঁচাইয়া বলিল, 'ওগো মেয়েরা, একটু পা বাড়াও, এ রকম বরযাত্রীর চালে হাঁটলে তোমাদের চলবে না।' ইতিমধ্যে কাণজী আড় চোখে জীবীকে দেখিয়া লইল। কিন্তু মণি চুপি চুপি বলিল, 'লোকের সঙ্গলাভ করাই খারাপ, যদি ভাল না হয় তা হলে মাঝ পথেই ছেড়ে চলে যায়।' 'কি হে তোমার সঙ্গে এমন কিছু হয়েছে কি?' আগে আগাইয়া হীরা ধীরে ধীরে বলিল।

'ঐ রকম হয়েছে, তবেই ত। দেখছ, আমার সঙ্গে যাবার কি কেউ আছে?' এই কথা বলিয়া মণি জীবীর দিকে তাকাইয়া মনে হইল যেন

জিজ্ঞাসা করিল, 'কিহে, ঠিক আছে ত?' 'ওহো, ওরকম দুঃখ করছ কেন? চল আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি' এই বলিয়া কাণজী জীবীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'কিন্তু পরে আমাকে মাঝখানে ছেড়ে যাবে না এ কথা যদি স্বীকার কর তবে—'

মণিকে একটু ধাক্কা দিয়া জীবী বলিল যে, 'চলতে হয়ত চল। রাস্তার পরিচয়ের কি মূল্য?'

কাণজী এ কথার উত্তর না দিয়ে থাকিতে পারিল না, 'আরে, একবার সঙ্গলাভ করে দেখে নাও। এরপর মাঝখানে যদি ছাড়ি তা হলে বোলো। কি হে হীরা, বল।' হীরা হাঁ-তে হাঁ মিশাইয়া দিল। 'কিন্তু আমি ত এই কথাই বলছি—চল, যদি সঙ্গ দিতে হয় তো পা বাড়াও।'

মণি বলিল, 'পা ত বাড়াব কিন্তু বাড়ি জিজ্ঞাসা করে নিয়েছ ত' 'যদি বাড়ি থাকে তবে ত জিজ্ঞাসা করব।'

কাণজী বলিল, 'চুপচাপ এগোও।'

মণি বলিল, 'জানি না ক'জন লোক এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে।' এই কথা বলিয়া নাটুকে ভঙ্গীতে অগ্রসর হইল।

কাণজী মণিকে বলিল, 'তুমি কি নিজের মনে এই ভেবে চলেছ যে বাড়ি গিয়ে জল না খাওয়াতে হয়? কিন্তু ভাই এরকম জোর করে জল খাওয়ার জন্য এ জায়গায় বাজে লোক কে বসে আছে? তুমি তো নিজের ঘরে ছাদের নীচে ঢুকে যাবে, আর আমাকে আরও সাত ক্রোশ যেতে হবে।'

জীবী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কোন্ গ্রাম?'

'উধড়িয়া। কখনও দেখেছ?' হীরা জিজ্ঞাসা করিল।

মণি বলিল, 'উধড়িয়ার লোক? এ জন্যই তোমাকে উধড়িয়ার মতো (ধার করে কাজকরা লোকের মতো) মনে হচ্ছে।' 'কিন্তু তোমার কি জানা আছে-যে দিন হিসাবে কাজ করালে চাঁদও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। চলো ধারে কাজ করা লোক পাওয়াতে দুজনের একটু শান্তি ত পাওয়া গেল!'

কাণজী আগের কথাটা মণিকে বলিল কিন্তু আজেবাজে কথা বেশিক্ষণ বলা চলিল না, রাস্তার জীবীর গ্রাম আসিয়া পড়িল। মণি বলিল,

'আবার এসো। যদি কখনও দেখা হয় তা হলে মনে রেখো।' এই কথা বলিয়া বিদায় দিল কিন্তু জীবী না বলিয়া থাকিতে পারিল না, 'গ্রামে চল না, কিছু ফলার কর বা না কর একটু জল ত খেয়ে যাও।'

'আজ জলের কি অভাব আছে?' এই বলিয়া কাণজী একটু হাসিল কিন্তু সে হাসিতে কোন প্রাণ ছিল না।

'তবে একটু তামাক খেয়ে যাও।'

কাণজীকে এদিক ওদিক তাকাইতে দেখিয়া বলিল, 'দেরি হবে না— পাশেই আমাদের বাড়ি।'

'ভাল কথা', এই বলিয়া কাণজী মনোরকে বলিল, 'তোমরা এগিয়ে যাও—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ছিলিম তামাক খেয়ে আসছি।'

কালী মুখ ভেংচাইয়া বলিল, 'শিগ্‌গির ফিরো। বড় ছিলিম খানেওয়ালা হয়ে গিয়েছ?' কথাটা বলিয়া আড়চোখে কাণজীকে দেখিতে লাগিল।

'এই এলাম বলে' এই কথা বলিয়া কাণজী অগ্রসর হইল ওদিকে মণি আর জীবীর মধ্যে টানাটানি চলিতেছিল। জীবী যখন নিজের দিকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল তখন মণি বলিতেছিল, 'এরা আমার জাতের লোক—কাজেই এদের আমার কাছে আসা উচিত।'

শেষে জীবীরই জিত হইল। গ্রামের কিনারাতেই ছিল জীবীর বাড়ি— ঢোকামাত্র মাথায় ধাক্কা লাগে এরকম দালানের ভিতর চৌকির উপর বসিয়া জীবীর বাবা হুঁকা খাইতেছিল। গর্তে ঢোকানো একটা মোটা কাঠ হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ছাড়াছাড়ি হইবার সময় জীবী মণিকে কিছু বলিল আর 'দেখ শীগ্‌গির এসো' এই কথা বলিয়া দালানের দিকে ঘুরিল, দেয়ালে খাড়া করা খাটিয়া বিছাইয়া দিয়া বলিল, 'বস।'

'কে ভাই তুমি?' এই বলিয়া বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

জীবী বলিল, 'বাবা, ইনি হচ্ছেন উধড়িয়ার প্যাটেল—মেলা থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন—এঁকে আমি তামাক খাওয়ার জন্য ডেকে এনেছি।'

বাপ বলিল, 'বেটি, ডাকাই উচিত—ঘর বেঁধে বসে আছ—তামাকও যদি না খাওয়াও তাহলে মানুষ জন্ম কিসের জন্য?' এই বলিয়া হুঁকাটা

রাখিয়া দিল।

'থাক্—আমার কাছে আছে'—কল্‌কিতে তামাক ভরিতে ভরিতে হীরা বলিল। কাণজী আস্তে আস্তে হীরাকে বলিল, 'তবে ওটাই থাক্'। 'ঠিক আছে—তোমার কাছে ত থাকবেই'—বুড়ো বলিল। 'কিন্তু ভাই, আমার বাড়িতে এসে এরকম বারণ করা উচিত নয়।'

ইহার পর বৃদ্ধ কথা আরম্ভ করিল। 'উধড়িয়াতে বাড়ি বললে—তুমি কার ছেলে?' এইসব জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিল, 'যতদিন তোমার গাঁয়ে ভগা খাওয়াস্ বেঁচে ছিলেন ততদিন আমি তোমার গ্রামে প্রায়ই যাওয়া আসা করতাম, পরে যখন উনি মারা গেলেন তখন থেকে যাওয়া আসা কমে গেল। ওত ছেলেমানুষ কিন্তু ভগা খাওয়াস ত ভগা খাওয়াসই ছিলেন ভাই।'

কথাবার্তার সময়ে কাণজীর চোখ ও কান পিছনদিকেই রহিয়াছে। জীবীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে বুঝিয়া লইল। সে হীরাকে ইসারা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আচ্ছা তুমি বস, আমি চলি।'

''এখনই? কখন পৌঁছবে ভাই? আজ এখানে থেকে যাও, দুঘণ্টা গল্পগুজব করব। যদি তাড়াতাড়ি থাকে তা হলে কাল খুব সকালেই চলে যেয়ো।'

'না, না, আমার বন্ধুবান্ধবেরা চলে যাচ্ছে, আর সঙ্গে মেয়েরাও আছে—এর জন্যই—'

জীবী বলিয়া উঠিল, "আমি যে চা করছি তার কি হবে?'

'ভালই ত, অষ্টমীর ব্রত হবে। যখন এসে পড়েছ তখন চা খেয়ে যাও। আপনার লোকেরা ত মধ্যে মধ্যে এসেই থাকেন, কিন্তু অনাত্মীয় আমার বাড়ি কেন আসবে?'

'কিন্তু এ অসময়ে দুধ কোথায় পাওয়া যাবে? বিনা ঝঞ্ঝাটে কি কিছু হয়?'

কাণজীর কথার মধ্যে জীবী বলিয়া উঠিল। 'এ সব তোমার দেখার কথা, না আমার? বস, বেশি দেরি হবে না।' কাণজীকে বসিতেই হইল।

জীবী বাহিরের বৈঠকখানায় চুলা সাজাইল। কাঠ আনিয়া তাহাতে

আগুন ধরাইয়া দিল। ইতিমধ্যে মণি দুইটি ঘটি লইয়া হাজির হইল, একটিতে জল, অন্যটিতে দুধ। একটু পরেই চা হইয়া গেল।

কাণজীর কিন্তু চা খাইতে কিছু দেরি লাগিল। ঘরের ভিতর হইতে কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠে স্তিমিত কেঁউ কেঁউ শব্দ উহার তীক্ষ্ণ কানে ধরা না পড়িয়া রহিল না।

চা খাইয়া বৃদ্ধকে 'রাম রাম' করিতে করিতে দু'জনে উঠিল। মণি ও জীবী তাহাদের বিদায় দিতে উঠান পর্যন্ত আসিল। ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় কাণজী ও জীবীব চোখাচোখি হইল। যাইবার পূর্বে মণির দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'চা ত খাইযে দিয়েছ কিন্তু একথা কখনও ভুলে যেও না যে যদি কখনও সময় আসে ত তোমাদেরও চা খেতে হবে।'

জীবী বলিল, 'দেখো নিজেকে যেন ভুলে যেয়ো না।'

'ভাল, দেখব' এই বলিয়া কাণজী রওনা হইল।

ইহার পর মণি 'যদি জল আনতে যেতে হয় ত বল। আমি কলসী নিয়ে আসছি—'এই বলিয়া চলিয়া গেল। জীবী তখন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া কাণজীকে একদৃষ্টে দেখিতেছিল।

সোজা রাস্তায় না গিয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে কাণজীর পাগড়ীর পিছন দিকে ঝুলিয়া পড়া অংশটি যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ জীবী দাঁড়াইয়া রহিল কিন্তু যখন সে চোখের আড়াল হইয়া গেল তখন নিজের এই অশোভন আচরণ সম্বন্ধে তাহার হুঁস হইল। একটি দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সে বারান্দায় আসিল। ক্ষেতের দিকে আর একবার তাকাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অদৃশ্য প্রভাব

জীবীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া কাণজী ও হীবা বৃষ্টির জন্য বনের চক্রাকার দীর্ঘপথ ত্যাগ করিয়া সোজা রাস্তা ধরিল। কাণজী যদিও আগে আগে চলিল, হীরাই পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। পথের কথা ভিন্ন দু'জনেই চুপচাপ।

অস্তমান সূর্যের কিরণ নিষ্প্রভ হইযা আসিল। আকাশে মেঘের ছায়া নামিয়া আসিল। সুদূর দিগ্বলয়ে ঘন ঘোর শব্দ আরম্ভ হইল। কিন্তু উটের মতো এত বেগে ইহারা চলিতেছিল যে উহাদের এ সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হইলেও উহারা ইহা গ্রাহ্য করিল না।

পথে চলিতে চলিতে হীরা বলিল, 'নাপিতের মেয়ে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার!'

'হীরা, জাতে তো কারো দাম ঠিক হয় না। মানুষের দাম তার চোখ দেখে বোঝা যায় না।'

"নিশ্চয়ই, তা না হলে মণিও তো আমাদের জাতেরই না?' হীরার এই কথায় কাণজীরও আপত্তি ছিল। উহার মনে হইল যে এই ব্যাপারে মণির দোষ ধরা অপেক্ষা প্রশংসা করাই উচিত, কিন্তু এ সব ঝামেলারি মধ্যে না পড়িয়া 'হুঁ।' বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

জাতের সভায় বা মেলায় লোকের কত চেনাজানা হয়, আর সেই চেনাজানার কোনও গভীর তাৎপর্য নাই। আজ কাণজী কিছু বলিতেছিল না। হীরাও সাহস পাইল না। অপরপক্ষে এই মৌনভাব হীরার ভাল লাগিতেছিল না। সে বলিল 'এ রকম চুপচাপ চলার চেয়ে বরং বাজাও, কিছু রাস্তা তো কেটে যাবে।' 'বিরক্ত হচ্ছ কেন? নাও, বাজাও না?' এই কথা বলিয়া কাণজী হীরার সামনে বাজনা আগাইয়া দিল। 'আমি যদি চলতে চলতে বাজাতে পারতুম তবে আর আমার বিরক্ত হওয়ার কি ছিল? তুই-ই বাজা—এরা শুনলে এদেরও আনন্দ হবে।' কাণজী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, 'কাদের কথা বলছ?'

'কেন, কাদের আবার? এরা আমাদের গাঁয়ের লোক। এখনও হয়তো বেশি দূর যায়নি,' হীরা বলিল। কাণজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

আসিবার সময় সমস্ত পথ ধরিয়া যে কাণজী বাঁশী বাজাইয়াছিল এখন কিন্তু তাহার দু'একটা ফুঁ দিতেও যেন ক্লান্তি আসিতেছিল। বলিল, 'মরুক গে। এখানে কাকে বাজিয়ে শোনাব?'

'তবে এতদিন কাকে শোনাবার জন্য বাজাতে? যাবার সময় তো এক মুহূর্তের জন্যও বাঁশী মুখ থেকে আল্‌গা করনি।'

'তবে একথাও ঠিক যে যত উৎসাহ নিয়ে লোক মেলায় যায় তত উৎসাহ নিয়ে কমই ফিরে আসে।'

এ কোনো কাজের কথা নয়। হীরা বলিয়া উঠিল, 'আজ তোর কিছু হয়েছে। নইলে অন্য অন্য বার তো বেশ উৎসাহ নিয়েই ফিরেছিস।'

'হয়ত হবে। হয়ত তুমি যা মনে করছ তাই,' বলিয়া কাণজী হাসিল।

যদিও হীরা এই কথাকে এইখানে শেষ হইতে দেওয়ার লোক নয়, তবুও উহার কানে 'ওরা এসে পড়েছে, চল ওঠ' ওই আওয়াজ আসিতেই চুপ করিয়া গেল।

সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে —মনে হইল বর্ষণ শুরু হইবে।

হাওয়ায় এক ঝাপ্‌টা আসিল। দ্বিতীয় ঝাপ্‌টার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যুবতারা যুবকদের এক এক জনের ছাতার নীচে নিজেদের স্থান করিয়া লইল। এই ভাবে অর্ধেক ভিজিয়া বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে পথ দেখিতে দেখিতে চা পান করিবার জন্য পিছনে পড়িয়া থাকা কাণজী ও হীরা সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া অনেক রাত্রে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। ততক্ষণে বৃষ্টিও শেষ হইয়াছে।

উধড়িয়া গ্রাম একটা বড় টিলার উপর। গ্রামের অধিকাংশই প্যাটেলদের বাস। প্রতি সারিতে আট হইতে দশ ঘর। এ রকম তিন সারিতে মিলাইয়া প্রায় চল্লিশ ঘরের বসতি। গ্রামের আশে পাশে ঠাকুরদের (যাহারা প্যাটেলদের চেয়েও ছোট সেই সব জাতের) কুড়িটি কুটির ছিল। গ্রামে ছিল এক মুদির দোকান। নিকটের এক গ্রামে ব্রাহ্মণের ঘরও ছিল। ইহা ব্যতীত নাপিত, দর্জী, কামার, কুমারও এক এক ঘর ছিল। এই ভাবে

উখড়িয়া গ্রাম আশ-পাশের গ্রাম অপেক্ষা বড় গ্রাম বলিয়া ধার্য হইত।

চড়াইয়ের দিকে গ্রামের পথ শুরু হইতেই হীরা কালীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'ভগবান তোমাকে মেয়ে মানুষ কেন করেছিল? গ্রামের কাছে এলে যদি তো একটা গান গাও।'

'হাঁ লোকে জানবে কি করে যে তুমি মেলায় গিয়েছিলে?' কাণজী সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবকেরা 'জো হুজুর' করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, হাঁ, গাও। নয়তো তোমার লজ্জা ঢাকবার জন্য আমাদেরই গাইতে হবে।' যুবতীদের, বিশেষ করিয়া কালীকে—ইহার বেশি বলিবার প্রয়োজন ছিল না। দুইজনে মিলিয়া গাইতে লাগিল, 'আমরা মেলায় গিয়েছিলাম মজা করবার জন্য। আহা বনভূমি কত উৎফুল্ল।' কিন্তু দুই বা তিন পঙ্ক্তি গাহিতে না গাহিতে গ্রামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট একটি কুটির হইতে একজন আধা বয়সী লোক 'মেলায় যারা গিয়েছিলে তারা এসে গেলে নাকি?' বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। পিছনে দু'চারজন যুবকও আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ আধা-বয়সী লোকটি কাণজীর নিকট আসিয়া বলিল, 'যা তুমি বলেছিলে তা ঠিক ভাবে করেছ ত? তুমি কাণজী এখন আর দেরি কোরো না। চা আমি এখানেই বানাচ্ছি কিন্তু তোমরা এখানে তাড়াতাড়ি এলেই হয়। পাখোয়াজে শুধু আটা লাগাবার দেরি।'

'তুমি পাখোয়াজে একটু ঘা দাও, ভগতজী, আমি এলাম বলে' ইহা বলিয়া কাণজী চলিতে লাগিল।

ভগতজী এই গ্রামের এক অদ্ভুত লোক। আসলে সে ছিল গ্রামের প্যাটেল, কিন্তু বাল্যকালেই সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। সংসারের অভিজ্ঞতাহীন, খালি হাত পায়ের ভরসায় গৃহত্যাগী সেই বালকের জীবনে কতই না ঘটনা ঘটিয়াছে। হালুইকর হইতে আরম্ভ করিয়া, মুদি পর্যন্ত, আবার রামলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নাগা বাবাজী পর্যন্ত সে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু শেষে সে সব কিছু ছাড়িয়া কালো চুল অর্ধেক পাকা করিয়া আজ হইতে পাঁচ বছর আগে নিজের গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছে। আসল নাম তো রামু ছিল কিন্তু আজ গ্রামের লোক তাহাকে 'ভগতজী' বলিয়াই জানে। গ্রাম ও গ্রামের জাতির রীতি রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সে

গ্রামের বেশভূষাও আপনার করিয়া লইয়াছিল। সে হালও জুড়িয়াছে আর যদি সে সংসার করিবার ইচ্ছা করিত তবে কোনো বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে ঘরে আনিতে পারিত। কারণ দুই বৎসর ধরিয়া সে প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেছিল। তাহার যশ অদ্ভুতভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

অদ্ভুতভাবে এই জন্য যে তাহার যদিও বিত্ত ছিল না তবু লোকে তাহাকে ধনী বলিয়া মনে করিত। সাহুকারেরাও তাহার সহিত দেখা করিতে আসিত। 'আমি তো ভাই ভগবানের কিছুই জানি না'—এই স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও লোকে তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করিত। তান্ত্রিকও তাহার উপস্থিতিতে ঘাবড়াইয়া যাইত। সরকারী অফিসাররাও তাহার নিকট হইতে কোনো প্রকার বেগারী লইত না। অবশ্য সময় সময় ভজন গান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইত। ভগতজী যখন যুবকদের মধ্যে বসিত তখন তাহাকে স্ফূর্তিবাজ বলিয়া মনে হইত। আধা বয়সী লোকেদের আসরে তাহাকে ধীর স্থির মনে হইত, আর বৃদ্ধদের সভায় তাহায় জ্ঞান বুদ্ধির ঝলক বিচ্ছুরিত হইত। গাছ গাছড়া ও চিকিৎসা তাহার জানা ছিল আবার জেদী লোককেও সে কায়দা করিতে পারিত। সমগ্র গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার যদি কেহ বিশ্বাসের পাত্র থাকে সে ছিল ভগতজী। কাণজী ও হীরার সে ছিল বিশিষ্ট বন্ধু।

উজ্জ্বল চেহারা, বিরাট মস্তক অর্ধটাক মণ্ডিত অমৃতধারা স্রাবী আঁখি যুগল, দোহারা গড়ন—এই ছিল ভগতজীর বাহ্যিক রূপ।

কাণজী ঘরে আসিয়া কাপড় বদলাইল। যখন সে লাঠি লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল তখন তাহার বৌদিদি বলিল 'খেতে হয় তো খাও, খাবার ঢাকা আছে।'

'কিছু খাব না' বলিয়া কাণজী পিছনে ফিরিল এবং কোটের পকেট হইতে মোড়ক বাহির করিয়া চাকির উপর রাখিয়া বলিল, 'সকালে রতনকে এই মিঠাই দিও।'

'সকালে রুটি খাবে, না এই সব খাবে? আমি বলছিলুম কি কাকার দেখাদেখি এমন অভ্যাস করেছে। উপোস করায় খিদে মরে গিয়েছে, এখন একটু শুয়ে পড়েছে।'

কাণজী বৌদির এই বক্‌বকানিতে কান না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

'এখন তো ভজনের দিকে যেতে হবে।' চুপচাপ যাইতে দেখিয়া বৌদি বলিল, 'এখন রাত ভোর ঢোলক বাজাও তারপর খেতের নিড়ানি করতে কে যাবে?'

'যদি তা-ই হয় তবে নিজে গিয়েই খেতের দেখাশুনা কর না কেন?' যাইতে যাইতে কাণজী বলিল।

কাণজীর উপর বাঁকা কথার ছুরি চালাইতে চালাইতে বৌদি ঘুমন্ত, নির্দোষ জানা অজানা পড়শীদের উপর ক্রোধ উদ্‌গার করিল।

কাণজীর পরিবারে বড় ভাই, বৌদি আর এক সাত বছরের ভাইঝি—এই কয়টি প্রাণী। যদিও অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের দুই-বৎসরের মধ্যেই তাহার পত্নীর মৃত্যু হয়। ইহার পর আর কেহ তাহাকে কন্যাদান করিবার কথা ভাবে নাই। বিশেষ করিয়া জীবনে যে এমন ছন্নছাড়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য, অল্প কন্যাবিশিষ্ট সমাজে এমন কোনো অতিরিক্ত কন্যা নাই যে নিজে আসিয়া যাচিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। বড ভাই সাদাসিধা ছিল কিন্তু তাহার ভাল-মানুষীর দাম আজ কাণজীকেই দিতে হইতেছে। আর যদি এই দুই বৎসরেব মধ্যে কোনা বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী তাহার জীবনে না আসিয়া দাঁডায় তবে হয়ত তাহাকে জীবন ভোর ভুগিতে হইবে।

লোকে কাণজীকে বলিত, 'তোমাকে এইরূপ ছন্নছাডা রেখেই তো তোমার বৌদি নিজের কাজ হাসিল করছে। ওর তো কিছু এসে যাচ্ছে না। খোরাকি দিয়ে দিন মজুর পাচ্ছে আর দরকার কি তোমাকে সংসারী করবার খোঁজ খবর নেবার?'

কিন্তু কাণজী শান্ত ভাবে উত্তর দিত, 'আরে ভাই মেয়েমানুষ নেই বলে কি কোনো কাজ আটকে যাচ্ছে?' আর বড় ভাইয়ের কথার পুনরাবৃত্তি করিত, 'কপালে থাকে তো বিনা খোঁজ খবর জুটে যাবে, আর কপালে না থাকলে হাজার জায়গায় ধাক্কা খেয়েও জুটবে না।' সত্য কথা বলিতে কি, কাণজীর নিজের ইচ্ছার মধ্যেই কোনো দৃঢ়তা ছিল না, নয়তো যেমন রসিক স্বভাবের লোক, তাহাতে এত দিনে কেহ না কেহ আসিয়া তাহার জীবন সঙ্গিনী হইত। একথা ঠিক যে কোনো স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে

ধরিয়া আনিয়া তিন চারি শত টাকা দণ্ড দিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। কিন্তু যদি সে নিজে চাহিত তবে কোনো বিধবা নারীকে বিবাহ করিয়া তাহার ভাগ্য উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারিত। খুব সম্ভবত এই আত্মবিশ্বাস নিয়া তাহার মনোমত স্ত্রীর আশায় সে বসিয়াছিল।

বৌদির কটু উক্তি সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু আজ কেন জানি না তাহার বৌদির কথায় তাহার মনে লাগিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল সে সোজা খেতের দিকে যাইবে কিন্তু কানে পাখোয়াজ ও করতালের শব্দ ভাসিয়া আসিতে তাহার আসরের কথা খেয়াল হইল, সে মোড় ঘুরিয়া ভগতজীর ঘরের দিকে চলিল।

উহাকে দেখিয়াই পনর বিশ জন যুবক উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'এই যে কাণা ভাই এসে গেছে।' দু'চারজন তাহার জন্য জায়গা করিতে করিতে বলিল, 'আরে কাণা ভাইকে পাখোয়াজটা দাও, তুমি তো অনেক বাজিয়েছ।'

ভিতর হইতে ভগতজী বলিয়া উঠিল, 'কাণজী সোজা ভেতরে চলে আয়।' কাণজীর সামনে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া সে বলিল, 'নে চা খেয়ে নে।' যে কাণজী দিনে পাঁচখানা রুটি খাইত আজ সে শুধু দু' পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছুই খায় নাই। তবু আজ তাহার 'না' বলা কেহ শুনিত না। এইজন্য সে চুপচাপ চা পান করিতে লাগিল। ইহার পর হীরা, মনোর প্রভৃতি আরো দু'চারজন যুবক আসিয়া আসরে জুটিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পাখোয়াজ লইয়া বসিল। ভগতজী ও হীরা খঞ্জনি লইয়া বসিল।

পাখোয়াজে কাণজীর হাত এমন জমিয়া উঠিয়াছিল যে, সে যেমন চাহিত তেমনি বাজাইতে পারিত, একথা অতিশয়োক্তি নয়। সে হাতুড়ি দিয়া পাখোয়াজটিতে ঠুক্‌ঠাক করিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, 'ঠিক আছে, হাত লাগাও ভগতজী।' 'তুই কি পাগল হয়েছিস? যদি আমি বাজাতে পারতাম তবে তোর আশায় অর্ধেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবার দরকার কি ছিল? আচ্ছা আর খোসামুদি করতে হবে না, নে বাজা।'—ভগতজী বলিল।

'কাণজী একথা বললে কি চলে?' এই কথা বলিয়া হীরা ভগতজীকে সমর্থন করিল। নাচার হইয়া কাণজী গণেশজীর ভজন গাহিয়া সংগীত শুরু

করিল। উহার পর সে দুই তিনটি অন্য ভজনও করিল। ভগতজী, হীরা ও অন্য দুই একটি যুবক একখানা, দুইখানা করিয়া ভজন গাহিল। এইভাবে প্রভাত পর্যন্ত কীর্তন চলিল।

কিন্তু উঠিবার সময় অধিকাংশ লোকই অনুভব করিল, যে আজ কীর্তন যেমন জমিবার কথা ছিল তেমন জমিয়া উঠে নাই। ভগতজী একান্তে কাণজীকে পাইয়াই বলিল, 'তুই স্বীকার করিস্ বা না করিস্ আজ তোর কিছু হয়েছে।'

'না ভগতজী, আমার কি হবে?' বলিয়া কাণজী হাসিতে লাগিল।

'তুই যতই 'না' করিস্ না কেন, আমি কিন্তু মান্‌তে রাজী নই', আরেকজন বলিল।

কিন্তু এর মধ্যে হীরা কাণজীকে সমর্থন করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল। 'ভগতজী! তুমি কেমন কথা বলছ? একে তো নির্জলা উপবাস তারপর ষোল ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছে। তার ওপর মেলাতে ঘুরে বেড়াবার সময়…। ক্লান্তি তো এসেছে নিশ্চয়ই…।'

'কথা তো ঠিক' বলিয়া ভগতজী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু কাণজীর দিকে তাহার প্রসারিত আঁখিযুগল সেকথা মানিতে চাহিল না। বিদায় হওয়ার সময় সে বলিল 'আরে এতো একটু ঘুমোলেই যেমনকে তেমন হয়ে যাবে। বাড়িতে যদি যেতে না চাও, তবে এখানেই শুয়ে পড়।'

'না বাড়িতেই যাব। চল, হীরা চল। আসছিস তো?' বলিয়া কাণজী সম্মুখে অগ্রসর হইল।

ক্লান্তি, ক্ষুধা, রাত্রিজাগরণ একসঙ্গে তিন মিশিয়াছে। তবু আজ কাণজীর ঘুম আসিতেছিল না। চোখ একটু বুজিয়া আসে আবার খুলিয়া যায়। এইরূপ কাটিতে কাটিতে যখন একেবারে ভোর হইল তখন আর ঘুম আসিল না। কিন্তু মাথায় যেন চরকি ঘুরিতেছিল।

বাঁশের মাথায় রোদ উঠিতে কাণজীর চোখ আবার খুলিয়া গেল। সমস্ত শরীর ব্যথা করিতেছিল। মাথায় যেন কেহ হাতুড়ির আঘাত করিতেছিল। জানি না কতক্ষণ এই অবস্থায় সে পড়িয়াছিল।

এমন সময় কানে কাহার যেন আওয়াজ আসিতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। 'আজ আমার হয়েছে কি?' বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল।

মোহপাশে

ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর রাত্রি, আকাশে আর পৃথিবীতে তাণ্ডবের প্রস্তুতি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। অর্ধেক রাত্রি অবসান হইলেও কাণজীব চোখে নিদ্রা ছিল না। সে খেতের পাশে মাচানে শয্যাতে ভর দিয়া বসিযাছিল। উহার কান খেতের সীমায় নিবদ্ধ ছিল না। দৃষ্টিব বাহিরে কাজারিযা পাহাড়ের চডাইযের উপর ঘুরিযা বেডাইতেছিল। তাহার প্রাণ ঘুরিযা ফিরিয়া যোগীপুরের দিকে যেন ধাবিত হইতেছিল। জাবীর সুন্দব দেহবল্লরী অপেক্ষা তাহার মধুভরা চোখ দুটি যেন বেশি বার তাহার মনে পডিতেছিল। যতই কাণজী এই সব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল, ততই যেন তাহার মনের ঝড বাডিযা যাইতেছিল জীবনে সে কখনও কাঁদে নাই, তাই কাঁদিতেও তাহার লজ্জা হইতে লাগিল। তবুও তাহার কঠিন চক্ষু দুইটি বাহিযা অশ্রুধারা নীরবে ঝরিতে লাগিল। কাণজী এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হায মূর্খ! জাতপাতের ঠিক নেই কোথায গিয়ে মন দিয়ে ফেললে?'

কিন্তু ইহার পর সে প্রতিদিনের মতো আজও হাসি ঠাট্টা শুব করিল, 'পাহাডের উপর কলেরী গাছ খুবই সাদা হয কিন্তু কোন্ কাজে সে লাগে? আগুন জ্বালাতেও কাজে লাগে না।' তাহার হৃদয় প্রতিদিনকার গান আজও গাহিল, 'না, না, আমি ওর রূপের ভিখারী মোটেই নই। রূপে ওর চেয়ে এই গাঁযের কালীও তো কম যায না। আর সে তো আমাব পেছনে কম ঘোরে নি। তবু যোগীপুরার মেযের কথা আলাদা। ওর প্রেমের এক কণা পেলেও জন্মজন্মের ভালবাসার খিদে মিটে যায়।'

কাণজী এই স্বপ্ন বিলাসে এতই উদ্দীপিত হইল যে, তাহার মনে হইল জীবীর প্রেমকণা লইয়া সে তাহার জন্মজন্মান্তরের ক্ষুধা শান্ত কবিতে যাইতেছে। এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার অনুষ্ঠান ছিল। কাণজী গায়ে পড়িযা সাতক্রোশ দূরের এক বড গ্রাম হইতে সাবান আনিয়া দিবার দায়িত্ব লইল।

হীরা অবাক হইয়া গেল। 'জানি না কেন বেকার বোঝা নিচ্ছ। অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিলে তো এতক্ষণে সাবান এসে যেত', সে কাণজীকে বলিল। কিন্তু কাণজী সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'কখনও কখনও এরকম চক্কর লাগানোও দরকার। আজ আমি যদি ঠাকুর হয়ে ঘরে বসে থাকি তবে কাল আমার বিপদের দিনে কেউ এগিয়ে আসবে কি?'

যদিও হীরা এ উত্তরে খুশি হইল না তথাপি 'তোমার মর্জি' বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল। মনের গভীরে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল, 'যাই বল না কেন কাণজী অন্য কোনো কারণে যাচ্ছে।'

হীরার সন্দেহ সত্য ছিল। কাণজী যোগীপুরার রাস্তা ধরিয়াই চলিতে শুরু করিয়াছিল। রাস্তায় সে ভাবিতেছিল 'গ্রামে যদি ওর কোন আত্মীয় কুটুম্ব থাকত তাহলে সেই ছুতোয় কারো ঘরে যেত। এখন কি ছুতো দেখাব?' অবশেষে, 'লোকের কথা তো ঠেকানো যাবে না, তারা গালগল্প করবেই'—ঠিক করিয়া সে যোগীপুরা গ্রামে প্রবেশ করিল।

যোগীপুরায় প্যাটেলদের বস্তী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা ছিল অন্য প্রকারের প্যাটেল। ইহাই ছিল কাণজী, হীরা প্রভৃতির সহিত এই গ্রামের লোকের অপরিচয়ের কারণ।

জীবীর ঘরের দিকে মোড় ঘুরিতেই এই অজানা গ্রাম কাণজীর কাছে আরো ভালো লাগিল। 'এখানে কে জেনে বসে আছে যে বলবে প্যাটেল হয়ে নাপিতের ঘরে কেন গিয়েছিলে?'

জীবীর ঘরের আঙিনায় পৌঁছাতেই কাণজীর কানে ঘরের মধ্যে ঝগড়ার আওয়াজ আসিল। মনে হইল ফিরিয়া আসিবে এই সময়—'ঘরে যখন কাজ হবার তখন হবে। আগে তো বাপের সেবা, পরে আর কিছু'—এই বলিতে বলিতে জীবীকে হুকা হাতে বাহির হইতে দেখা গেল। কাণজীকে দেখিয়াই জীবীর মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল। দুজনের হৃদয়ের মধ্যে কাহার হৃদয় বেশী স্পন্দিত হইতেছিল সে কথা বলা কঠিন। মুখ দেখিয়া কিন্তু মনে হইতেছিল যে জীবীর হৃদয়ই যেন বেশী হিল্লোলিত হইতেছে। তাহার পরই জীবী নিজেকে সামলাইয়া লইল। কাণজীকে 'এসো' বলিয়া বাপের হাতে হুঁকা দিতে দিতে বলিল, 'বাবা একটু জায়গা দাও না।'

'হাঁ ভাই এসো' বলিয়া বৃদ্ধ পিতা খাটিয়ার পায়ের দিকে সরিয়া বসিল।

জিজ্ঞাসা করিল 'কে রে বেটী?'

'ঐ উধডিয়া গাঁয়ের প্যাটেল।'

'বেশ, এসেছ ভাই! বেটী ওকে তামাক দে আর যদি কল্কে না থাকে তো ঐ তাকে……'

'না, না, আমার কাছে আছে', বলিয়া কাণজী বিড়ি বাহির করিল। জীবীর হাত হইতে কল্কে লইতে তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতেও সে জীবীর আঙুলগুলিতে সহজভাবে একটু চাপ দিল। জীবীর কান পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল, মনে হইল উহার হৃদয় যেন সমস্ত শোণিতের আকারে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

সে কাণজীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চাহিল, পিতার দিকে ইশারা করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া সে দ্বিতীয়বার এমনভাবে তাকাইল যে কাণজীর মনে হইল যেন সে বলিতেছে, 'তোমার কি কোনো ঠিকানা আছে?'

তামাক খাইয়া কাণজী উঠিয়া পড়িল। সে বলিল, 'আচ্ছা নাপিত ঠাকুর, এখন আমি চলি।' বৃদ্ধ খুব আগ্রহের সঙ্গে বলিল, 'ঘর থেকে তো ভোরেই বেরিয়েছ, না জানি রাস্তায় কি খেয়েছ। দুধে খানিকটা আটা জ্বাল দিয়ে……'

'না! না! আমি তো ঘর থেকে খেয়ে মৌনপুরের দিকে রওনা হয়েছি। এই মোড়ে এসে রাস্তা ভুলে গেলাম। ভাবলাম যখন এসেই পড়েছি তখন একবার নাপিত ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'খুব ভাল করেছ ভাই! দেখা তো করা উচিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ-পরিচয় হবে না তো কার সঙ্গে হবে?'

'তা তো বটেই! রাম রাম'—এই বলিয়া কাণজী উঠিল।

'আচ্ছা ভাই, তোমায় মৌনপুরে যেতে হবে না? এখান থেকে পশ্চিম দিকে।'

দড়ি ও কাস্তে লইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া জীবী বলিল, 'আমি তো আমবনে আগাছা তুলতে যাচ্ছি। ওদিকের রাস্তা বলে দেব বাবা?'

'হাঁ বেটী, শ্রাবণ মাসে রাস্তা তো এমনিই গুলিয়ে যায় যে জানা শোনা থাকলেও……'

কাণজী আবার 'রাম রাম' বলিল এবং সম্মুখে অগ্রসর হইল। বিশ

কদমের তফাৎ রাখিয়া জীবী আবার বাহির হইল। পশ্চাতের ঘর হইতে কেহ বলিল, 'হাঁ বেটী, হাঁ বেটী করে মেয়েকে মাথায় চড়িয়েছে। কোন দিন কেলেঙ্কারি না করে তো কি বলেছি।' এই ঝগড়ার রোলের প্রতি লক্ষ্য জীবীর অপেক্ষায় কাণজীরই বেশী ছিল। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া কাণজী জীবীকে জিজ্ঞাসাও করিল, 'তোমার সৎমা, না?'

জীবী হাসিয়া বলিল, 'তুমি একটুতেই ঠিক জেনে নিয়েছ?' তাহার পর বলিল, 'আমার এই মা ওর নিজের মাসীর এক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়। আমি মানা করি, এজন্যই তো·· ···'

না জানি, বিবাহের কথা কিম্বা অন্য কোনো কারণে এই প্রসঙ্গ কাণজীর কাছে খুব অপ্রিয় মনে হইল। মাঝখানে বলিয়া উঠিল 'যেখানেই যাও সেখানেই এই রকম।' তাহার পর আবার বলিল, 'জীবী! মিথ্যে তুমি আসছ আমার পিছনে। রাস্তা তো আমি যে কোনো লোকের কাছেই জেনে নিতে পারতুম।'

জীবী করুণ চক্ষে কাণজীর দিকে তাকাইল। হাসিয়া সে বলিল 'যদি এমনিই রাস্তা জিজ্ঞেস করে নেবে তো মৌনপুরের বদলে যোগীপরা এসে পড়েছ কেন?'

কাণজীর মন উদাস হইয়া গেল, জীবীর দিকে তাকাইতেই তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার ঘাবড়ানো ভাব দূর হইয়া গিয়াছে এমনভাবে বলিল 'মনে হয় তোমার তিনকালের জ্ঞান এক হইয়া গিয়াছে।'

'ওগো না, যখন আমার নিজের কালেরই জ্ঞান নেই, তিন কালের কথা কি?' বলিয়া জীবী মুখের উপরকার আসন্ন বিষাদ ছায়াকে সরাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি বলিল 'কিন্তু সত্য বল, যা কিছু আমি জেনেছি, সত্য, কি, মিথ্যে?' আর মাদকতা ভরা দৃষ্টিতে সে কাণজীর দিকে তাকাইতে লাগিল।

কাণজী এমনভাবে তাকাইল মনে হইল যেন চোখের পাতা ভারি হইয়া গিয়াছে। জীবীর দিকে তাকাইল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'জীবী, তুমি কেন আমায় এমন করে আহ্বান করছ, না জানি সে দিন থেকে আমার কি হয়েছে। সত্যি বলছি আমি পেট ভরে খেতেও পারি না।'

জীবী গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিতে চাহিল 'এখানেই বা

কে খেতে পারছে?' কিন্তু এই কথা না বলিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য কথা কহিতে লাগিল 'কারু নজর ত লাগেনি? কোনো জায়গায় ঝাড়ফুঁক করিয়ে……'

কিছুক্ষণের জন্য কাণজী হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল কিন্তু পর মুহূর্তে জীবীর চোখে চোখ মিলিতেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। কিছুক্ষণ পরেই সে বলিল, 'এ সবে তোমার বেশ মজা লাগে না?'

'মজা নয়তো কি? বাহাদুর পুরুষ মানুষ হয়ে এরকম ভেঙে পড়েছ কেন?'

'তোমার যা ইচ্ছে হয় বলো। কিন্তু দেখো তোমার উপর কোন দিন রাগ হলে ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে তুলে নিয়ে যাব', এই কথা বলিয়া কাণজী জীবীকে দেখিতে দেখিতে হাসিতে লাগিল। খেতের প্রবেশমুখে আসিয়া জীবী দাঁড়াইয়া পড়িল। অধরে হাসির রেখা ফুটাইয়া সে বলিল, 'ঘুমন্তকে সকলেই তুলে নিয়ে যেতে পারে, জাগা লোককে তুলে নিয়ে যেতে পার তবে বুঝব'।

কাণজী কিছু বলিতে চাহিল। তাহাকে চুপ করাইয়া সে বলিল, 'একটি মেয়ের পেছনে ছুটে নিজের জাত খোয়াতে লজ্জা হয় না?'

'যখন প্রাণকে বিকিয়ে দিতে লজ্জা হয় না তখন জাত খোয়াতে লজ্জা হবে কেন? কিন্তু সত্যি বলছি'—কাণজীর রাগ হইতেছিল কি আর কিছু হইতেছিল তাহা সেই জানিত কিন্তু তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার কথা বলিবারও শক্তি ছিল না।

জীবী খেতের প্রবেশমুখে যাইতে যাইতে বলিল, 'যা কিছু বলতে চাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে না বলে খেতের মধ্যে এসে বল।' কিন্তু কাণজীকে এক জায়গায়ই দাঁড়ানো দেখিয়া সে বলিল, 'চল না, দু'দণ্ড বসে কথা বলি।'

'আমি সত্যি বলছি, দেখ আমাকে ডেকে কোনো লাভ নেই' এই কথা বলিয়া কাণজী জ্ঞানশূন্য হইয়া খেতের প্রবেশমুখের কাছে অগ্রসর হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই উহার নয়ন বিস্ফারিত হইল। এদিক ওদিক না দেখিয়া জীবীকে পিছন দিক হইতে দুই বাহুতে জড়াইয়া তাহার মুখে প্রেম চুম্বন আঁকিয়া দিল এবং তাহার পর বাহুপাশ শিথিল করিল। জীবী পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। কাণজী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, মনে হইল যেন

তাহার অন্তর জলিয়া যাইতেছে। জীবীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে সে চলিতে চলিতে বলিল, 'একদিন যদি তুলে নিয়ে না যাই তো কি বলেছি।'

চলমান কাণজীর পিছনে তাকাইয়া থাকা জীবীর বিগলিত অশ্রু আনন্দের, না দুঃখের, না বিরক্তির বোঝা গেল না। বিরক্তির কিম্বা অন্য কিছু কারণের তাহা জীবীই জানে। কিন্তু একথা ঠিক যে তাহার চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

মায়ার চক্রে

কাণজীব মাচানের উপর কাণজী, হীরা ও ভগতজী এই তিনজন বসিয়া ছিল। হীরা ভুট্টা পোড়াইতেছিল। ভগতজী কাঁথার উপর বসিয়া ভুট্টার দানা ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছিল আর কাণজীব দিকে তাকাইতেছিল মনে হইতেছিল কোন আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছে। মাচানে ভর দিয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া কাণজী বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি সম্মুখের আকাশে নিবদ্ধ ছিল, তখন হীরা একটা ভুট্টা পোড়াইয়া কাণজীর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। অপর একটি হইতে একমুষ্টি দানা ছাড়াইয়া মুখে দিল, পরে আবার অন্য একটি পোড়াইতে লাগিল. ভগতজী বলিলেন, 'ওরে কাণজী এই ভুট্টাটা নে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস?' কাণজী বলিল, 'ভগতজী, আমি ভাবছি যে ভগবান এ সমস্ত হাঙ্গামা কেন করছেন।' ভগতজী বলিলেন, 'কিসের জন্য বলব? একমাত্র ছোটো করার জন্য। মানুষকে কেন সৃষ্টি করেন—মারার জন্যেই ত।'

কাণজীর হুঁস ফিরিল, সে বলিল, 'ভগবান এতেই আনন্দ পায়, না ভগতজী?' পাশে যে ভুট্টাটা ছিল সেটা তুলিয়া লইয়া আবার সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

হীরা বলিল, 'কিন্তু আজকাল তোমার উপর এত বৈরাগ্য কোথা থেকে চেপেছে?' এই বলিয়া দুইজনেই ভুট্টার দানা মুখে ফেলিল। কিছুক্ষণ বাদে কাণজী যেন হীরার কথা শুনিতে পায় নাই এইভাবে বলিল, 'কী ভগতজী, এখনও শুধু মায়া?

ভগতজী সাবধান হইয়া বলিলেন, 'ওরে ভাই, যদি মায়া না থাকত তাহলে মানুষ বেঁচেই বা কি করত?'

কাণজী বলিল, 'গীতাতেও ভগবান মায়ামুক্ত থাকতেই বলেছেন।' 'এও ত মায়া,' এই বলিয়া ভগতজী হাসিলেন।

কাণজী ভগতজীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, 'না ভগতজী

এরকম উড়িয়ে দিও না, ঠিক উত্তর দাও।'

ভগতজী বলিলেন, 'ঠিক জবাব ত আমার দ্বারা হচ্ছে না। তুমিও গীতা পড, আমিও পড়ি। তুমি যা বুঝেছ সে তোমার, আমি যা বুঝেছি সে আমার। আর যদি হীরার বুদ্ধিতে কিছু না আসে তাতেও কিছু আসে যায় না। কি হে হীরা।' এই বলিয়া ভগতজী আবার নামিতে লাগিলেন।

হীরা ভগতজীর কথা স্বীকার না করিয়া তাহার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'সত্য কথা বলতে কি ভগতজী কাণজীকে তুমিই বিপথে নিয়ে গিয়েছ। তুমি ওকে পড়িয়েছ, আর এখন যে গীতাপাঠ করছে সেও তোমার জন্য।'

ভগতজী বলিলেন, 'কিন্তু যখন ও আমার কাছে পড়তে এসেছিল তখনও "সদেবংত সাবলিঙ্ক।" আর "গজবা মাক' (লোকপ্রেম কথা) পড়ার জন্যেই এসেছিল। সে সময়ে কি আমার জানা ছিল যে গীতার মাথায় পড়ে যাবে?' এই বলিয়া ভুট্টার শীষটা বাহিরে ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'দেখে শুনে নরম দেখে যদি না দাও, তাহলে চলে যাই।' হীরা একটি ভুট্টা ভগতজীকে, আর দুইটি কাণজীর দিকে আগাইয়া দিল। কাণজী বলিল 'আমার ত আছে, তুই খেয়ে নে'। 'ভাল কথা', হীরা বলিল। এই বলিয়া আবার ভুট্টা ছাড়াইয়া খোসা ফেলিয়া দিল। হাতের দানা মুখে ফেলিয়া দ্বিতীয় ভুট্টাটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ওহে ভগতজী, নাও ওঠো! তোমরা দুজনে যদি বাজি ধরে খেতে থাক তাহলে তো আমাকে ভিক্ষা করতে হবে, যেতে হয়ত চল।'

ভগতজী বলিলেন, 'আচ্ছা চলি।' এই বলিয়া উঠিয়া পড়িলে কাণজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুজনেই নীচে নামিল। একা পড়িয়া কাণজী কানের কাছে কাকের ডাক শুনিতে পাইল। 'ধুত্তোর—শালারা খেয়ে ফেলছে ত?' এই বলিয়া কাণজী উঠিয়া পাশে রাখা গুলতি ও পাথর হাতে নিল।

মাথা সমান উঁচু ভুট্টার খেতের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে হীরা ও ভগতজীর মাথার উপর হইতে গোলার মত শন্ শন্ শব্দ করিয়া গুলির পাথর চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে হীরা বলিল,'ওরে দেখিস আমার মাথা যেন ভেঙে দিস্ না।'

'যদি এরকম ভয় পাও তাহলে মাথা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ কেন? বাড়িতেই রেখে আসা উচিত ছিল।' এই বলিয়া গুলতিতে অন্য পাথর লাগাইয়া কাণজী হাসিতে লাগিল। রাস্তায় আসিয়া হীরা ভগতজীকে বলিল, 'বোধ হচ্ছে যেন কাণজী আজ না হয় কাল সাধু হয়ে যাবে। ভগতজী, আজকের দিনে ওর রকম-সকম সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মনে হচ্ছে।' এই কথা শুনিয়া ভগতজী হাসিয়া বলিলেন।

'ওহে হীরা আমার ত ওর উল্টোটা মনে হচ্ছে। আমার আরও ভয় হচ্ছে ও কোন প্রবল মায়ায় ভেসে যাচ্ছে।'

'না না, ভগতজী তা কি করে হতে পারে', এই কথা বলিয়া হীরা চিন্তামগ্ন হইল।

'জানিনা ভগতজী কোন মায়ার কথা বলছেন।' মুখ নীচু করিয়া চলিতে চলিতে ভগতজী আবার বলিলেন, 'শোন তুমি স্বীকার কর বা না কর এর পা কোন গর্তে পড়ে গেছে।

'না ভগতজী, আপনি কি একথা জানেন না যে এরকম লক্ষ লক্ষ গর্ত যদি কাণজী লাফ দিয়া পার হয়ে যায় তাহলেও কাণজীর কিছু হবে না, সে খুব চতুর ভূত প্রেতের সঙ্গে সে মোকাবিলা করে।'

ভগতজী এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ওহে হীরা, আমি যে গর্তের কথা বলছি সে অন্য গর্ত। এই বলিয়া একটু থামিয়া, হীরার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কাণজীর এই ব্যথা আমি বুঝে নিয়েছি—জ্যান্ত ডাকিনী ওর উপর ভর করেছে'—আর সম্মুখে চলিতে চলিতে যেন তিনকালের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, 'হীরা তুমি ভেবে দেখো হয়ত কেউ অতিথি হয়ে এসেছে, কিম্বা ও নিজেই অন্য কোন গ্রামে গিয়েছে কিম্বা রাস্তায় চলতে চলতে কোন কিছু ঘটেছে। হীরা, আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমায় গালি দিও।'

হীরার চোখ যেন সহসা খুলিয়া গেল। উহার মনে পড়িল যে পনের দিন আগে কাণজী সাবান আনিতে গিয়াছিল। যেন জটিলতা কাটিয়া গেল। মনে মনে বলিতে লাগিল, 'হোক বা না হোক! ঐ নাপিতের মেয়ের প্রেমে পড়েছে কাণজী। এমন যদি না হত তবে সাবান আনতে যেত না। যোগীপুরা না গেলে ওর অতো দেরী হত না।' এক দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিয়া মাথা দোলাইয়া সে বলিল, 'যদি তোমার কথা ঠিক হয় ভগতজী তবে তো একটা কাণ্ড ঘটবে!'

কিন্তু ভগতজী 'কি কাণ্ড ঘটবে' জিজ্ঞাসা করিল না এবং এ প্রসঙ্গে অন্য কিছুও বলিল না। যেন সে কিছুই বোঝে নাই এমন ভাবে বলিল, 'তুই তো ঘরেই যাচ্ছিস্, না? তবে যা, আমি খেতে একটু ঘুরে আসি।' বলিয়া ডান দিকে মোড ঘুরিল।

কেহ আলের পথে চলিতে চলিতে তিন রাস্তার অপরিচিত বাঁকে হারাইয়া যেমন হয়, তেমনি ভাবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে ভগতজীর দিকে তাকাইতে লাগিল। সে বলিল, 'কিন্তু ভগতজী তুমি সব কথা শুনে নাও! এর একটা হিল্লে তো…'

ভগতজী দাঁড়াইয়া পড়িলেন। হীরার দিকে করুণাভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন 'আরে তুইও তো অদ্ভুত লোক। যে ফেঁসেছে সেই ফাঁস্‌বে। এতে তুই এত বিচলিত কেন হচ্ছিস?'

ভগতজীর দিকে পা বাড়াইয়া হীরা বলিতে বলিতে চলিল 'কিন্তু কারো বাপের সাধ্য নেই এ সমস্যার সমাধান করে। যতই ফয়সালা করার চেষ্টা করবে ততই সমস্যা ঘনিয়ে উঠবে। তুমি পুরো সব কথা তো…'

হীরা নিজের কথা বলিতে চাহিল কিন্তু ভগতজী যেন শুনিতে চাহিলেন না। এমনিই মাঝপথে বলিলেন, 'কিন্তু পুরো কথা শুনে আমি এর কি করতে পারি? আর তুই-ই বা কি করতে পারিস্? এতে তো ও নিজেই বুঝে নেবে। কোন চিন্তা না করে তুই ঘরে যা, গিয়ে কোন কাজে লেগে যা।' এই কথা বলিয়া ভগতজী আবার চলিতে লাগিলেন।

হীরা ভগতজীর পিছন দিকে দেখিতে লাগিল। একবার কাণজীর কাছে গিয়া 'তুই ভেবেছিস্ কি?' বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করার কথা ভাবিল।

কিন্তু 'এতদিন হয়ে গেছে তবু সে আমায় কিছু বলেনি' ইহা ভাবিয়া 'যেতে দাও! নিজের কর্মফল নিজেই ভুগবে' এই কথা বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে সে আপন ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু কাণজী যে হীরার সঙ্গে কথা বলে নাই তাহার কারণ ছিল স্পষ্ট। যেখানে কোন উপায় নাই সেখানে এই পাগলামির কথা বলিয়া মূর্খ বনিবার

কোন যুক্তি নাই। যা কিছু ভাবিবার ছিল সে তো নিজেই মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে। জীবীর সঙ্গে তাহার হৃদয় মিলাইয়া দেওয়ার সময় সে জাতি প্রথার তোয়াক্কা করে নাই। ভাই সম্পত্তির অংশ দিবে না, গ্রামের লোক গ্রামে থাকিতে দিবে না, এই জন্য তাহার বিশেষ চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল দাদার জীবনের জন্য। উপরন্তু তাহার জীবনে যে যৌবনের প্লাবন আসিয়াছিল তাহার উপরও তাহার খুব ভরসা ছিল না। আর জীবীর প্রতি তাহার এই আকর্ষণ একেবারে একটা ভুল এই ভয়ও তাহার হইতে লাগিল। কিন্তু সে যে এই ভীতি আপনা হইতেই খাড়া করিয়াছিল এই খবর তাহার জানা ছিল না।

বড় ভাইয়ের শুধু যে একটি হাত ভাঙা ছিল তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহার শরীর ও মনও অর্ধেক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে পাঁচ বৎসর আগে মরিবার সময় তাহার পিতা, যার গোঁফের রেখা পর্যন্ত উঠে নাই এমন ছোট ছেলেটিকে কাছে বসাইয়া বড় ভাইকে দেখাশুনা করিবার জন্য বলিয়াছিল, 'কানা! আপনার বড ভাইকে ভাল ভাবে দেখবি। কাল তোর স্ত্রীপুত্র হবে। আমি ঠিক জানি যে বিয়ে না করে তুই থাকবি না। কিন্তু তবু তুই আলাদা হোস না। বুঝেছিস্! মেয়েদের একসঙ্গে থাকতে ভাল লাগে না কিন্তু তবু তুই তোর বড়ভাইকে ছেড়ে যাস না। আর যদি সে আলাদা হয়ে যায় তবু তার বোঝা তোকেই বইতে হবে। তোর বৌদি যদি ঝগড়াটে হয় তবে সে হয়ত কটুকথা বলবে। কিন্তু ওর কথায় তুই আমার ভাল ছেলে, পরে যেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে তুই ঝগড়া করিস না।'

কাণজী আজও পর্যন্ত তাহার ব্যবহার ঠিক তেমনই রাখিয়াছে। বড় ভাইকে দিয়া খুব কম কাজই সে করাইয়াছে। বড় ভাইয়ের একে তো বসিয়া সময় কাটাইবার অভ্যাস—তাহার উপর 'দাদা ওখানে অতিথি এসেছে দুঘন্টা বসে কথা বলগে। কাজ তো আমি আর বৌদি মিলে করে নেব' এইসব বলিয়া বলিয়া কাণজী আরো তাহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছিল। একথা ঠিক যে দেওর ও বৌদির মধ্যে খুব মিল ছিল না কিন্তু কাণজী তাহার বৌদির মুখরা স্বভাবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রতি উত্তরে জবাব দিলে শুধু ঝগড়াই বাড়িবে, অপর পক্ষে সে মনে মনে তাহার বৌদিদির প্রশংসাই করিত কারণ, টাকা পয়সা বা স্বাস্থ্য না থাকা সত্ত্বেও

এমন একজন সাধারণ লোকের ঘর সে করিত। বৌদি এমন ঘরের মেয়ে যেখানে বংশে বিধবা বিবাহে বাধা ছিল না। কাণজী ইহা জানিত যে অন্য কোন রমণী হইলে হয়তো ঘর ছাড়িয়াই চলিয়া যাইত। এইজন্য যদিও তাহার বৌদি কলহ করিত তবু ঘর করিয়া চলিয়াছে এই সদ্‌গুণ সে ভুলে নাই। অন্যদিকে কাণজীর সদ্‌গুণ তাহার বড় ভাই, ভগতজী, হীরা প্রভৃতি সমজদার কাহারও দৃষ্টির বাহিরে ছিল না। এইজন্য লড়াই ঝগড়ার সময় লোকে জোয়ান ছেলেদের সামনে কাণজীর উদাহরণ দিত।

এইসব কথা চিন্তা করিয়া হীরারও এই বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে জীবীকে কাণজী যতই ভাল বাসুক না কেন উহাকে কখনও ঘরে আনিবে না। কিন্তু অপরপক্ষে সে এমন একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছিল যে কাণজীর জীবনে কিছু শান্তি আসে। আরেকদিন রাত্রিতে সে একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাইল। পরের দিন সকল বেলায় সে মাচানের উপর চা রাখিল। জোরে চিৎকার করিয়া সামনের মাচান হইতে কাণজীকে সে ডাকিল। উহারা দুজনেই শুধু ছিল। চা পান করিতে করিতে হীরা কথা শুরু করিল, 'কাণজী! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'জিজ্ঞেস কর' বলিয়া কাণজী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'সত্যি কথা বলবি?'

কাণজী মমতাভরা দৃষ্টিতে হীরাকে দেখিল আর লোক দেখানো হাসি হাসিয়া বলিল, 'কখনও কি এমন হয়েছে যে আমি তোকে মিথ্যে বলেছি? হীরা, আজ তুই এমন করে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'না! না! এমন কথা কিছু নয় কিন্তু আমায় মনে হয়, তুই আমাকে আজকাল এড়িয়ে থাকতে চাস। তোর মনে কিছু···'

'এড়িয়ে চলবার কিছু নেই। তবে বলবার মতো হলেই না তোকে বলব? হীরা, বোকার মত কথা বলে লাভ কি?'

'তোর তাতে লোকসানই বা কি?' বলিয়া হীরা হাসিতে লাগিল। কাণজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আবার বলিল, 'কারু সঙ্গে কথা বললে আর কিছু না হক মনটা তো হালকা হয়ে যায়। একলা একলা নেশা করলে তো কোন দিন মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।' হীরা ষাট বৎসরের বৃদ্ধের মতো গম্ভীর হইয়া রহিল।

'হীরা, এখন ও চিন্তার দরকার নেই। মাথা খারাপ হবার হলে কবেই খারাপ হয়ে যেত। এখন তো আমি ও কথাকে গভীরে তলিয়ে দিয়েছি।'

'তলিয়ে দিয়েই কিছু বল না।'

মাথা নিচু করিয়া কাণজী মাচানের যে বাঁশের কঞ্চি বিঁধিতেছিল তাহা খুলিয়া নিয়া বলিল, 'যখন তুই সব কথা জেনে ফেলেছিস তখন আমার মুখ থেকে শুনে কি আর কিছু হবে?'

ইহা শুনিয়া হীরার মন সত্যই হালকা হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার তো বিশ্বাস ছিল যে মৃগতৃষ্ণা এসব। তুই ওর পিছে মিছেই পাগল হয়ে গিয়েছিলি। আর ওর মধ্যে এমনই বা কি আছে যে……।'

'ওরে, ওর মধ্যে কি আছে সে তো আমিও জানি না। কিন্তু কিছু নিশ্চয়ই আছে। ও আমার জাতের হলে তো ওকে ঘরে না এনে ছাড়তাম না।'—কাণজী বলিল। ওর মুখে স্থির সংকল্পের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

'আরে, ও জাতের হলে তো কোন কথাই ছিল না। আর এখনই বা বা কি ক্ষতি আছে? নিজের জাতের মধ্যে তো ওর চেয়ে হাজার গুণ ভাল মেয়ে আছে। তুই যাকে চাস্ উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারিস। এতে তো দু তিনশো টাকা জরিমানা দিতে হবে, এইমাত্র। দরকার হলে চুরি করে নিয়ে আসব। একবার তুই কাউকে পছন্দ কর। আর সব কিছু হয়ে যাবে।' বলিয়া হীরা সাবধান হইয়া গেল।

'কি, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস?' খেতের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কাণজী আবার বলিল, 'ও অন্য জাতের, তাই এতো ভালবাসা দেখায়। কিন্তু এক জাতের হলে 'না ভাই, আমার বাপের ইজ্জত ধুলোয় মিশে যাবে।'—এই বলে ও কবেই এর ফয়সালা করে দিত।'

যেন কোন অকর্মণ্য লোকের দিকে তাকাইতেছে এইভাবে কাণজী হীরার দিকে তাকাইল আর বলিল, 'তবে তো এখনও ওকে চিনিসনি। যদিও আমার আর ওর মধ্যে এখনও এমন কোন কথা হয়নি তবুও আমার এই ভরসা আছে যে আমি যদি ওকে বদ্ধ কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিতে বলি তবে হাসতে হাসতে ও ঝাঁপ দেবে।' তারপর এক গভীর নিশ্বাস লইয়া আবার বলিল, 'হীরা ভগবান তো রূপ দিয়ে সারা আকাশ ভরে দিয়েছে কিন্তু ওরকম হৃদয় কোথায়। পাগলা, সত্যিকার দাম তো মনের। তোর

সেই ছড়া মনে নেই কি ?—

'ষাঁড়ের মূল্য তার শিঙে, ঘোড়ার মূল্য তার কানের বিস্তারে কিন্তু মানুষের দাম কি করে ধরা যায়—তার অন্তরের গভীরতা অতলস্পর্শী। হীরা একথা কি জানিস্! ষাঁড়ের দাম যেমন ঠিক হয় ওর শিং দিয়ে তেমনি ঘোড়ার দাম ঠিক হয় তার কান কত চওড়া দেখে কিন্তু বোকা, মানুষের দাম তো তার মন দেখেই ঠিক করা যায়। তারপর সে উঁচু জাতের হোক্ বা নীচু জাতের হোক্।'

কাণজীর কথা শুনিয়া আর তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হীরার মনে হইল যে সে বলিয়া ওঠে, 'তবে করে ফেল।' কিন্তু সে জানিত যে এরকম বলিয়া দিলেও তো কিছু হইবার নয়। জাতি-কুল, ভাই, বৌদি, কুটুম্ব সকলকে সে না হয় ত্যাগ করিবে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে সন্তান-সন্ততি হইবে তাহাদের কি দশা হইবে? হীরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'কাণজী, এ সবই ঠিক কিন্তু নিজের গাঁয়ের লোক সব অবুঝ! ওরা কি বুঝবে।' এই কথা বলিয়া যদি কিছু বুঝিয়াও থাকে তাহাকে গুরুত্ব না দিয়া হীরা বলিল, 'আমরা কি জাতিকুল আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যেতে পারি?'

'এইজন্যই তো আমি এতদিন এসব দূরে সরিয়ে রেখেছি। তুই-ই তো এ কথা আরম্ভ করেছিস, তাইনা আমি বলছি। তা না বলে ভগতজী তো বলছিল 'আমার মন তো চায় স্বর্গের মধু খেতে কিন্তু ও মধু তো দূর স্বর্গের। জীবনে সে অমৃত পাওয়া যায় কি?' ইহা বলিয়া কাণজী হাসিতে চেষ্টা করিল। উনানের উপরে রাখা ভাঁড়ের দিকে তাকাইয়া বলিল 'নে, কথায় কথায় জল তো শেষ হয়ে গেল! আরো ঢালবার হয় ঢেলে নিয়ে শেষ কর। চল্ আমাকে আবার তিল দেখবার জন্য খেতের সীমানার মধ্যে যেতে হবে।'

'আমার কাজেরও শেষ নেই' বলিয়া হীরা উনানের দিকে ঝাঁকিল। আগুন বাড়াইয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই চা তৈয়ার করিল। উহার পর দুজনেই কিছু চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইল। চা পানের সময় শুধু চুমুকের শব্দ ছাড়া পূর্ণ নিস্তব্ধতা ভরিয়া ছিল। মাথার উপরে কাকগুলিও যেন চোরের মতো নিঃশব্দে উড়িতেছিল। যদিও মাথা তুলিয়া উপরের দিকে কিছু আওয়াজ

করিতেছিল কিন্তু সে আওয়াজ সূর্যের বাড়ন্ত তেজের মধ্যে যেন মিলাইয়া যাইতেছিল।

চা শেষ করিয়া হীরা হুঁকা ভরিল। অর্ধেক তামাক জ্বলিয়া গেলেও তাহার খেয়াল হইল না হুঁকা কাণজীর দিকে বাড়াইয়া দিতে। মনে হইল তাহার মাথায় যেন কোন চিন্তা ভরিয়া আছে। কাণজীর দিকে দুএকবার তাকাইয়া বলিল, 'এই কাণজী, যদি ঐ ছুঁড়ীকে এই গাঁয়ে এনে বসান যায় তবে কি চলে না?' 'কোথায়?' বলিতে বলিতে কাণজীর মুখে চিন্তা আর জিজ্ঞাসার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

'কোথায় কেন? আমাদের গাঁয়ে বেচারা ধুলিয়া নাপিত রয়েছে না, যার বৌ মরে গেছে। হয় তো দিয়ে ফেল্।' বলিয়া হুঁকা বাডাইয়া দিয়া বলিল 'বেচারা যদ্দিন বাঁচবে, আশীর্বাদ করবে বুঝলে!'

'আরে একি কারুর ফাল্তু মেয়ে? তুই ও কিরকম কথা বলছিস' বলিয়া কাণজী হাসিল। উহার হাসির মধ্যে যেন 'কোথায় কাক আর কোথায় কোকিল?' এই ভাব ফুটিয়া উঠিল।

'কিন্তু তোর সব কথা থেকে তো আমার মনে হয় যে যদি তুই বলিস ও নিশ্চয়ই মেনে নেবে। আর তোর যদি ওর ওপর পুরো বিশ্বাস থাকে তবে ওর বাপমা যতই ঝঞ্ঝাট করুক না কেন তাতে কি এসে যাবে? কোন পরিত্যক্তা মেয়ে তো নয় যে নাপিতের জাতেও ঝামেলা?'

হুঁকায় দু চার টান দিয়া কাণজী বলিল, 'কাউকে বলবি না বুঝলি?'

'কিন্তু এতে মন্দ কি আছে? এমন তো নয় যে ওর ভাই অন্য কারো ঘরে না দিয়ে থাকবে। যদি এই গাঁয়েরই কোন নাপিতের ঘরে এসে যায় তো খারাপ কি? আর এই বেচারারও এমন সামর্থ্য নেই অন্য কোন মেয়ে ঘরে আনে আর বংশ রক্ষা করে।' হীরা বলিল। কাণজীকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল, 'যদি সম্ভব হয় তো দিয়ে ফেল না? ছোট কাকী তো তোকে ভগবানের মতো পূজো করবে।' এবং হাসিয়া বলিল 'আর আমরা গাঁয়ের লোকও তো তোর কম প্রশংসা করব না।'

কাণজী সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, 'আরে যা যা। নিজের কাজ কর্।' দুজনে মাচান হইতে নামিল। চলিয়া যাইতে যাইতে হীরা বলিল, 'আমি হাসি ঠাট্টা করিনি কাণজী আমি যা কিছু বলেছি

তা তুই ভাল করে ভেবে দেখ। এক ঢিলে দুই পাখি। আগে তুই ভেবে দেখ।'

কাগজী আবার আগেরই মতো বলিল, 'তুই চুপ কর।' আর ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে ভুট্টা খেতের শীষের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

হীরার ঐদিনের এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথাটা কাণজীর মনে অনেকদিন পর্যন্ত ঘুরিতেছে। কখনও সে হীরার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কখনও আবার এই উপায় উদ্‌ভাবন করিবার জন্য হীরার প্রতি তাহার প্রেম উপচাইয়া উঠিয়াছে। খর্বাকৃতি গোল হৃষ্টপুষ্ট মুখ, কালো রঙের মধ্যে বিড়ালের মতো চক্ষু, ধুলিয়ার ঐ মূর্তি সম্মুখে আসিতেই তাহার মন বিচলিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, 'আর ও শালার স্বভাবই তো 'টেঁটিয়া', খিটমিটে।'

আবার অন্যদিকে সে একথাও ভাবিতে লাগিল, 'আর এরই বা কি গ্যারাণ্টি আছে যে সে অন্য কোন ভাল বরের হাতে পড়বে। সে'দিন ও বলছিল যে ওর সৎমা ওকে তার কোন আত্মীয়ের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঝগড়া করে করে আর কদিন বাঁচবে? আর জোরই বা চলবে কি? বেচারী হয়ত কোন শূন্য ঘরে গিয়ে পড়বে, তার চেয়ে ধুলিয়ার ঘর খারাপ কি? অন্ন বস্ত্রের তো অভাব নেই। আর আমার দৃষ্টির মধ্যেও ত থাকবে।' আর এই এতদিনের মন্থনের পর ঐ অন্তিম বাক্য উহার চিন্তায়, উহার হৃদয়ে এমন গভীরভাবে প্রস্ফুট হইল যে সে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, 'যখন হীরা পেছনে লেগেছে তখন হয়ে যাক্। সেদিন বেচারী বুড়ি নানীও ত কিরকম বলছিল। কারো বংশ রক্ষা হয়, এর চেয়ে আর বড়ো পুণ্য কি আছে?'

একদিন তো হীরার আগ্রহ দেখিয়া কাণজী জীবীর সঙ্গে এ বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি করিতে যাওয়ার জন্য তৈয়ার হইল। কিন্তু যাইতে যাইতে সে হীরার কাছে আপনার ভীতির কথা ব্যক্ত করিল, 'হীরা, যাচ্ছি তো। আর আমার পুরো ভরসা আছে যে জীবী আমার কথা ফেলবে না। কিন্তু দেখবি এ ধুলিয়া শালা তো বানরের মতো।' আবার হীরা যেন কাণজীকে 'তবে ওকে মরতে দে'—একথা না বলে এই ভয়ে সে বলিল, 'ওদিকে আমি তো

তোর কথা মেনে কাজ করতে রাজী আছি।'

'আরে ঐ ধুলিয়া বেচারা ও কি করবে? এত বয়সে—প্রায় ত্রিশ তো হতে চলল—ওকে কে মেয়ে দেবে? এতো সেও বোঝে কাণজী।' এই কথা বলিয়া রহস্যময় হাসি হাসিয়া হীরা আবার বলিল, 'ভাল ভাল গোঁফে তা দেওয়া লোকও যখন চুপ করে দেখে যায়, এ বেচারা ধুলিয়া তো গুনতির মধ্যেই পড়ে না।'

হীরার কথার তাৎপর্য কিছুটা কাণজী বুঝিয়াছিল। ইহাতে হীরার উপর তাহার ক্রোধও হইল। দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কাণজী বলিল, 'না, না হীরা, তুই আমাকে এত ছোট ভাবিস্ না। এটা ঠিক যে ও আমার নজরের মধ্যে থাকলে আমার একপ্রকার শান্তি হবে, আর কি···'

'আমিও তো তাই বলছি, এই যে তুই সাত সাত ক্রোশ পথ চুপি চুপি চক্কর মারিস সেটা তো বন্ধ হবে।' হীরা বলিয়া ফেলিল।

হীরা যেমন করিয়া কাণজীর মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিল তাহাতে কাণজী গম্ভীর হইয়া গেল। মনে মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, 'না, তবে তো আমি কোন দিনই যাব না হীরা। ধুলিয়া সাতজন্ম বিয়ে না করে থ'কুক না কেন। আর গাঁয়ে নাপিতের ঘর বসল না বসল তাতে আমার কি এসে গেল?'

হীরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, 'আমি তোকে এমন কি বলেছি যে তুই এ কথার খেলাপ করছিস। বুড়ি নানীর সঙ্গে কথা বলে সব কিছু ঠিক করেছি আর তুই এখন সব···'

কাণজী কথার মধ্যেই ব'লয়া উঠিল, 'এসব ঠিক আছে। কিন্তু সেদিন নানী যা বলেছে তা কি তুই শুনিস্ নি? একবার সে না বলে দিয়েছে, কারণ বুড়ি নানীর ধুলিয়াকে পছন্দ নয় তো। ওকে নতুন করে লজ্জা দেওয়া, রাজি করানো ঠিক হবে না, তাই না হীরা।'

তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া আবার বলিল, 'মরতে দে হীরা! আমার নেওয়ার কিছু নেই, দেওয়ারও কিছু নেই। শুধু শুধু···'

'ওরে ভালমানুষ! কিন্তু এতে দু'শো টাকা সওদা করতে হলেও ধুলিয়া···'

এই দুইশত টাকার সওদা করিবার কথা শুনিয়া হীরার প্রতি কাণজী এত

ক্রুদ্ধ হইল যে যদিও সে তাহাকে চপেটাঘাত করিল না তবু বলিয়া ফেলিল, 'কি করব হীরা! যদি তোর জায়গায় আর কেউ হত তো টেনে দুই চড় বসিয়ে দিতুম।' তারপর অগ্রসর হইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'আমি তো জীবীকে বেচ্‌বার জন্য আসিনি যে তুই এত লোভ দেখাচ্ছিস ?'

'কিন্তু তোকে একথা কে বলেছে' বলিয়া হীরা চুপ করিয়া গেল কিন্তু তাহার মনের মধ্যে আলোড়ন চলিতে লাগিল। 'তা আমারই বা কি ? তোর অবস্থা দেখেই না আমাকে এতটা বলতে হয়েছে। আমার ধারণায় তো এতে ধুলিয়ার ঘর সংসার হবে আর তোর চোখের সামনে ও থাকবে, আর তোর বুকটা ঠাণ্ডা হবে। এখন তো জ্ঞানের কথা হচ্ছে, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে যদি মাথায় ঠাণ্ডা করার ওষুধ না লাগাতে হয় তবে তখন বলবি হীরা ঠিক বলেছিল।'

হীরা এক গভীর নিঃশ্বাস লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাণজীকে দেখিল একবার শেষ কথা বলার চেষ্টায় সে বলিল, 'দেখ তোর যেতে হয় যা, নয়ত দেরি হয়ে যাবে।' কাণজীকে ঠোঁট কামড়াইতে দেখিয়া বলিল 'না যেতে হয় তো তুই জানবি, তবু নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তোর কথায় যদি কারো ভাল হয় তো ওর মধ্যে মন্দ তো আমি কিছু দেখছি না। বেলা পড়ে এল এর পর তোর গিয়ে লাভ কি ?'

'একবার তো দেখে নিই। এই ছুতোতে জীবীরও যাচাই হয়ে যাবে।' এই কথা ভাবিয়া মাচানের সিঁড়ি বাহিয়া সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

হীরার মনে হইল যে সে জিজ্ঞাসা করিবে 'আরে ওখানেই যাচ্ছিস্ না আর কোথাও', কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া 'যা কিছু হবে রাত্তিরেই জানা যাবে' ভাবিয়া চুপ হইয়া গেল।

নিজের প্রিয়তমাকে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, পথে কাণজীর হৃদয়ে কত কথাই না গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। কখনও সে রাস্তা ভুলিয়া যাইতেছিল আবার কখনও বন্ধুর পথে হোঁচট খাইতেছিল। এইভাবে সে যোগীপুরার কাছে কূয়ার পাশে পথিকের মতো বসিয়া পড়িল। খরিফ শস্য কাটিবার দিন। তাই কূয়ার আশে-পাশে কোন ভীড় ছিল না। কিন্তু ইহারই মধ্যে গ্রামের দিক হইতে একটি ভিস্তী মেয়েকে আসিতে দেখা

গেল। কাণজীর মনে হইল যদি সে উচ্চবর্ণের নারী হয় তবে তাহার হাতে জল খাইবে। আর জল খাইবার আছিলা না থাকিলে কূযার কাছে অনেকক্ষণ থাকা চলিবে না। সে লাঠি লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিযা পড়িল। সে পাশের একটা খেতে গেল। তামাক ভরিয়া কিষাণেব সহিত কথাবার্তা বলিয়া আর কূযার উপর নজর রাখিয়া কাণজী অনেকক্ষণ বসিযা রহিল।

কাঠের আগুন পাইলও তাহার তামাকে মজা হইত না, মজা তখনই হইত যখন সে মনেপ্রাণে তামাক খাইতে চাইত। ইতিমধ্যে সে কোন একটি স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিলে। পুরোপুরি নিশ্চিত হইয়া সে কিষাণকে 'রাম রাম' বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর পাশে লাঠি চাপিয়া কলকিতে দম লাগাইয়া ধীরে ধীরে কূয়ার দিকে যাইতে লাগিল। মণির সহিত চোখাচোখি হইল। কাণজী চোখের ইসারায় তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিল। কাণজী মণিকে বলল, 'তুমি কি প্যাটেল? আমাকে একটু জল খাওয়াবে?'

মণি বলিল, 'জল খাও ভাই। পানিঘাটায় যে এসেছে তাকেও জল খাওযাব না?' অপর যে স্ত্রীলোকটি জল ভরিতেছিল সে বলিল, 'ভাই, তুমি কোন্ জাত?' কাণজী ব'লল, 'আমি তো প্যাটেল' এই বলিয়া কাণজী পাশ হইতে লাঠি বাহির করিল এবং পায়ের সাহায্যে লাঠিটি নীচে রাখিল। 'ভাল, ভাল' এই বলিযা শেষবারের কলসি একটু টানিয়া মণিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই জল খাওয়াবি, না আমি?' মণি বলিল, 'তুমি ভরা কলসি কেন খালি করছ? আমার কলসি ভরা হলে অবশিষ্ট জল একে খাইয়ে দেব। নাও, তোমার মাথায় তুলে দি।' এই বলিয়া খালি কলসি নীচে রাখিয়া মণি সেই স্ত্রীলোকটিকে কলসি তুলিয়া নিতে সাহায্য করিল এবং তাহার উপর কলসিটি রাখিয়া বিদায় দিল। মণির মনে হইল দুজন স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য আসিতেছে। এইরূপ মনে হওয়াতে মণি বলিল, 'কিহে কাণজী ভাই, এখানে কেন আসা হযেছে?' কাণজী উত্তর দিল, 'আমার জীবীর সাথে দেখা করা দরকার। সে কোন ছুতো করে আমার সাথে দেখা করুক, যদি রাত্রিও হয়ে যায় তাহলেও যেন ভুল না হয়।' মণি বলিল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক। যদি তার সাথে আমার দেখা হয় তাহলে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'—মণি ঠাট্টা করার প্রবৃত্তিকে থামাইয়া রাখিয়া বলিল।

অন্য জলভরণী তৎক্ষণে কুয়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মণি যাত্রীকে (কাণজীকে) জল খাওয়াইয়া দিল। যাত্রী বলিল, 'এক কলসির জন্য তোমাকে পুরা ঘড়াই টানতে হবে' এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল এবং কোমরের চাদরে হাত মুছিয়া লাঠি সামলাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, বোন, আমি চলি।' আসিয়া পড়া স্ত্রীলোক দুটি জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কে?' মণি উত্তর দিল, 'কে জানে, কেউ হবে। কুয়া দেখে এখানে জল খেতে এসেছিল।' এই উত্তর দিয়া জলপাত্র মাথায় রাখিল ও কাণজীর পিছন দিকে নজর রাখিয়া চলিতে লাগিল। কাণজী যাহার কথা বলিয়াছিল সেই মহুয়া গাছটি পাড়পুর যাওয়ার পথে পড়ে। মহুয়ার একদিকে বর্ষার চাতুর্মাস্যের জন্য না-চলা পথ ছিল। অন্যদিকে যেখানে ঝরণা হইতে জল পড়িত সেখানে খাদের মতো গর্ত ছিল, আর গর্তের পাশে বেড়ার আড়াল ছিল। কাণজী কিছুক্ষণ মহুয়ার গোড়ার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গর্তের দিক্‌কার ঢালের উপর চাদরটিকে বালিশ করিয়া লইয়া ঘাসের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় পায়ের উপর পা রাখিয়া পূর্বের কথা মনে করিতে লাগিল নিজের সে দিনকার উদ্ধত ব্যবহার মনে হইতেই আজও তাহার নিজের উপর বড়ই ক্রোধ হইল। ভয়ও জন্মিল। তাহার মনে হইল যে হয়ত সে তাহার উপর রাগ করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু আবার তাহার মনে হইল 'না, না, আর কেউ হয়ত রাগ করতে পারে, কিন্তু জীবী কখনও রাগ করবে না।' জীবীর মূর্তি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল। তাহার আসিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, তবু তাহার মনে হইতেছিল যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। দু'একবার উঠিয়া দেখিয়াও লইল কিন্তু তৃতীয়বার অপেক্ষাতুর চোখ শান্তি পাইল। জীবী কাঁধের উপর দড়ি এবং হাতে কাস্তে লইয়া আসিতেছে। একের চক্ষু অপরের চক্ষুর সহিত মিলিত হইল। দুইজনের মুখই হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কাণজী নিচের দিকে নামিতে লাগিল। রাস্তার পাশে উঠিয়া জীবী বলিল, 'কেন নেমে যাচ্ছ? এখানেই বস না। যদি কেউ দেখে ফেলে কিম্বা কিছু বলে তা হলে আমাকেই বলবে। তুমি কেন ভয় করছ?' এই বলিয়া জীবী মহুয়ার তলায় জলের পাশে আসিল এবং আশে পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'এ জায়গায় ত কোন ভূত

প্রেতও আসবে না।' পুনরায় দুজনার চক্ষু মিলিত হইল, দুজনেই হাসিল। কিন্তু এবার কাণজীর হাসিতে ব্যথার ঝলক দেখা দিল।

'আচ্ছা বস' এই বলিয়া জীবী ঘাসের উপর দড়ি রাখিয়া চোখের ইসারায় কাণজীকে বসিতে বলিল, নিজে মহুয়া গাছে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাণজী অসহায় ভাব করিয়া ব'লল, 'আমার কিন্তু তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে। এখানে যদি বলি তাহলে সব কথা খুলে বলতে পারব না।' জীবী বলিল, 'তবে আমার খেতেই চল।' এই বলিয়া দড়ি তুলিয়া জীবী বলিল, 'সেখানে গিয়ে চারা যদি নাও কাট, তা হলে অন্ততঃ আমার বোঝাটা ত তুলে দিতে পারবে।' পরে হাত নাড়াইয়া রশ্মি দেখাইয়া বলিল, 'এই বেডা ধরে চলে যেখানে আমের গাছ পাবে সেখানে আমার খেতে এসো—আমিও ওদিক থেকে আস'ছি'—এই বলিয়া পিছন ফিরিল এবং দুই এক পা গিয়া আবার বলিল, 'দেখো, রাগ করে বাড়ি ফিরে চলে যেওনা নতুবা রাত্তির হওয়াতে আমি একা কোথায় তোমাকে খোঁজ করব।' কাণজী বলিল, 'যদি তাই হয় তা হলে আমি ঘরের দিকেই যাই'—এই কথা বলিযা চাদর লইয়া পিছনের দিকে ফিরিল। জীবী বলিল 'তুমি চলেই যাও' এই বলিয়া জীবী পিছনের দিকে মাথা ঘুরাইয়া, আড চোখে কাণজীর দিকে তাকাইল। 'আর দেখি আগে কে আসে' 'এই বলিয়া হাসিযা পিঠ ঈষৎ হেলাইযা চলিয়া গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে দুজনের মধ্যে জীবীই প্রথম পৌঁছিল। কাণজী ও জীবী জমির আইলের পাশে অবস্থিত আমগাছের তলায় বসিল। দুধারে ভুট্টার উপর এখন সূর্যের পিঙ্গলবর্ণ আভা পড়িতেছিল। জীবী ত এরকম বসিয়াছিল যেন কোন পরিষ্কার জমিতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়াছে, দুই হাতের আঙুলগুলি পরস্পর আবদ্ধ হইয়া হাঁটুর উপর রাখা ছিল। চাদরে মাথার অর্ধেক ঢাকা ছিল, কানে ঝোলা সোনার অলঙ্কার তাহার মুখাকৃতিকে অপার সৌন্দর্য দান করিতেছিল। চোখে মুখে যৌবনের আভা ঝলমল করিতেছিল। একে অপরের দিকে চাহিয়া চোখের সাহায্যে কথা বলার পর জীবী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। 'সে দিনের মতো আজও কি রাস্তা ভুলে গেছ না কি?' পা একটু বাড়াইয়া ডান হাত নাড়িয়া কাণজী বলিল, 'রাস্তা ভুলে এসেছি বা জেনেই এসেছি সে কথা আমি ঠিক বলতে

পারি না কিন্তু…'এই বলিয়া জীবীকে কাতর চোখে দেখিল ও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'এই মুখ যে দেখতে এসেছি একথা সম্পূর্ণ সত্য।' জীবী আবার বলিল, 'এতো ভালো, এক দিনের পথ, এর জন্যই মুখ দেখতে চলে আসছ কিন্তু কাল যদি আমি দূরের গাঁয়ে চলে যাই তখন তুমি কি করবে?'

কাণজী হাতে ধরা কাঠখণ্ড দ্বারা মাটিতে গর্ত করিতে করিতে যেন কোন বিষয়ে নিমগ্ন আছে এই রকম কিছুক্ষণ থাকার পর দীর্ঘশ্বাস লইয়া বলিল, 'এই জন্যই ত এসেছি।'

জীবী বলিল, 'যদি এরকম হয় যে আমি যদি দূরে চলে যাই এজন্য পূর্বেই পেট ভরে মুখ দেখে নিতে চাও কিম্বা'…এই পর্যন্ত বলিতে কাণজী সব কথা পাল্টাইয়া বলিল, 'স্পষ্ট বলতেই এসেছি, কিন্তু তার আগে তুমি কথা দাওত বলি।'

কাণজীকে আড় চোখে দেখিতে দেখিতে জীবী জিজ্ঞাসা করিল, 'কার কথা?'

কাণজী নত চোখে বলিল, 'আমি যা বলি তা তোমায় মানতেই হবে।'

জীবী বলিল, 'কথা না দেওয়াতেও আজ পর্যন্ত কোন কথার জন্য আমি ত অমত করিনি। তোমার কি তাতেও বিশ্বাস হয় না?'

কাণজী আবার বলিল, 'যদি বিশ্বাস না হত তা হলে এত দূর আমি কি করে আসতাম? কিন্তু যদি তুমি কথা দাও তা হলে আমার মনে কমবেশী খানিকটা সাহস জন্মায়।'

জীবী বলিল, 'যদি আমি কথা দিয়ে ফিরিয়ে নি তা হলে তুমি কি করবে' এই বলিয়া জীবী হাসিয়া উঠিল।

কাণজী পা একটু গুটাইয়া লইল। যেন জীবীকে আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করিতেছে। এইভাবে সামলাইয়া বলিল, 'শোন জীবী এটি হেসে উড়িয়ে দেবার মতো কোন কথা নয়।'

জীবী বলিল, 'যা বলতে হয় বলে ফেল না, কথা দিই কিম্বা না দিই, তবু তোমার কথা যদি না মানি তা হলে কি আর উদ্ধার আছে?' এই কথা বলার সময় জীবীর মুখের ভাব পূর্বের মতোই হাসি মুখ ছিল কিন্তু তার চোখের ঔৎসুক্য কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। গুলি ছোঁড়ার পূর্বে শেষবারের মতো

কাণজী আবার বলিল, 'দেখ পরে যেন পিছিয়ে যেও না, এখনও যদি তুমি না বল তা হলে আমি ছেড়ে দি।'

কাণজীর এই কথাবার্তার মধ্যে জীবীর মতো প্রিয়তমা কি ভাবিল আর না ভাবিল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। 'আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। কিংবা আমাকে নিয়ে দূরদেশে পালিয়ে যাবার কথা হয়ত ভাবছে। কোন ঘৃণিত প্রস্তাবও কি করিতে পারে?' ইত্যাদি এরকম ধারণা হইতে জীবী হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। কাণজীর শেষ কথা তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। জীবী রাগ করিয়া বলিল, 'বলার হয়ত বলে ফেল, স্বীকার করা কিম্বা অস্বীকার করা—দুজনেরই মত ত জানা যাবে।'

'আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি,' এই বলিয়া কাণজী চোখ মাটির দিকে নামাইয়া উত্তরের জন্য কান পাতিল। তাহার পর জীবীর প্রাণ যেন শেষ হইয়া যাইতেছে এইভাবে বলিল, 'নিজের বিয়ের সম্বন্ধ কোথাও কেউ নিজে করে থাকে কি?' এই বলিয়া জীবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কাণজীর মুখ বন্ধ করার জন্য এই কথাই যথেষ্ট হইল। সে যদি জীবীর রূপ দেখিয়া থাকিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ বলিতে পারিত না, 'আমি নিজের জন্য প্রস্তাব করতে আসিনি, আমি আমার গ্রামের ধুলিয়া নাপিতের জন্য প্রস্তাব করতে এসেছি।' বলিয়া কাণজী কথা সমাপ্ত করিল কিন্তু তাহার পর চক্ষু উঠাইতে পারিল না এবং যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা ফিরাইয়া নিতেও পারিল না। 'ধুলিয়ার হয়ে দালালী করতে এসেছ তো?' এই রকম কিছু যেন শোনা গেল কিন্তু একথা জীবী বলিতেছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। তার পরে তাহার এই সন্দেহ হইল যে কখনও সে কিছু বলিয়াছিল কিনা। কাণজী উপরের দিকে তাকাইল। 'না, না জীবী, আমি বলতে ভুল করেছি। এসব মিছে কথা।' এই কথা বলিবার জন্য সে মুখ খুলিতে প্রয়াস করিবার আগেই এক হাতের উপর ভর করিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া জীবী অন্য হাতে ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, 'আমার মা বাপের কাছে জিজ্ঞেস করেছ কি?'

কাণজীর হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। সে বলিল, 'ধুলিয়ার মা তো বলছিল যে বুড়ো রাজী আছে কিন্তু তোর তরফে তোর সংমার মত নেই

কি ?' ধীরে গভীর নিঃশ্বাস লইয়া জীবী বলিল, 'আমার মত নেই জেনেও তুমি বিয়ের কথাবার্তা বলতে সাহস করে এসেছ ?'

কাণজী খোসামুদি করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু আমার এ বিশ্বাস ছিল যে তুই না করবি না এইজন্য এ কাজ আমি নিজের জিম্মায় নিয়েছি। না হলে কখনও...'

'যা কিছু তুমি করেছ ভালই করেছ' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান করিয়া সে বলিল, 'কিন্তু একাজ করবে কি করে ? জিজ্ঞেস করতে যাবে তো ? আমার বাবা রাজী হবে কিন্তু আমার মা কখনও রাজী হবে না। এখনও সে অন্য চেষ্টা করছে '

কাণজী জীবীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'এসবই ত এখন তোর হাতে।' এবং জীবীকে চুপচাপ দেখিয়া বলিল, 'বলিস তো আমরা দু'চারজন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা আসব আর মহুয়া গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব।'

'ভাল কথা', বলিয়া জীবী চুপ হইয়া গেল। কাণজীর অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। যাহা কিছু সে বলিয়াছিল তাহাই এত বড হইয়া উঠিল যে তাহার আপনার ব্যক্তিত্ব খুব ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইল। তাহার প্রথম অবস্থার প্রেম, ত্যাগ, গৌরব, বিরহ, বেদনা বা বৈরাগ্য যেন কিছুই উহার মধ্যে ছিল না। সে মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, 'এ নিশ্চয় কিছু বাহানা করে মানা করে দেবে।' জিজ্ঞাসা করিল, 'তা তোর কি সিদ্ধান্ত ?'

'বিচার করার এখনই কি হয়েছে ?' বলিয়া জীবী যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং কাণজীর দিকে তাকাইল। যেন সে কাণজীর কথাগুলিকেই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, 'আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় রাস্তার পাশে মহুয়া গাছের কাছে আমি আসব।'

কাণজীর মন চাহিতেছিল যেন সে বলে, 'যদি তোর মনে দুঃখ লাগে তবে যেতে দে।' কিন্তু জীবীর চেহারা দেখিয়া সে কিছু বলিতে পারিল না। একথা বলা মানে মাথা কাটিয়া তারপর মাথা জোড়া লাগাইবার চেষ্টার মতো। যদি কিছুক্ষণ আর সে বসিতে পারিত তবে হয়ত আর কিছু বলিতে পারিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে জীবী দড়ি ও কাস্তে নিজের দিকে টানিয়া লইল। 'তবে আমি চলি' বলিয়া কাণজী উঠিয়া দাঁড়াইল। দড়ি পাকাইতে

পাকাইতে জীবী বলিল 'আবার এসো।' 'তবে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী পাকা রইল, কেমন?' কাণজী আবার জিজ্ঞাসা করিল।

কাণজীর দিকে তাকাইয়া জীবীর দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল, 'এ লোকের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।' সে আরো বলিল, 'পাকা কথা যদি তুই ত্রয়োদশী হয় তবে আগের ত্রয়োদশী।' ইহা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল আর বলিল, 'আমি সন্ধ্যা হতেই মহুয়া গাছের কাছে আসব। তোমার যখন আসার এসো। যাও'—বলিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিল, আর ভুট্টা খেতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কাণজী ঘরের দিকে রওনা হইল। অপমানিত কুমারীর রক্তিম বর্ণ মুখের রাঙা আভা সূর্যতেজের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

কাণজী তো জীবীর সঙ্গে পাকা কথা বলিয়া আসিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেল। না না, আমি তাকে গিয়া মানাই করিয়া আসিব। 'ও তো মূর্খ। ভাল না লাগলে মানাই বা করল না কেন?' এও কি একটা খেলা? এ যে জীবনের সর্বগ্রন্থিবন্ধন? তাহার নিজের জীবনই তাহাকে ধিক্কার দিতেছিল সেই সময়ে এতখানি বেশি সেয়ানা হইয়া চলিবার সময়েই বারণ করিয়া আসা উচিত ছিল। সেই সময়েই বলিয়া দিয়া আসা উচিত ছিল যে—আমি তো তাহাকে শুধু পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম—তাহা হইলে আর দুইবার যাওয়ার হাঙ্গামা থাকিত না।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এখন আর জীবীকে মানা করিয়া আসার সাহস তাহার ছিল না, আবার অন্য দিকে এমনও হইতে পারে যে উহার তাহাকে ভাল লাগে না। তাহা কি হইতে পারে? আর যদি তাহাও হইত, বুড়ো বাপের মুখের উপর যে মানা করিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহার আমার সামনে 'না' করিয়া দিতে কিসে বাধা ছিল? তাহার উপর আমার কোনও অধিকার ছিল না। এ তো পথে চলিতে চলিতে প্রেম। কিন্তু ইহাও তো তাহার ভালই লাগিত। বাপ মা ছাড়িয়া লুকাইয়া আসায় কোথায় একটু তো খটকা লাগিবেই। বরং সে একটু খুশিই হইয়াছিল। সৎমায়ের খপ্পর হইতে ছাড়া পাইবে, সে কথা আলাদা। কিন্তু উহাকে তাহার পছন্দ হইলে তো! কে জানে, উহার অপেক্ষা ধুলিয়াকে উহার ভাল লাগিবে কিনা। বার বার যাওয়ায় লোকের মনে হইবে যে বেচারী নানা কথা চিন্তা করিয়া থাকিয়াই হয়তো পিছাইয়া যাইবে আর জন্মের মতো কলঙ্ক লাগিয়া থাকিবে। এইসব চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল—'ওর যদি না আসা হয় তবে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে আসবে না—ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে তাহার ভাল লাগিতেছে না—শুধু একবার চক্কর দিয়া আসা এই পর্যন্ত!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে স্থির করিল যে হীরার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিয়া

লইবে। কিন্তু এত সব ভাবনার পরে এখন পর্যন্ত যা কথা উহার কাছে চাপা ছিল সে কথা 'তুমি কী করে এলে'—হীরা এ ভাবে তিন বার প্রশ্ন করিল। তাহার উত্তরে কাণজী বলিল—'বার বার জিজ্ঞাসা করে তুমি আমায় বিরক্ত করছ। কিন্তু পাকা কথা এখনও পর্যন্ত হয় নি।'

'কিন্তু তোর কাঁচা কথাই বল। বারণ করেছিস তো সেই কথাই বল! আজ থেকে ঐ প্রসঙ্গই ছেড়ে দিই। ঐ ধুলিয়া তো আমায় প্রায় খেয়ে ফেললে।'

কাণজীর পুরো বিশ্বাস ছিল যে জীবী আসিবে। তাহা হইলেও সে গোলমালে ভাবনার কথা যাহাতে ভুলিয়া না যায় সে জন্য উদাসভাবে বলিল, 'জীবীর মুখে কাপড় ঢুকাইয়া এখানে আনার জন্য তৈয়ারি তো হয়েছি, কিন্তু...'

হীরা মাঝখানে বলিয়া উঠিল, 'মুখে কাপড় গুঁজে কেন? কি? জোর করে আনতে হবে?' বড় বড় চোখ করিয়া কাণজীর দিকে তাকাইয়া থাকিল।

'জবরদস্তির মতোই তো! আমি বলেছি বলেই তো সে আর কিছু বলতে পারে নি—কথা চেয়ে নিয়েছি! এ তো হয়েছে মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়ার মতো।' বলিয়া কাণজী ঠোঁট কামড়াইতে থাকিল।

'কিন্তু ওর আসবার আপত্তি তো আর নেই?' হীরা একটু প্রসন্ন হইয়া বলিল।

'আপত্তি তো নেই, আর কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় সেই মহুয়া গাছের নিচে আসার কথাও পাকা করে দিয়েছে! কিন্তু...'

'তবে আর পরোয়া কিসের? তবে এতদিন ধরে কথা বলতে তোর কি মুখে ব্যথা হত? ও বেচারি ধুলিয়া জানতে পারলে পেট ভরে খেত। কিন্তু তুইও অদ্ভুত লোক কাণজী!' বলিয়া হীরা কাণজীর দিকে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। কাণজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, 'তা হলে তো পরশুই যাচ্ছিস? আজ একাদশী। দিনের বেলায় লুকিয়েই যাবি নাকি?'

পরশু শব্দটা যেন কাণজীর বুকে আসিয়া লাগিল। আজ পর্যন্ত জীবীকে প্রাণের মতো দেখিতেছিল। পরশু সে পরের হইয়া যাইবে, তাহাও চির-

কালের মতো। তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবারও আর অধিকার পর্যন্ত থাকিবে না। মুহূর্তের জন্য ভাবিল, 'আমিই যদি ওকে ঘরে নিয়ে আসি? এতে খারাপই বা কি?' আর যেন মূর্খত'পূর্ণ চিন্তায় হাসিতেছিল এমনি এক ভারি দীর্ঘশ্বাস লইয়া হাসিয়া বলিল, 'কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর যাওয়ার দিন তো পাকাই আছে' পাছে বেশি কথা বলিয়া ফেলে সেই ভয়ে হীরার কাছে বিদায় লইয়া বলিল, 'কখন যাব সেটা কাল ঠিক করব।'

ফসল কাটার কাজ পুরাদমে চলিতেছিল। চিন্ত'মগ্ন কাণজী মকাইয়ের গাছ এমন ভাবে এক ঘায়ে কাত করিয়া দিল যেন সে আফিম খাইয়া কাজ করিতেছে।

কিন্তু দুপুর বেলা খাওয়ার জন্য 'কংসার' (গমের মিষ্টি হালুয়া) গলা দিয়া নামিল না। যেমন তেমন করিয়া খাইয়া হুঁকা ভরিয়া ভাবিতে লাগিল। ধুঁয়ায় সঙ্গে শ্বাস ভরিয়া দাদাকে হুঁকা দিতে দিতে বলিল, 'তবে তো দাদা তোমাকে আজ এখানেই শুতে হবে।'

দাদার বসিবার ধরন ছিল অদ্ভুত। যেখানে বসিত সেখানেই কোমরে ধুতি জড়াইয়া দুই পায়ে কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম চেয়ারের মতো করিয়া লইয়া বসিত। আজও তেমন ভাবে বসিয়াছিল। হুঁকা হাতে লইয়া বলিল, 'তুই কি কোথাও 'ছড়া' গাইতে যাবি?'

'হুঁ'—এই হয়তো প্রথমবার কাণজী দাদার কাছে মিথ্যা কথা বলিল।

'আচ্ছা, কিন্তু ঐ খেতে কিছু ভয় টয়···কিন্তু সে তো মোঘাকে বলে দেব, সে এক আধবার ঘুরে আসবে। আর তুইও তো সারারাত 'ছড়া' গাইবি না? ফিরবার সময়ও এক আধবার ঘুরে দেখবি। কোথাও সারা রাত কাটিয়ে দিস্ না! কাজের এত ভিড়, না ঘুমিয়ে রাত জাগলে অসুখে পড়ে যাবি।'

'না দাদা, এতো আজ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর সময়।' বলিয়া হয়তো এ সত্যকে অধিক দূর না টানিবার ইচ্ছায়, অথবা অন্য কোন কারণে কাণজী হুঁকা শেষ না করিয়াই উঠিয়া গেল।

'বোস। হুঁকাটা শেষ কর কাজ তো জীবন ভোর আছেই' বলিয়া দাদা দাঁড়াইয়া উঠিয়া হুঁকাটা কাণজীর সামনে রাখিয়া দিল।

এতক্ষণে সম্মুখের খেত হইতে হীরা আসিল। তামাক খাওয়ার পর

সেও কাণজীর পিছনে পিছনে চলিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল বুঝিয়া কাণজী জিজ্ঞাসা না করিলেও বলিল, 'কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। কেমন?'

সূর্য ডুবিবার অল্পই দেরি ছিল। হীরা আর কাণজী একত্র হইল। হীরা জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা দুজনেই তো যাব?'

'ঐ নাপতে ব্যাটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। প্রসাদ তো ওই-ই পাবে।'

'আমি একলা কেন প্রাণটা জখম হতে দিই?'

'কিন্তু ওকে সঙ্গে নিলে তো জখম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।'

'এতে তো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভেবে দেখ যদি ধরা পড়ি! ওকে তো সঙ্গে রাখতেই হয়।'

হীরার ইহা ঠিক মনে হইল। 'তা নাও, আমি ওকে খবর পাঠাচ্ছি।'

'হাঁ, পাঠাও। এক কাজ কর। আমার ঘর থেকে তলোয়ার নিয়ে তোমার নিজের ঘরে রেখে এসো। আমি নিয়ে বেরোলে পরে বাড়ির লোকে সন্দেহ করবে। দাদা টের পেলে মুশ্‌কিল হবে।'

'ভাল কথা', এই বলিয়া হীরা গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কাজ ছাড়িয়া কাণজী মাচানের মধ্যেই বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে থাকিল। চারিদিকের অন্ধকারে দৃষ্টি পড়িতেই 'ভগবান আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—কে বলতে পারে আমি যা করছি তা ঠিক না ভুল' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল আর বিড়বিড় করিয়া বলিল—'ভগবান! তুই যা করাচ্ছিস আমি তাই করছি।' এই সময় কাণজী একেবারে নাচার হইয়া গিয়াছিল। মাথায় হাজারো রকম চিন্তা ঘুরিতেছিল। সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না।

গ্রামের সম্মুখে আসিয়া হীরার সঙ্গে তাহার দেখা হইল। 'আচ্ছা এখন কতটা সময় আছে? এখনও তো তুই খাবারও খাসনি অন্ধকার রাত্রে আট ক্রোশ…'

'তোমরা দুজনে তো চল, ঐ আমগাছের কাছে দাঁড়াবে। আমি এই এলাম বলে—খাবার কোন ইচ্ছা নেই, এজন্য বেশি সময় লাগবে না। পাগড়ি তো এতেই হবে। কিন্তু জুতো ছাড়া চলবে না।'

যাইতে যাইতে আবার বলিল—'তুমি চল, আমি আসছি।'

কাণজী বাড়ি গিয়া ছেঁড়া পাগড়ি খুলিয়া ফেলিল। এদিক ওদিক দেখিয়া 'চলবে' অস্ফুটভাবে বলিয়া অন্যহাত দিয়া ঝাড়িয়া আবার পরিল। দরজার পিছনে যে জুতা জোড়া পড়িয়াছিল তাহা বাহির করিয়া পরিল আর 'বৌদি, আমি খাব না' এই কথা বলিয়া ভগতজীর ঘরের দিকে রওনা হইল।

ভগতজী সেইমাত্র খেত হইতে ফিরিয়াছে। উঠানে খাটিয়া পাতা ছিল। তাহাতে পাগড়িকে তাকিয়া করিয়া পায়ের উপর পা উঠাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে শুইয়াছিল। চার সেরি জুতার শব্দ করিতে করিতে কাণজী আসিতেছিল। সে একদিক ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, কাণজীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, 'বসে যা না।'

'কতক্ষণের জন্য'—এই কথা বলিতে বলিতে কাণজী বসিয়া পড়িল। এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল 'আমি তো তোমার আশীর্বাদের জন্য এসেছি।'

'কিসের আশীর্বাদ?' এই বলিয়া ভগতজী কাণজীর ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

'হীরা তোমাকে নিশ্চয় বলেছে।' শুষ্ক হাসি হাসিয়া কাণজী বলিল—'তোমার এই পড়শীর জন্য স্ত্রী আনতে।' ভগতজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কাণজী জিজ্ঞাসা করিল—'চুপ করে গেলে কেন ভগতজী, তোমার কি একথা ভালো মনে হচ্ছে না?'

'কি পাগল হলে নাকি? আমার কি হয়েছে যে ভালো লাগবে না।'

'তবে তো আশীর্বাদ পেলে আমি উঠি।' বলিয়া কাণজী সাবধান হইয়া গেল। ভগতজীকে একটু হাসিতে দেখিয়া বলিল—'কেন, দেবে না?' কেন জানি না কাণজীর কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল। 'কাহার?' একথা তো তাহার নিজেরও জানা ছিল না। এজন্য সে আরও ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল।

'আচ্ছা ভাল মানুষের পো। ভাল কাজে আশীর্বাদের দরকারই বা কি? আর খারাপ কাজের জন্য তো কোন আশীর্বাদ দেবই না।'

কাণজীর মুখ শুকাইয়া গেল। 'তোমার কেমন মনে হচ্ছে ভগতজী?' সে নিজেই জানিত না যে যাহা করিতে যাইতেছে তাহার ফল ভাল হইবে না খারাপ হইবে।

'এতে এমন কি আছে যে আমার খারাপ লাগবে কাণজী!' বলিতে বলিতে ভগতজী উঠিয়া বসিলেন। কাণজীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'যাও জয় করে এসো। অন্য গাঁয়ের ব্যাপার একথা মনে রেখে হুঁশিয়ার হয়ে কাজ কোরো। আর যদি কোথাও একটু সন্দেহ হয় তবে অমনি ফিরে এসো। আচ্ছা তবে এখন ওঠো, দেরি কোরো না।' এই বলিয়া ভগতজী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। খানিকটা দূর পর্যন্ত কাণজীর সঙ্গে গেলেন। বিদায় লইবার সময় সাহসের কথা বলিলেন—'গরীবকে স্থিতি করার মতো পুণ্য আর নেই কাণজী। তাতে তো ভগবানও সাহায্য করতে আসবেন। এ জন্য কোনও চিন্তা করবে না।'

'ঠিক আছে ভগতজী! আমি তো সেই চেষ্টাই করছি।'

'চেষ্টা ছিল নইলে আমার কি সাধ্য ছিল। এখন হয়ে গেলে বুঝতাম যে হল।' বলিয়া কাণজী 'আচ্ছা তবে চলি' বলিয়া উঠিয়া গেল।

অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া ভগতজী কিছুক্ষণ ধরিয়া কাণজীর পিঠের দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিনে ভগতজী বুঝিতে পারিয়াছিল যে কাণজীর মন জীবীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আজ কাণজীকে দেখিয়া তাহার যেন আরও কিছু বেশি চোখে পড়িল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'ভগবান অনেক মায়া দেখেছি। কিন্তু এই নারীর মায়া এক আশ্চর্য ব্যাপার।'

ভগতজীর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া কাণজী অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইল। মাথার পাগড়ি খুলিতে খুলিতে ধুলার দিকে চাহিয়া বলিল—'ধুলা ভাই, বর সাজতে দেরি আছে। এখন তো হোলিতে লাফ ঝাঁপ করতে বেরিয়েছ। এই পাগড়ির ধার একটু তেরছা করে ছড়িয়ে নাও' বলিয়া ধুতির কাছা শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আমার তলোয়ার এনেছ তো?'

ধুলা বলিয়া উঠিল 'বেশ, বেশ!' তারপর তলোয়ার খুলিতে খুলিতে বলিল, 'এতো ভাই তোমার হাতেই শোভা পায়—আমার হাতে লাঠিই ভাল।'

'লাঠি যদি চালানো অভ্যাস না থাকে, কিছু এসে যাবে না, কিন্তু সামাল দেওয়া তো চাই।'

হীরা বলিয়া উঠিল, 'তা ঠিক, তবে এমন না হয় যে তোমার লাঠি আর আমার লাঠিতে ঠোকাঠুকি হয়ে ভেঙে চুরমার হল।'

'মুহূর্তের মধ্যেই এমন কুলক্ষণের কথা চলছে কেন?' বলিয়া ধুলা মাটিতে যে লাঠি পড়িয়াছিল তাহা লইয়া সামলাইল। 'হনুমানের মতো নিজেই নিজের রক্ষক।' এই বলিয়া উত্তর দিকে অবস্থিত হনুমানের দিকে মুখ ফিরাইল। দুই হাতের মধ্যে লাঠি রাখিয়াই হাত ছুঁড়িল। বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'হে মাণিক, যদি কাজ সারিয়া খুশি মনে ফিরিয়া আসি তবে পাঁচটা নারকেলের তোরণ বানাব। আর তোর ঠাঁইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াব।'

'আর আমাদের নয় কেন?' কাণজী অগ্রসর হইয়া বলিল।

'তোমাদের নয় কেন?' ধুলা বলিল—'তোমাদের যতই না খাওযাই তবু কম হবে।'

হীরা বলিল, 'বিশেষ খাওয়া কি তুই খাইয়েছিস। হ্যাঁ, লাড্ডুর জায়গায় দুধে একখানা রুটি খাওয়ালেই যথেষ্ট। কি বল কাণজী?

'ব্যাস, ব্যাস, এই যথেষ্ট।' কাণজীও বলিল।

'এতো ওকে নিয়ে আসার পরের কথা।' বলিয়া ধুলা নেশাখোরের মতো প্রলাপ বকিতে লাগিল—'তা হীরা ভাই, তুই কি বলিস। একবার তুই আমাকে গৃহস্থ করে দে, পরে মজা দেখ না। রোজ চা খাওয়াই কি না দেখ। ঘরের কাজ ছাড়িয়ে তোর মতো লোকের খেতে কাজ করতে পাঠাব। এতটা সহজ ব্যবস্থা কি ভোলবার মতো? অন্য সকলে ভুলে গেলেও এই ধুলিয়া—এ সব চেয়ে অন্য ধরনের লোক, বুঝলি?'

কাণজীর নিকট ধুলার এই ফাজলামি মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। 'আচ্ছা তবে চুপ কর, রাত্রি বেলায় কেউ শুনে ফেলবে' বলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। তিনজন চুপচাপ করিয়া চলিতে লাগিল।

তারাভরা আকাশ মৃদুমন্দ হাসিতেছিল বলিয়া মনে হইল আর যখন পৃথিবীর মাথায় এতগুলি দীপ জ্বলিতেছিল, তখন আমার ঘরে কেন অন্ধকার এরূপ প্রশ্ন কে যেন করিতেছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া কাণজী ও হীরার মুচির শেলাইয়ের জুতার তলা চেইড়, চেইড় শব্দ করিতেছিল। কিন্তু গ্রামের মুচির শেলাই ধুলার জুতো ফটাক ফটাক আওয়াজ করিতে

ছিল। কাণজী তো মাথা ঝুঁকাইয়া এমনভাবে চলিতেছিল যেন কোন নেশার ঘোরে আছে। হীরার মন ধুলার জুতার দিকে ছিল। বলিল, 'চলতে পারবে তো ধুলা?'

'হাঁ, হাঁ, তুমি চল' বলিতে বলিতে ধুলা নিজের আর হীরার মধ্যে আট দশ পায়ের দূরত্ব দৌড়াইয়া ঝট্ করিয়া পার হইল।

কাণজী মনে মনে ভাবিল, 'আজ যদি আটের বদলে আশি ক্রোশ করা হয় তবু কি ধুলিয়া 'না' বলিবে?'

ইহার পর পুনরায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। পায়ের জুতা যেন বলিতেছিল—'এক-দুই-তিন, এক-দুই-তিন।'

যে সব বাড়িতে শিশু আছে তাহাদের কাজকর্ম এখনও শেষ হয় নাই, এমন সময় তাহারা মহুয়া গাছের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে কাণজীর মনে হইল, এই জায়গা বাছিয়া সে বড় ভুল করিয়াছে। যদি দুই দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে তবে বাহির হওয়া মুশকিল হইবে। আজ যে চারিদিকে ভয় ভয় করিতেছিল। হীরার দৃষ্টিও এই দিকে গিয়াছিল। জঙ্গলের সব দিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'আমি এখনই আসছি। এই জঙ্গলে অশ্বথ গাছ আছে। দেখি গিয়ে যদি ওখানে ওঠা নামা যেতে পারে। তা হলে শেষকালে এই জঙ্গলের দুর্গ কেটে বাইরে পালিয়ে আসতে জায়গা তো করেই নিতে হবে।'

'হাঁ, হাঁ ভাই সাবধানে চলাই ভালো।' ধুলা বলিয়া উঠিল।

কাণজী দুই-মানুষ উঁচু জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ফণীমনসার কাছে যে অশ্বথ গাছ তাহার কাছে গেল। এক মানুষ প্রমাণ উঁচুতে গিয়া দুইভাগের মধ্যে বসিল আর ঘাড় ফিরাইয়া অশ্বথ ডাল পাতলা দেখিয়া কাণজী তলোয়ার বাহির করিল। উপরে উঠিয়া কাঁটাগাছের ডালপালা কাটিয়া রাস্তা সাফ করিল আর পিছনে ফিরিয়া হীরাকে বলিল, 'এখন কিছু গ্রাহ্য করার নেই। গাছের কোটরে গর্ত এমন আছে যে পার হয়ে বাইরে আসতে পারা যায়। একটু আগের ডালও কেটে ফেলেছি।'

'আচ্ছা' বলিতে বলিতে মাঝখানে ধুলা বলিয়া উঠিল, 'ভালই করেছ কানা ভাই, সাবধানে থাকতেই'···কিন্তু হীরা তাহাকে কনুইয়ের ঠেলা দিয়া সাবধান করিয়া দিল!

যতই সময় কাটিতে থাকিল ততই কাণজীর অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। সে কান খাড়া করিয়া থাকিল। কিন্তু আজ তো তাহার কানকেও বিশ্বাস নাই।

কখনও কাহারো কথা, কখনও বা পায়ে চলার শব্দ কানে গেল। দিকও অদল বদল হইতে থাকিল। আপনি আপনি হাসি পাইতে লাগিল। মনে মনে বলিল—'যে ভয় পায় সে সর্বদাই ভয়ের কারণ দেখতে পায়।' কিন্তু এই সময়েই হীরা বলিয়া উঠিল—'কাণজী পিছন থেকে কেউ যেন আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

কাণজীর মনে তো সন্দেহ ছিলই। অল্পক্ষণ কান খাড়া করিয়াই সে বলিল—'ওঠ হীরা এ দিককার জঙ্গল হতে ওপারে বেরিয়ে যাই। তারপর কিছু পরোয়া নেই। খেতে অড়হর গাছ আছে, তাই কোনও বাধা হবে না।'

আওয়াজ পাশে আসিয়া গিয়াছিল। অশ্বত্থগাছের কাছে আসিতেই কাণজী ধুলাকে বলিল 'এই ফোকরের পাশ দিয়ে ওদিকে চলে যা।'

'আমি···? প্রথমে তুমি···।'

'ধেৎ!' বলিয়া কাণজী নিজেকে ঢুকাইয়া শরীর বাহিরে আনিল। সাপের মতো বাহির হইয়া ওপারে লাফ দিল। তলোয়ার বাহির করিয়া ওদিকেরও ডাল পালা সাফ করিতে করিতে বলিল, 'হীরা চল, ধুলিয়াকেও ঢুকিয়ে দে।'

ধুলিয়ারও মনে হইতেছিল যে, এখন তো নিজে বাহির হইতে পারিলেই মজা।

হীরা ধুলাকে ফোকরে যাইতে সাহায্য করিল। ধুলার মাথা তো ওদিক দিয়া বাহির হইয়া গেল কিন্তু কাঁধে আটকাইয়া গেল। ও ঘাবড়াইয়া গেল—সে কি বাহির হইতে পারিবে না নাকি?—চেষ্টা করিয়াও না হয় একটু সাহায্য করি।

লোকদের গলার স্বর ক্রমেই নিকটতর হইতেছিল। হীরা বলিল—'জোর করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়, একটু না হয় কেটে ছড়েই গেল বা! কিন্তু এতে তো আমাদের বিপদ ডেকে আনবে। নে আমি ধাক্কা দিয়ে দিচ্ছি। একজনের জন্য কি সবাই মারা পড়ব। নে, একটু জোর লাগা।'

ধুলার গা ঘামিয়া উঠিল। বলিল, 'কিন্তু ভাই সাহেব! উঁহু! না···।'

হীরার রাগ হইল, 'আর একটু শক্ত হ। নয়তো তোর কাকা এসে পড়বে।'

'কিন্তু মা-বাবা···'

দুইজনের বকাঝকা শুনিতে শুনিতে কাণজীর চোখে যেন ঘন ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তারার চমকের মতো লাগিল। সে দেখিল যাহারা আসিতেছিল তাহাদের ঝর্ণার উপর উঠা হইয়া গিয়াছে, আর আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে আসিয়া পড়িবে। ধুলিয়ার উপর তার বেজায় রাগ হইল। 'এ এসেছে স্ত্রী জোগাড় করতে!' বলিতে বলিতে সে ধুলার কাছে গিয়া, 'কি বেরোবে না কি' বলিয়া কাঁধ হইতে তরবারি নামাইয়া সরাসরি টান মারিল। টান মারিয়া বলিল 'হেইও।' আর তখনই তো 'বাপরে মারে' বলিতে বলিতে ধুলার কাঁধ ফোকর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

একটু কাঁপিতে কাঁপিতে কাণজীর যখন সম্বিৎ ফিরিল তখন বলিল, 'এরকমভাবে না বেরোলে বিপদ হয়ে যেত। আমি তো সত্যি বলতে কি ওকে কেটেই ফেলতাম।' ওর সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। ধুলার পিছে পিছে হীরাও নামিয়া আসিতেছিল, সেদিকে উহার খেয়ালই নাই। উহার তো বুক কাঁপিতেছিল আর মনে হইতেছিল—'মহা বিপদেই পড়েছি।'

চার পাঁচজন লোক যেন এদিকে আসিতেছিল কিন্তু যেমন আসিতেছিল কথা বলিতে বলিতে আবার সেই দিকেই চলিয়া গেল।

তিনজনেই একরকম স্বস্তি পাইল। ধুলার তো তখন পর্যন্ত ধক্ ধক্ করিয়া বুক কাঁপিতেছিল। কাণজীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা কাণা ভাই সত্যি বলতো, আমি যদি বেরোতে না পারতাম তুই কি সত্যি আমার মাথাটা কেটে ফেলতিস?

'কাটতে আর বাকি কি ছিল? হাত উঠিয়েই ছিলাম, হাত চালাতেই যা বাকি ছিল!' বলিয়া কাণজী জোরে নিঃশ্বাস নিল আর বলিতে লাগিল, 'খুব বেঁচে গিয়েছিস। ঘরে গিয়ে হরির লুট দে।'

'না, না, সত্যি বল কাণা ভাই কি মেরেই···'

এ সব ঠাট্টা মনে করিয়া হীরা কথার মাঝে বলিয়া উঠিল, 'আরে তুই কি মূর্খ নাকি! তুই চোরদের কথা জানিস না। এখন তুই একলা মরতে বসেছিলি, কিন্তু যদি তোকে জ্যান্ত ছেড়ে যেত তা হলে তোর সঙ্গে আমারও মরণ ছিল। সে জন্যে তুই নিজে না বের হলে আমাকেই তোর মাথা নিতে হত।'

এই কথা শুনিয়া ধুলার আবার কাঁপুনি শুরু হইল। মনে মনে বলিল, 'মরার মুখ থেকে বেঁচে উঠলাম।' আগেই ও কাণজীকে ভয় করিত। হীরার ভরসাও যেন আর বেশি রহিল না। এমন কথা মনে হইল, 'মর্ শালী মেয়ে মানুষ না আসে তো নাই এল। মঙ্গল মতো যদি ঘরে পৌঁছে যাই তো বুঝব গঙ্গাস্নান করে এলাম।'

'তোমরা দুজনে এখানে বোস হীরা। আমি ও-পারে গিয়ে দেখি। যদি ও আসে তো ডেকে নেব।' এই বলিয়া কাণজী যে রাস্তায় আসিয়াছিল তাহা ধরিয়াই ও পারে চলিয়া গেল।

হীরার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া ধূলা বলিল, 'যা ইচ্ছা হয় কর হীরা, কিন্তু আমি এই ফোকর থেকে ফিরে যাচ্ছি না।'

ধূলার উপর হীরার বেজায় রাগ হইল—'এ শালা তো এমন করছে যেন এখুনি মাথা উড়ে যাবে।' দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—'এখন কথা নয় চুপ করে থাক।'

ধুলা ভিজে ভিজে গলায় বলিল, 'কিন্তু ভাইসাহেব, আমায় আবার যেন বেরোতে…'।

'আরে এখন তো চুপ কর, বেরোবার সময় তো আসুক।'

'আচ্ছা তাই হোক' বলিয়া ধুলা চুপ করিয়া গেল।

মহুয়া গাছের কাছে আসিয়া কাণজী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর একমনে গাঁয়ের দিক হইতে যে রাস্তা আসিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। শেষপ্রান্তে এক কালো ছায়া চোখে পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনে হইল ছায়াটা যেন একই জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে। পরে কিন্তু বুঝিল ঐ ছায়া ঢিমে তালে উহার দিকেই আসিতেছে।

কাণজীর বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। এ যে জীবী তা যেন উহার বিশ্বাস হইতেছিল না। দেখার আগেই উহার সৌম্য মূর্তি যেন চোখের সামনে

নাচিতে লাগিল। কত প্রশ্নই মনে জাগিল—'আচ্ছা ও এসে কি কথা বলবে?' 'নিষেধ তো করবে না?' আবার ভাবিল—'বেশ মানা করে যদি দেয় সেই তো ভাল। নইলে, আমিই ওকে ফিরে যেতে বলব।'

ঐ রকম চিমে চলনে আসিয়া মহুয়া গাছের পাশে দাঁড়াইয়া গেল। কাণজীর অপরূপ বেশ দেখিয়া সে প্রথমে বোধ হয় ওকে চিনিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিল—'কে রে?' গলার স্বরে কিন্তু ভয়ের নাম গন্ধ নাই।

'এসে গিয়েছে।' বলিয়া কাণজী ওর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবে কি না ঠিক করিবার আগেই জীবী নিজেই তাহাকে বলিল, 'একা নাকি না সঙ্গে আর কেউ আছে?'

কাণজী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'এখানে এসে একটু দাঁড়াও। আমি এদের দুজনকে ডেকে আনি।'

'কোন দুইজন?' 'কোথায় তারা?' এ সব কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সে রাস্তার একপাশে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

'চল।'

কাণজীর পাথরের মতো কঠিন আওয়াজ কানে যাইতে ধূলা জিজ্ঞাসা করিল—'কি এসেছে?' কোনও স্বাভাবিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া ধূলা হীরাকে বলিল, 'হীরা ভাই, তুই আমাকে অন্য কোন ফাঁক দিয়ে...'

হীরার এমন রাগ হইল যে, পারিলে এখনই তাহাকে শেষ করিয়া দেয়। সে কাছে আসিয়া বলিল, 'তুমি যাও। আমি এই বেরোব।' এই বলিয়া পাড়ের ধারে ধারে চলিতে লাগিল। দুই চারবার হাত দুইটি দিয়াই রাস্তা সাফ করিল।

বাহিরে আসিতে আসিতে ধূলা কাণজীর পিছু পিছু যে ছায়া মূর্তি আসিতেছিল তাহাকে দেখিল। ছোট ছেলে খেলনা দেখিলে যেমন খুশি হয় ধূলাও তেমন খুশি হইয়া উঠিল। ধীর মুখ, স্থির সুন্দর চেহারা দেখিবার জন্য লালসা জাগিল। যেন কোন নতুন কথা বলিতেছে। এমন ভাবে হীরার কাছে আসিয়া বলিল, 'ঐ তো সে এসেছে না?'

হীরা ধূলার দিকে বাঁকা চোখে চাহিল। ওকে ধাক্কা দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া বলিল, 'যাবে তো দূরে দূরে থেকো। চুপচাপ চল।' ধূলার উপরে এত বেশি রাগ হইল কেন তা যেন হীরা নিজেও বুঝিতে পারিল না।

ধূলার মনে ভয়, 'এরা তিনজনে মিলে পথের মধ্যে আমার সাবাড় করে দেবে না তো? মেরে যদি মাটিতে পুঁতে রাখে তো কে তার সাক্ষী থাকবে।' আর যদি পিছনে হইতে আসা গাঁয়ের লোকগুলির ভয় না থাকিত তবে সন্দিগ্ধ ধূলা এই তিনজনকে যথেষ্ট দূরে রাখিয়া চলিত।

জীবীর চলার সঙ্গে তাল রাখিতে চাওয়ায় কাণজীকে খুবই ধীরে ধীরে চলিতে হইতেছিল। ইহাতে ক্লান্তিও আসিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে জীবীকে না বলিয়া যেন হীরাকে বলিতেছে, এইভাবে, 'একটু জোরে চল, এই ভাবে চললে কতক্ষণে রাস্তা পার হবে?' বলিল।

'ঠিক, হাঁ হীরা ভাই'—বলিয়া ধূলা ঝট করিয়া চলিল! হীরার তো তখন হুঁশই হইল না।

ইহারা দুইজনে জীবীর আগে আগে চলিল। কিন্তু ও তো গোরুর গাড়ি নয় যে তাহাতে জুড়িয়া জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিবে অথচ এই আঁধার রাতে এই পরিবেশে জীবীকে দূরে ফেলিয়া নিজে আগে আগে চলা কাণজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে মনে তাহার রাগ হইতেছিল—'এই যদি হয় তবে কি জবরদস্তি করেই ওকে 'হাঁ' বলিয়েছে! হয়তো তখনই মানা করে দিয়েছিল। আর এখনই বা এমন বিগড়ে গেল কেন, বললে তো ওকে ফিরিয়ে রেখে আসি।' কিন্তু তখনই রাগ হজম করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, একটু পা চালিয়ে চল।'

'তুমি নিজের মতো চলতে থাক, আমি নিজে নিজে তোমার পিছন পিছন আসছি।'

'কিরে, তোকে একা ফেলে যাব, এই অন্ধকার রাতে…'

'আমার তো কোনও বিপদই নেই' বলিয়া হীরা কাণজীর দিকে চাহিল।

'কিন্তু এতে তোর এত রাগই বা কেন', বলিয়া হীরা কাণজীর দিকে চাহিল।

'কিন্তু এতে তোরই বা এত রাগ কেন', বলিয়া কাণজী একটু আগাইয়া আবার থামিয়া গিয়া বলিল, 'এই-ই যদি মনে ছিল, তবে তো ঘর থেকে না বেরোলেই ঠিক ছিল।'

'বেরিয়ে ঝকমারি করেছি।' জীবীর এই কথায় গলার স্বরে রাগ, ক্ষোভ, অসহায়তা, উপায়হীনতা, এমনভাবে ফুটিয়া উঠিল যে প্রকৃত

প্রেমিকের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কাণজী হঠাৎ থামিয়া গেল। দুই পা পিছু হাটিয়া জীবীর কাছে আসিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি জীবী, যদি তোর ইচ্ছা না থাকে, শুধু আমি বলেছি বলেই এসেছিস্, তবে ফিরে যা। আমি যে ভাবে তোকে নিয়ে এসেছি সেই ভাবেই তোকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।'

'আচ্ছা এখন চুপচাপ চল তো, এসব চালাকি রাখ।' এই বলিয়া জীবী মিষ্টি দৃষ্টিতে কাণজীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আচ্ছা দেখা যাক্,' আরও জোরে জোরে পা চালাইয়া দিল।

কাণজী হাত উঠাইয়া বলিল, 'থাম থাম, দেখ্, এখনও সময় আছে। ওই যে বামন যাচ্ছে ওকে কি তোর পছন্দ হবে? যা কিছু বলার এখনি পরিষ্কার বলে দে, পরে যে আমাকে দোষ দিবি, তা কিন্তু হবে না।'

'যখন কথা নিতে এসেছিলে, তখন কি তোমার আক্কেল ছিল না এখন যে একথা বলছ? ঢের হয়েছে এখন, এখন এগিয়ে চল।' এই বলিয়া জীবী আস্তে কাণজীকে ঠেলিয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য কাণজীর এত রাগ হইল যে মনে হইল, জীবীকে মারিয়া ও নিজেও মরে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া সে জীবীর পিছনে পিছনে চলিল। ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত্রি যেন পূর্ণ যৌবন অতিক্রম করিতেছে। চারিপাশের জঙ্গল এমন নিস্তব্ধ যেন মনে হয় এই আঁধার রাতের পথিকদের দিকে শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বুনো শৃগালও ইহাদের দেখিয়া নিঃশব্দ পদে দূরে সরিয়া গেল। কাণজী আর জীবী একটা বড় গাছের নীচে আসিয়া পড়িলে নীচে হইতে একটা পেঁচার ডাক শোনা গেল। কাণজীর ভয় তো নাই, কিন্তু অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

একটা তীব্র আবেগ গলা পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। 'আচ্ছা চল ডানদিকে ঘুরে যা! বল তো, এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোনও দেশে আমরা চলে যাই।' আর যেন জীবীকে এই কথাই বলিতেছে, এমন ভুল করিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি এখনো সময় আছে, এখনও ফের।'

'কিসের সময়।'

ঐ রকম আবেশ ভরেই কাণজী বলিল, 'কিসের না জিজ্ঞাসা করে এখনও ফিরে যা।' আর বলার সঙ্গে কাণজী জীবীর হাত ধরিয়া একটু ঘুরাইয়া

দিল। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বিবশ কণ্ঠে জীবীকে আরও বলিল, 'ঠিক বলছি বুঝে দেখ। এখনও মন ঠিক কর। কেন নিজেকে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই ধোঁকা দিচ্ছিস আর কলঙ্ক মাথায় করছিস। একবার নরকে গেলে আর তো ফিরে আসা যায় না। বুঝে দেখ আমি ঠিকই বলছি, এখনো সময় আছে।'

কাণজীর এই কথায় বিশ্বাস না করিয়া জীবী রাগতভাবে আগাইয়া চলিল, আর বলিল, 'আমার সঙ্গে যদি আসবে তো চুপচাপ চল, নইলে পিছন পিছন একলা এসো।'

কাণজী তো একেবারে দমিয়া গেল। কিন্তু জীবী যখন সত্যই আগাইয়া চলিল, তখন ওর বিবশ ভাব ছুটিয়া গেল। জীবীর জোরে জোরে চলা ওর ভালই লাগিল। একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। 'মা বাপের ঘর ছেড়ে এসেছে। বাধা হয়ে এসেছে তাই দুঃখে বোধহয় এই চুপচাপ। আর ও যদি আসতে না চাইত, তবে কি ঘর ছেড়ে চলে আসত? মূর্খ আমি ওকে তো চলে আসতে বললাম কিন্তু ও কি জানে যে এরপর এখানেও ভাই ভাজের ঝামেলা আছে। আর সে যদি পর-দেশেই গিয়ে পড়ে তাহলেই বা কি আর এমন লাভ হত। কুকুরের মতো কিঁউ কিঁউ করেই মার খেত।'

এইসব বিচার বিবেচনার ফলে কাণজী এত সতর্ক হইয়া গেল যে মুহূর্ত পূর্বেকার অবিবেচনার কথা মনে পড়িয়া ওর বুক কাঁপিয়া উঠিল। ও মনে প্রাণে জীবীর উপকার করিতে চায়। এই প্রসঙ্গে ভগতজী যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইহার মনে পড়িল আর ভাবিতে লাগিল—'সত্য কথা যৌবনের জোশুযে অন্ধ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে', কিন্তু কত দিনের জন্য? যৌবনের নেশা কাটিতে কতক্ষণ? তাহার পরে তো জীবনভর শাপ দিবে। ঢাক পিটাবার মতো লোকের কাছে অনুতাপ করা ভিন্ন গতি থাকিবে না।

হীরা আর ধূলা অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল। সিংহের ছায়া দেখিলে শিকারের যা অবস্থা হয়, আশ-পাশ ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া চিতাবাঘের যেমন অবস্থা হয়, ভয় আর লোভের বশে ধূলারও সেই কথা, আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিয়া ফেলিল, 'হীরা ভাই, মনে হচ্ছে ও যেন দোনা মনা করছে।'

ধূলা পিছনে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছিল। হীরার আগে হইতে ধূলার

উপর একটু রাগ ছিল। এখন সুযোগ পাইয়া বলিল, 'তুই চুপচাপ চল তো! পিছন ফিরেই বা তোর কি হবে? কাণজী যতক্ষণ তোর সহায় আছে, তোর ভাবনা নেই।'

খুশি হইয়া ধূলা বলিল, 'এই জন্যেই তো কাণা ভাই ওকে এগিয়ে আনতে গেছে'—তারপর চুপ করিয়া থাকা উচিত জানিয়াও বলিয়া উঠিল—'একবার আমার ঘরে তো এসে পড়ুক, তারপর তো···'

হীরার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'তোর বাপ (কাণজী) শুনে নিলে হত, তোর ঘরে এনে তোলার কথা ছেড়ে দে'—কিন্তু মুখে বলিল, 'তুই এইসময় চুপ করে থাক।'

'আচ্ছা ভাই এই আমি মুখ বন্ধ করছি'—বলিয়া ধূলা চুপ হইয়া গেল।

ভোরের প্রথম মোরগের ডাকার আগেই ওরা উধরিয়া গ্রামের সীমানায় পৌঁছিয়া গেল।

স্বাগত জানাইয়া কুকুরটার সঙ্গে একটু খেলা করিয়া কাণজী একটা ছোট তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া গেল। ধূলার ঘর ঠিক পাড়ার সীমানায় তাই সামনের দরজা দিয়া ঢুকিয়া পড়ার কোনো অসুবিধা নাই, তবু কাণজী ধূলাকে বলিল, 'যাও গিয়ে পিছনের দরজা খোল।' একটু পরে হীরাকে বলিল, 'যা ভাই তুইও গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ব্যবস্থা কর। ওকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'হাঁ, হাঁ, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে আনি।' এই বলিয়া হীরা চলিয়া গেল।

দুই হাত পাশে চাপিয়া ধরিয়া আর মাথা ঝুঁকাইয়া জীবী পায়ের আঙুল দিয়া মাটি কুরিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া কাণজী বলিয়া উঠিল, 'জীবী'।

জীবী কোনো উত্তর দিল না। মহুয়া গাছ হইতে মহুয়ার রস টপ টপ করিয়া নিঃশব্দে পড়িলেও যেমন শ্রুতিগোচর হয় জীবীর চোখ হইতে টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়া অশ্রুধারার শব্দ তেমনভাবে কাণজীর কানে আসিয়া লাগিল। জীবীর কাছে যাইতে যাইতে বিড় বিড় করিয়া কথা বলিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল, 'এ বেচারী নিজেও তো জানে না—এ জন্মে তো তোকে আপন হাতেই ঠেলে দিলাম? কি করি,'

বলিয়া কাণজী একটা হাত জীবীর কাঁধের উপর রাখিয়া অন্য হাতে জীবীর মাথা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। জীবীর রুদ্ধ কান্না এতক্ষণে আর বাধা মানিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হেঁচকি উঠিতে লাগিল। ক্ষণিকের জন্য কাণজীর চোখের জল শুকাইয়া গেল। মনে হইল বলে, 'ভাল না লাগে তো চল্ চলে যাই।' কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই বলিল, 'কার মুখের গ্রাস···'আর জীবীর কাঁধে রাখা গলাটা পরিষ্কার করিয়া নিয়া বলিল, 'কিসের ভয় তোর? আমিও এই গাঁয়েই রইলাম। লোকের চোখে আমি যতই আলাদা হই না কেন, কিন্তু···।' এমন সময় কাণজীর কানে ধূলার গলা শোনা গেল, 'কাণা ভাই, দরজা···'কিন্তু সেই সঙ্গে কাণজীর বাহুপাশে জীবীকে দেখিয়া ধূলা চুপ করিয়া গেল। কাণজী আপনার বাহুপাশ হইতে জীবীকে মুক্ত করিয়া দিল। ধূলাকে কড়া নজরে একবার দেখিয়া লইল।

ইতিমধ্যে হীরা আসিয়া পড়িল। বলিল, 'আমি তোমাকে ঘরে যাবার জন্যই ডাকছি, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? আর কাণজীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'চল ভাই, কাঁটা বের করে দিয়েছি।'

হীরার 'এই কাঁটা তুলে দিয়েছি' কথাটা শুনিয়া কাণজীর হাসি আসিল। গভীর এক নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, 'তাহলে আমার আর এখানে কি দরকার? আমি ভগতজীর কাছে গিয়ে বসি' এবার সে উঠিবার জন্য পা বাড়াইল। পা ফেলিতে মনে হইল যেন পাগুলি একমণ ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

ভগতজীর বারান্দায় কাণজীর একটা কাশি উঠিল। ভগতজীর কল্কির কুলকুল শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভগতজী জেগে আছ না ঘুমোচ্ছ?'

ভগতজী জাগিয়াই ছিল। উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল, 'জাগতে হলে তো জেগে থাকতেই হয়, ঘুমিয়ে থাকলে কিন্তু নির্ভয়।' ভগতজী উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসিয়া বলিল, 'কি হে একটু যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে।'

'তোমার আশীর্বাদ পাওয়ার পর সব তো ভাল হবারই কথা। এখন একটু তামাক তো খাওয়াও। তামাকের অভাবে মরে যাচ্ছি।'

হুঁকা ভরিতে ভরিতে হীরাও আসিয়া পড়িল। তার পিছনে ধূলাও আসিয়া হাজির। যদিও এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও সে খুব কমই ভগতজীর ঘরে আসিত। নিজের পকেট থেকে তামাকু বাহির করিয়া বলিল—'এই তামাক নাও না?'

কাণজীর হাসি পাইল। 'কেন, ঐ হুঁকায় কি ছাগলের লাদি ভরা?'

ভগতজীর মন একটু খারাপ হইল। 'ও বেচারী ভালবেসে এনে দিয়েছে, এই কল্কে শেষ হলে ভরার জন্য ওর তামাকটি রেখে দাও।' বলিয়া ধূলার হাত হইতে তামাকটা নিয়া একধারে রাখিয়া দিলেন।

ধূলাও আস্তে আস্তে ঐ আস্তানায় জমাইয়া বসিল। ও কিছু বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারিতেছিল না। দিনের আলো থাকিলে তো ভগতজী আগেই বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এখন যদিও উহার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না তবু বলিলেন, 'হীরা এখনও চুপচাপ বসে আছিস্ কেন? আর এক ঘণ্টা বাদেই তো চতুর্দশীর রাত ভোর হয়ে যাবে। জন দুচারকে ডেকে এনে বিবাহ বিধির সব ব্যবস্থা করে ফেল্।' একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, 'আর লোক ডাকারই বা দরকার কি আমিই তো আছি। হ্যাঁ গীত গাইবার জন্য দুচারজন মেয়েকে ডেকে আনতে হবে।'

কাণজী বলিল, 'আমার দ্বারা কিছুই হবে না'—বলিয়া ভগতজীর বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ কাণা ভাই তুমি ঘুমোও, 'বলিয়া ধূলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া হীরাকে অনুরোধ করিল, 'হীরা ভাই তুই উঠে পড় তোর বাড়ি থেকে কংকু বৌদি আর নথিকে (হীরার বোন) ডেকে আন্। আর ঐ পথেই বাসা কাকাকেও তো খবরটা দিতেই হয়, তুই এইটুকু কর হীরা।'

মুখ দিয়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে হীরা হাসিয়া ফেলিল। তামাকের ধোঁয়ায় তাহার একটা কাশিও আসিয়া পড়িল। হুঁকাটা ভগতজীর হাতে দিতে দিতে বলিল, 'ধূলাকে নাকি ভোলা বলে, দেখ্ না আরও কত হয় শেষ পর্যন্ত।'

'ভগতকাকা এই রকমই তো হয়। তা দেখ মোড়লকে যদি না ডাকি কাজটা বড় খারাপ হবে। না হলে আর সবাইকে বলার দরকার কি?'

হীরা এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'থাক্ থাক্ তোকে আর সর্দারি

করতে হবে না। তুই কুঙ্কুম, চন্দন এইসব জরুরি জিনিস যোগাড় কর।' বলিয়া পোড়া কয়লা নিতে নিতে ভগতজীকে বলিল, 'ভগতজী মজা দেখ, ঐ নাপিত তো বলে তুমিও নাপিত হয়ে যাও।'

ভগতজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কখনো কখনো তা-ও হয়।'

ধূলা বলিল, 'না ভাই কক্ষনো নয়। তোর ছেলের বিয়ে হোক তখন দেখবি—তাকে যদি এক কল্কী তামাকও সাজতে দিই, তখন ধূলিয়াকে যা খুশি করিস'—বলিয়া চোখ টিপিয়া ধূলা বাহির হইয়া গেল। হীরা গাঁয়ের দিকে রওনা হইল।

ভগতজী একটু চিন্তামগ্ন ছিলেন এখন বলিলেন, 'কাণজী, তোকে তো বলি যদি নিয়ে এসেছিস তো মুখ রক্ষা করা চাই।' আর হাতে ঘটি আর কাঁধে ধুতি নিয়া বলিলেন, 'এমন যদি হয় তো ঐ কোণে খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়, এখানে তো শোরগোল হবেই, আর ঘুম এলেও তো ভেঙে যাবে।' বলিয়া নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী আজ অবশ্য একটু শীঘ্র নদীর দিকে চলিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা ধূলার ঘর ভরিয়া ফেলিল। ধূলার একটি ভাই ছিল—দশ বারো বছরের। সে মোড়ল আর অন্য দুই চারজন প্যাটেলদের ডাকিয়া আনিল।

একে তো ধূলার ঘরে খাওয়া দাওয়ার কোনও অভাব ছিল না, তাহাতে আবার এই অভাবনীয় ঘটনা! ধূলা সকলের অজান্তে একটি মেয়েকে পছন্দ করিয়াছে।

তাহাতে আবার হীরার মতো উদার ব্যক্তি হর্তা-কর্তা! মিষ্টি বিতরণেই বা কি করিয়া কম করা যায়।

এই অসময়ে বিয়ের আনন্দে বিভোর যুবক যুবতীদের মঙ্গলধ্বনি এই শীতল প্রভাতের আশ-পাশের গৃহগুলি ছাড়িয়া নিকটের গ্রামবাসীদেরও ভাবাইয়া তুলিল, 'আরে ভাই, ঐ উধরিয়া গাঁয়ে মোরগ ডাকার সঙ্গে ঐ যে আওয়াজ আসছে তার ব্যাপারটা কি?'

সামনের থেকে আর একজন বলিল, 'কারু কি ছেলে হল নাকি? এছাড়া কি-ই বা হতে পারে?'

'আর ভাই উধরিয়া গ্রামের যুবকদের কথা আর বোলো না। বিয়ে তো

সময়মতই করবে না, কিন্তু গাছের চারা রোয়ার মতো এমন ঘটা করবে যেন একমাত্র সন্তানের বিয়ে হচ্ছে।'

একজন একথা বলিল। অপর কেহ নিজের যৌবনকালের কথা মনে করিয়া বলিল, 'যাক্ কিছু কারণ নেই এরকম অকারণেও অনেকে মিলে গান বাজনা করাই বা মন্দ কি ?'

কাছাকাছি গাঁয়ের লোক তো এই রকম মনে করিল আর যাহারা অনাত্মীয় প্রতিবেশী তাহাদের কথাই আলাদা! যাহার ঘুম ভাঙিল সে-ই পাড়াপড়শিকে জাগাইয়া দিল। এইভাবে ইহাকে উহাকে প্রশ্ন করিতে করিতে উহারা ধূলার বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল। হীরা এক বড় সরাতে গুড় ভরিয়া আঁজলা আঁজলা গুড় সবাইকে দিতেছিল, ইহাদের আসিতে দেখিয়া বলিল, 'খাও, ঘরে গিয়ে দেখ কি ব্যাপার।'

অনেকের তো হঠাৎ মনে হইল যেন রামলীলার অভিনয় হইতেছে। ধূলার চেহারা আর পোষাকও কতকটা রামলীলার বিদূষকের মতো। দেওয়ালিতে পরিবার জন্য যে নূতন আঙরাখা সেলাই করিয়া রাখিয়াছিল তাহা আর গায়ে লাগিতে চায় না। এমন মোটা কাপড়ের শক্ত ধুতি (ধূলার এই পোষাক তো মজদুরদের ফাটা কাপড় পরা লোকদের হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিয়াছিল) ছাড়া কপালে বুড়ো আঙুল দিয়া পরানো কুঙ্কুমের লম্বা তিলক, হাতে লুকানো মুঠাভর চাউল, গলায় চার-পাঁচ পাক রঙিন সুতির হার—এইসব মিলিয়া ধূলার চেহারা একদম বদলাইয়া গিয়াছে। ডান হাতে রঙিন সুতোর বাঁধন বাঁধিতেও কৃপণতা সে করে নাই। কিন্তু ইহাতে হীরার দোষ ছিল না। সে তো নিয়ম অনুযায়ী দুই তার সূতাই বাঁধিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ধূলাই বলিল, 'রঙিন সুতি বেশী খরচ হলেও ভয় পেও না হীরা ভাই, ঘরে আর এক গোছা আছে।' হীরার রাগ হইল, সে তিন আঙুলের সমান সুতা বাঁধিয়া দিয়া ধূলার ইচ্ছা পূরণ করিল।

ঘরের ভিতরকার স্ত্রীরা মেয়েরা দুই দলে ভাগ হইয়া একে অপরকে গালি দিয়া গান করিতেছিল।

বারান্দায় গাঁয়ের বুড়োরা আধবুড়োরা মিলিয়া এই কথাই আলোচনা করিতেছিল, এ ব্যাপার কি করিয়া সম্ভব হইল। কাণজী আর ভগতজীর

সুখ্যাতি করিয়া (ভগতজীর সুখ্যাতি এইজন্য যে তার সহায়তা ছাড়া কাণজী আর হীরা ইহা ঘটাইতে পারিত না) তাহারা আফিম গুলিয়া খাইতেছিল এবং হুঁকাও টানিতেছিল।

অঙ্গনের ঘেরার মধ্যে মেয়েরা এমন জমিয়া উঠিয়াছিল যে, যাহাদের যৌবন ছিল না এমন নারী পুরুষও বিগত যৌবনের আনন্দ পাইতে বৃত্তাকার গানের দলে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছিল।

প্রভাত হইলে তাহাদের চেতনা হইল। 'আমার তো এখুনি গোরু দোহাতে হবে।' 'আমার তো এক চুট্‌কি আটা ঘরে নেই।' 'হায় হায়! আমার মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল।' এইরকম সব কথা বলিয়া একে একে তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় যাহারা বসিয়াছিল, আফিমের নেশা তো এখনও ধরে নাই—ভাল রকম খাওয়ার মুখে বলিয়া উঠিল—'খুব চমৎকার। ভগবান দয়া করেছেন, নইলে ধূলিয়া তো বাদই পড়েছিল।' কেহ বা 'ঈশ্বর ওকে সুখে রাখুন। ওর জীবন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হোক' এই আশীর্বাদ করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। অঙ্গনের গানের বৃত্ত ভাঙিয়া গেল। বিদায় দিতে আসিয়া দাঁড়াইলে পর ধূলার দিকে দুই চারিজন স্ত্রীলোকের চোখ পড়িল—উহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়া ধূলার দিকে চাহিয়া গান ধরিল—

'শোন্‌রে ছোঁড়া তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি,
ধূলো-কুঁড়োর ঝুড়ি নিজের মাকে সঁপে দাও,
আমাদের জীবী বোনকে সাঁঝের রান্নার ভার দাও।
জলের কলসির ভার নিজের ভাবীর উপর দাও
তালা চাবি আমাদের জীবী বোনের হাতে সঁপে দাও।'

এই কথা শুনিয়া ধূলার বুকে রক্ত চলকে উঠল। কিন্তু জীবীর কি হইল? ভিন্ন গাঁয়ের মেয়ে অচেনা জায়গায় অজানা লোকের মধ্যে আসিয়া পড়ায় জীবীর চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

একজন মাত্র পরিচিত লোক ছিল। সে এখানে তো 'আরে কাণজী কোথায় গেল' এই প্রশ্ন শুধু শুনিতেছিল। উহাকে তো একবারও চোখে দেখিল না। এই প্রশ্নের উত্তরই বা কে দেবে? বিছানার এপাশ ওপাশ ফিরিতে ফিরিতে কাণজীর মনেও ভয় হইতেছিল। কথা যে কাণজী না

যাইলেও তাহার মুখের ভাব দেখিয়া এতসব লোকের মধ্যে কেহ না কেহ টের পাইয়া যাইত। সেইজন্যই সে উহাদের দেখা দিতে চাহিতেছিল না। ওখানে ওর মুখের হাসি বা নির্বাক অবস্থায় ও ধরা পড়িতই।

নাগকন্যার আশ্চর্য কাহিনীর মতো জীবীর কথাও গাঁয়ে চালু হইল। ওর নিজের দলের মধ্যেই কেহ বলিল—কাণজী যদি আনিলই তবে নিজের ঘরে রাখিলেই হইত, কিন্তু হীরা আর ভগতজী ওকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিয়াছে। ওকেও (জীবীকেও) ওঁরা অনেকক্ষণ ভগতজীর ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন। কাণজী একটুও টসকায় নাই। শেষ পর্যন্ত উহার বড়ভাইকে ডাকিয়া আনা হইল। সে কাণজীর সামনে কান্নাকাটি করিতে লাগিল। কাণজী কিন্তু সে কথা মানিয়া লইল বটে কিন্তু রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার পর ভগতজী আর হীরা ভাবিতে লাগিল, এই বেটিকে নিয়া কি করা যায়? মোরগ ডাকিয়া উঠিবার সময় হইল। এখন ফিরিয়া যাইতে হইলে তো ভোর হইয়া যাইবে। আর এক কথা, এ বেচারি তো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কাণজীর ভাইয়ের ভয় হইল যে আজ না হয় কাল কাণজী ইহাকে লইয়া পলাইয়া যাইবে। সেজন্য এই হাত কাটা ধূলিয়ার সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। ধূলিয়ার পক্ষে তো এ যেন ভগবানের আশীর্বাদ! নতুবা ধূলিয়ার কপালে এই পরীর মতো সুন্দরী স্ত্রী লেখা ছিল?

কেহ বা আবার বলিয়াছিল, 'এ বেচারির কোন আত্মীয় কুটুম্বও নেই। বাপ আছে কিন্তু সে তো আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। তাছাড়া আছে সৎ-মা। ঘরে তো ওর হুকুমেই সব চলে। এ জন্যই ও (মা) নিজের বাপের বাড়ির মধ্যে যে কেউ কানা খোঁড়া কিংবা বুড়ো বাঁদর তার সঙ্গে··· এই রকম বলেই তো ও ঘর ছেড়ে বার হয়েছে। সে নিজের মনেই চিন্তা করল ভালো কোন পাত্র পেলে কি আর ধূলিয়ার মতো রোগাটে লোককে কেউ খুশি হয়ে বিয়ে করে?'

কেহ বলিল, 'ভগতজীই যত নষ্টের গোড়া। এই ষড়যন্ত্র সবই তাঁর। উনি ধূলিয়াকে তুকতাক করেছেন। বলেছেন—'যদি স্ত্রী চাও তো এমন

কিছু করো।' 'কিন্তু এ বেচারির জীবনটা তিনি নষ্ট করে দিলেন।'

কেহ বা একথায় বাধা দিয়া বলে—'আরে রাখ রাখ। জীবন নষ্ট-করার এতে কি হোল? এ না হলে এর ভাই করত! কাউকে না কাউকে তো খুঁজতে হোত। বাকি সবাই কি কার্ত্তিক? আর সত্যি জিজ্ঞাসা কর তো সুন্দর স্বামীর চেয়ে এই তো ভাল, নয় কি? স্বামী সুরূপ না হওয়াই ভাল। সুরূপ হলে তো তোমার আমার মতো মেয়ের নজর পড়ত আর বউটির জীবন যেত।'

কালীর মতো কেহ বা আবার মেলায় নাগরদোলার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় চুপিচুপি বলিল, 'এই ধূলিয়ার আবার এদিক ওদিক বাহানাও আছে। কাণা ভাইকে তুমি কাঁচা ছেলে মনে কোরো না। দেখে নিও! যদি বেঁচে থাক, তবে মনে ক'রো কালী কি বলেছিল?'

আর এ রকম শুধু একরকম কথা নয়, অনেক কথা তাহারা বলিতে লাগিল।

এই সব আলোচনা বেশির ভাগই মেয়েদের মধ্যে হইত; বিশেষতঃ জল আনিবার ঘাটে। বাকি কয়েকজন বুড়া ছাড়া পুরুষদের মধ্যে কাহারো এই সব আলোচনার অবসর ছিল না। একদিন গোলা বাড়িতে ধানের 'দাঁয়'[1] চলিতেছে, অপর দিকে রবিশস্যের জন্য ক্ষেতে লাঙল চালনা হইতেছে। রাত্রিতেই যা দুই এক ঘন্টার ফুরসত মেলে। কিন্তু এই অবসর সময় তো অনাদিকাল হইতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গানেই কাটে।

দেওয়ালির দিন আসিল আর গাঁয়ের আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া গেল। লোকে যাহাদের ঘৃণা করে এমন দুই একজন ভিন্ন সকলেই দুই দিনের জন্য কাজকর্ম শিকায় তুলিয়া রাখে। সাধারণ দিনে যে সব ছেলেরা স্নানের সময় কান্নাকাটি করে, আজ তো তাহারাই ভোর বেলায় স্নান করিয়া ফুলদার পোষাক পরিয়া মোড়লের বৈঠকের দিকে রওয়ানা হইল। খাটে বসিয়া মুখে তুড়ি দিয়া হাই তুলিয়া আফিম চাহিয়া হুঁকা হাতে মোড়লের বৈঠকে আসিয়া দেওয়াল ঘেষিয়া তাহারা বসিয়া গেল। মেয়েদের

১ গম যব ছোলা ধান ইত্যাদি ফসল কাটিয়া একত্র করিয়া তাহা ঝাড়া

তো রোজকার মতোই কত কাজ। আর তাছাড়া কোনোও সভাসমিতিতে যাওয়াও নিষেধ, তবু 'আজ তো দেওয়ালি' এই খুশির ভাব তাহাদের চোখে মুখে হাঁটা চলায় প্রকট। আর জোয়ানদের কথা তো বলারই নয় তারা তো সকলে আপন আপন ফূর্তিতে চলিয়াছে আর গাহিতে গাহিতে মোড়লের বৈঠকে আসিয়াছে। বৈঠকে আসিয়া নিজেদের গানের লাইন বাদ দিয়া ঐ খানে যেমন গান গাওয়া হইতেছিল তাহার সুরে সুর মিলাইয়া দিল এবং এই পরিবেশে নিজেদের হারাইয়া ফেলিল।

এখনও গানের আসল রঙ্গ জমিয়া ওঠে নাই। দুই একজন রসিক বৃদ্ধ তো বলিয়া উঠিলেন, 'আরে একি গান হচ্ছে না তামাসা হচ্ছে? গলার স্বর আর একটু উঁচুতে চড়াও।'

উত্তরে কেহ বলে, 'তাতে কিছু এসে যায় না। এখনই ঐ রাঙা আড্ডা (কাণজী আর হীরার আড্ডাকে রাঙা আড্ডা বলা হইত) থেকে লোক আসতে দাও। তখন দেখাব রঙ্গ।' আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ আড্ডা থেকে গানের আওয়াজ শোনা গেল। হৃদয়ের আবেগ হইতে গাওয়া গানের স্বরের মিষ্টতা ও মাদকতা অন্য এক জিনিস। কাণজী হীরা আর তৃতীয় এক ব্যক্তি পরস্পরের কোমরের কাছে পকেটে হাত ঢুকাইয়া এমনভাবে টলিতে টলিতে গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল যেন উহারা মদের নেশায় চুর হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে চারটি জোয়ানের গানের সুর মিলিয়া গেল।

'বিয়ে করছে ভোজামঙ্গলের সীমানার বেড় আর ভোজ গোপাল! বুলু জিজ্ঞাসা করছে, 'কোথা থেকে আনবে জঙ্গলে বাজনা, কোথা থেকে আনবে সানাই?' ভোজা উত্তর দিচ্ছে, 'যে একশো পঁচিশ জন দোলায় আছে তাদের মধ্যেই আছে ঢুলির বেটা!'

আর এইরকম গাহিতে গাহিতে ঐ মহল্লার লোকও বৈঠকে আসিয়া পৌঁছাইল। সমস্ত আসর যেন ইহাদের অধীন এইভাবে সকলে ইহাদের জায়গা ছাড়িয়া দিল। গান গাইয়েরা দুই ভাগে বসিয়া একের পর এক গান গাহিতে লাগিল।

গান চলিতেছে। নানাপ্রকার বাধার উল্লেখ করা হইল। নারিকেল কোথা হইতে পাওয়া যাইবে এই প্রশ্ন তাহারা তুলিল।

ইহার জবাবও ভোজার কাছে তৈরি—'আমাদের বনে অগুনতি বেল গাছ আছে, তারা খুশি হয়ে আমাদের কাজ করে দেবে।'

সন্তোষজনক উত্তর দেবার পর ভোজা শেষ পর্যন্ত ওকে বিবাহ করিতেছে।

গানের এই অংশ শেষ হইলে কাণজী চুপ করিয়া রহিল। সম্মুখে দেওয়ালের পাশে উপবিষ্ট ভগতজীকে বলিল—'ভগতজী এইবার তামাক খাওয়াও।'

'আরে ভাই, নাও নাও, কেন পাবে না?' ভগতজীর কাছে উপবিষ্ট একজন আফিমখোর কথা বলিল, আর সম্পূর্ণ হুঁকার তামাকের ধোঁয়া টানিয়া লইয়া কাণজীর হাতে আগাইয়া দিবার সময় আবার হুঁকাটি দুইবার টানিয়া লইল।

আশপাশের লোকের সঙ্গে কাণজীও কাশিয়া উঠিল। হুঁকা ফিরাইবার জন্য যে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহাকে ঘিরিয়া বালকেরা বাজী পুড়াইতেছিল। আর একদিকে হাতের তালুতে আফিমের রঙ ভরিয়া লইয়া সকলে একে একে পরস্পরের সম্মুখে আগাইয়া দিতেছিল। 'আর আজ দেওয়ালির দিনে কিনা বলতে হয়? আমার হাত কি পিছে সরিয়ে নেব? বার মাসে একদিনই তো পরব! একদিন আমোদ করতেও কি 'না' বলবে?' এই ধরনের আমোদ প্রমোদে বৈঠক গুলজার হইয়া উঠিল।

গান বন্ধ হইল বলিয়াই হউক আর ঐ প্রেমের কাহিনীর রসমাধুরীতে চরাচর সকল প্রাণীর বিরহ বেদনা অনুভব করিয়াই হউক ইহার পর একরকম গভীর নিস্তব্ধতা সকলের হৃদয়কে ঘিরিয়া রহিল।

ইহার পর সুখড়ী[১] হালুয়া কনে করা হইল আর মণ্ডলী ধূলার নতুন বৌয়ের সম্বর্ধনার জন্য আয়োজিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উহার ঘরে গিয়া বসিল। কাণজীর 'হুডা' (এক ধরনের গান) তো চালু ছিলই…ভোজার সঙ্গে কথায় কথায় যার বিয়ে হইল সেই বেলু এখন বড় হইয়াছে।

রাণা উহার বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। রাণার কথা কে

১ আটা ঘি আর গুড় দিয়া প্রস্তুত এক রকমের খাদ্য বস্তু, যাকে আলাদা জমাইয়া বরফির আকারে কাটিয়া খাইতে দেয়।

ঠেলিতে পারে? উহার অপেক্ষা সুন্দর জামাই আর কোথায় পাওয়া যায়? রাণা ভোজা গুজরাকে বরযাত্রীদের দলে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ পাঠাল।

'ভোজা তোমার ঘোড়ায় চড়ে আমার বরযাত্রায় তুমি শীগ্‌গীর এসো।'

বনভোজনের মাঠে গোরু চরাইতে চরাইতে বেলুর নিজের বিবাহের কথা মনে পড়িয়া যায়। সে চিন্তা মগ্ন হইয়া পড়ে। মনের এই দুশ্চিন্তা ঝালোর গাভীর[1] (কামধেনুর) কাছে ব্যক্ত করে।

ঝালোর গাভীর সম্মতি পাইয়াছে মনে করিয়া চরিতেছিল এমন গাভী বাবলি (স্ত্রী ঘোড়া) কিনিয়া লয়।

'রাণার বাড়িতে ছত্রিশটা সানাই বাজছে আর গুজরারা ঢোল বাজাচ্ছে।'

রাণার নিমন্ত্রণে খাওয়ার অপেক্ষা বনভোজনের দল নিজেরাই তখন বরযাত্রী সাজাইয়া চলিয়া যায়। সওয়াল গুজরের সঙ্গে ভোজাও রাণার প্রতিবেশী হইয়া যায়।

বেলুর বাবা ধান্ধায় পড়িয়া যান। শেষে ইস্পাতের দরজা ভাঙিবার ও উঠিয়া লাফাইবার কঠোর শর্ত রাখা হয়। কিন্তু ইহাতে তো ভোজারই হয় জয়। বেলুর বাপের সঙ্কট আরো বাড়িয়া যায়। দুইজন দুলহ (বর) তোরণের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়। রাণা তোরণের উপর ফেলিয়া দেয় জরির ধুতি আর ভোজা ফেলিয়া দেয় গলার হার। এই কথা জানিয়া বেলু বলে—

'ধুতি তো ছিঁড়েই যাবে রাণা, কিন্তু আমার বুকে থাকবে ঐ হার!'

তবুও বেলুর বাবা নিজের মেয়েকে রাণার সঙ্গে বিবাহ দেন, রাণা বেলুকে লইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু,

তিনটি রাস্তা আসছে, তিন দিক থেকে
বেলু রাগ করে বসে আছে—যেহেতু সে নারী

আর, যে বেলু বিবাহের আগে পর্যন্ত বাবার সামনে মুখ খোলে নাই, সে জঙ্গলে রাণাকে সাফ্ বলিয়া দিতেছে—রাণা,

রাণা তোমার কাছে যাব কি করে
তোমার মুখে মোচ (গোঁফ) নেই

---

১ ঝালোর রাজস্থানের একটি প্রসিদ্ধ স্থান, এখানকার গাভী প্রসিদ্ধ

এই লাইন শেষ করিয়া কাণজী এক যুবকের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—'মেয়েদের এমনই হতে হবে!'

'এ তো সত্যযুগের কথা—এই কলিযুগে তো এই রকম…'

এইরূপে বলিতে বলিতে কথার মাঝখানে কাণজী বলিল, 'ঠিক আছে রে, বাবা, আজকাল তো উল্টো, সামনে যারা আছে তাদের মাথা কেটে নাও।' আবার নিজের পালা আসিলে গীত গাহিতে লাগিল।

এইখান হইতে তো বেলুকে যাইতে হয় কিন্তু ইহার মধ্যে পথে একটা মদের দোকান পড়ে। রাণার সঙ্গী সাথীরা মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া যায়। এই অবস্থাতে বেলু দোকানীর স্ত্রীর কাছে লুকাইয়া থাকে।

পিছন হইতে ভোজাও মদ খাইবার জন্য সেখানে আসে। বেলুর পায়ের চিহ্ন তাহার নজরে পড়ে। সে দোকানীদের জিজ্ঞাসা করে—সত্যি কথা বলরে কলারি। তোদের ঘরে কোন্ সে মেয়ে আছে। ভোজা ও বেলুর প্রেমের কথা জানে না বলিয়া দোকানীর স্ত্রী কথা উড়াইয়া দিতে চাহিল কিন্তু ভোজা সে কথা মানিল না। শেষে বেলু ভোজার হাতে আসিল।

ইহার পর যখন সুখে জীবন কাটাইবার সময় আসিল তখন ধুলা তাহার দরজায় দাঁড়াইয়া কাণজীকে ডাকিল—কাণজী ভাই, একটু এদিকে এসো—কাণজী ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

'একটু সুখড়ি বানাইবার কায়দাটা বলে দাও।

'দেখ, এতখানি আটা…'

'—হীরাই তো তোর পাশে বসে আছে, আমাকে আবার…'

'তা হলেও তুই বলে দে না, নে, কিছু যদি কাজ না-ই থাকে, এখানে বসে তামাক খা।' হীরা হুঁকা রাখিয়া দুই হাতে আটা লইয়া আন্দাজ করিতে লাগিল উহার কয়সের ওজন হইবে।

কাণজী খাটের উপর বসিয়াছিল। সম্মুখেই নূতন কাপড় পরিয়া জীবা বসিয়াছিল। নানী বুড়ি আটার থলি লইয়া উঠিল, জীবীর মুখ খোলা দেখিয়াই বলিল 'হায় রে হায় বৌয়ের সামনে কাণা বসিয়া আছে একটু ঘোমটা দাও তো।'

যদি বলা যায় যে ইহাতে কাণজী চমকাইয়া উঠিল তবে অনুচিত হইবে

না। যে মুখ দেখিয়াই সন্তোষ হইত তাহাও চিরকালের মতো বন্ধ হইতেছে। ‘আরে পাগল হয়েছ নাকি? দলে দেখেও কি ঘোমটা দিতে হবে? আমার আর ধূলার তো একই বয়স!’

তাও তো এক আধ মাসের বড হবেই। যেদিন তোর মা স্নান করে এল সেইদিনই ধূলিয়ার…

হীরা বলিয়া উঠিল—‘ওহো বুঝেছি। তুই এক বছরের তফাৎ হলে ঘোমটা দেওয়া না দেওয়ার মানে হয়।’

ধূলা বলিল—‘ঘোমটা দিলেই বা কি? এই তো’ বুড়িকে নিজের দিকে ঘুরিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল—‘তুই আমার দিকে এমন করে দেখছিস কেন মা? ঘি-গুড কখন আনবি?’

কাণজী এ পর্যন্ত ঐ ঘোমটার কথায় ভাবে বিভোর ছিল। যে কথা জিহ্বা হইতে আনিতে হয়তো মাসের পর মাস লাগিত—তাও অনেক চেষ্টার পর—তাহা চট্ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—‘না-রে জীবী বৌদিদি, এমন এক মাসের কম বেশীতে দেওয়ার কথা ওঠে না বুঝেছিস্। ছোট কাকী তো অমনি বলছেন।’

‘আমি কি আর পিছনে পড়ে আছি। ও তো আজ আমার চোখে পড়ে গেছে বলে, তাই আমি বলেছিলাম, ঘোমটা দিলে ভালো হতো, ‘নইলে না দিলেই বা ক্ষতি কি?’ ঘিয়ের পাত্র লইয়া আসিতে আসিতে নানী বুড়ি বলিল। ইহার পর ঘি ঢালিতে ঢালিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল—‘জীবার বাপ ও আমার এই তোমাদের মতো হয়েছিল। প্রথমবারই শ্বশুর বাড়ি এসেছিলাম। জীবী বৌয়ের মতো আমিও মেয়ে হয়েই এসেছিলাম। এমনি করেই বসেছিলাম। ওদিকে ঘর থেকে আমার শ্বাশুড়ি…’

‘ওরে তুই একবার গুড এনে দে’, ধূলা রাগ করিয়া বলিল।

বুড়ি কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিল। এই সুযোগে কাণজীও উঠিয়া গেল।

বাহিরে যে সব যুবক গীত গাইতেছিল তাহারা বেলু ভোজার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের ভাগ শেষ করিয়াছিল। সুকঠোর হৃদয়কেও গলাইবার মতো যে শেষ অংশ, সেইখানে আসিয়া কাণজী যোগ দিল।

সন্ধ্যার বাতায়নে দাঁড়াইয়া বেলু পশ্চিমে দেখিতেছে। সংশয় দোলায়

তুলিতে তুলিতে মন প্রশ্ন করিতেছে—'রোজ তো সন্ধ্যায় ইহার আগেই গাভীদল লইয়া ফিরিয়া আসে—আজ কেন এত দেরী? ইতিমধ্যে গাভীর দল আসিয়া দাঁড়াইল।

বেলু ভাবিতেছে—

নিত্য আসে সিধা রাস্তা দিয়া,

আজ কেন সবুজ ধানের পথে?

বলিতে না বলিতে ঝালোরের গোরু আসিয়া পড়িল। তাহার শিং রক্তমাখা দেখিয়া বেলুর প্রশ্ন—

'কোথায় রাঙালি শিং মাগো, রেখে এলি কোথা ভোজা গোয়ালাকে?'

উত্তরে গোরু বলিতেছে—

ওপারে আছে সাপের গর্ত গাদা

সাপ মারতে গিয়েই আমার শিং রাঙা হয়েছে।

পুনরায় বেলুর প্রশ্ন :

ভালোই রাঙিয়েছে শিং মাগো,

কিন্তু কোথায় রেখে এলে ভোজা গোয়ালাকে?

কিছুক্ষণ গল্পসল্পের পর গোরু বলে—

ছোট নিমগাছের নীচে ভোজা আছে শুয়ে,

গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

চাদর দিয়েছে মুড়ে গায়ে টান টান।

গোরুর এই কথা শুনিয়া আর তার রক্তরাঙা শিং দেখিয়া বেলু বুঝিতে পারিল। একবার গোরুকে ভর্ৎসনা করিল, জ্ঞান হইতেই শোক ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—

ভোজা গেছে তাতে কোনো কথা নাই,

কিন্তু সেকি পথ পানে চেয়ে আছে বেলুর আশায়। গোরুকে সঙ্গে করিয়াই বেলু বনে চলিল। ভোজার মৃতদেহ কোলে লইয়া চিতায় উঠিয়া দিব্যগন্ধের মধ্যে বেলু জ্বলিয়া উঠিল—

বনের মধ্যে আনন্দে ভোজাকে বিবাহ করেছিলাম,

আগুনে পুড়ে যাব ভোজার সঙ্গে।

শেষ হইতেই এই করুণ প্রেমকথার শেষ পঙ্‌ক্তি কাহারও চোখে অশ্রু

জাগাইল। কাহারো মনে মনে নিঃশ্বাস পড়িল। কাণজী একভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দূরে বসা ভগতজীকে বলিল—'ইহারই নাম প্রাণের মিলন, ভগতজী?'

'হাঁ। প্রাণ যখন পরস্পরে মিশে যায় তখন কাঁটার মতো তো মনেই হয় আর একজনের যদি কাঁটা বেঁধে অন্যের হয় কষ্ট।'

'সত্যি ভগতজী স্নেহ জন্মালে এক প্রাণ দুই শরীর—এই অবস্থা হয়।' -নোর বাপও কথা বলিতে লাগিল।

ইহার পর কাণজীর দাদা নরসিং আর মীরার উদাহরণ দিল। ইহার পর 'আমিও জানি' দেখাইবার জন্য মোড়ল বলিয়া উঠিল—'ওহে দূরে যাচ্ছ কেন? দেখনা, ভগবান তো দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ ছেড়ে বিদূরের শাকান্ন গ্রহণ করলেন!'

আর যদি সুখডী আসিয়া না পৌঁছিত, তবে কেহ সুদামা-চরিত্র, ধ্রুবের উপাখ্যান ইত্যাদি বলিতে থাকিত।

বর্ষশেষের দিনও মজলিশ বসিল কিন্তু কাণজী সেদিকে আর পা বাড়াইল না। ঘরে কোথাও শান্তি না পাইয়া 'একবার বলদকে দেখে আসি' বলিতে বলিতে বাহির হইল।

কাণজীর এই কথা সত্য হইলেও সে শুধু এই কারণেই বেড়াইতে বাহির হয় নাই। যদি সে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, তবে নিজেই বলিতে পারিত যে এসময়ে তাহার মানুষের ভিড়ে বসিতে ভাল লাগিতেছিল না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগিতেছিল না। তাহার অন্তরতম স্থানে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল সেই গানের পঙ্‌ক্তি—

'আনন্দে বিবাহ করেছি বনের মধ্যে ভোজাকে,
আনন্দে জ্বলিব আজ।'

আর উহাকে ভুলিবার জন্য খুব চেষ্টা করিল। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে সুগন্ধ মিশিয়া থাকিলে তাহা যেমন পৃথক করা যায় না। তেমান ঐ পঙ্‌ক্তি দুইটির ভাবও ভোলা কঠিন ছিল।

বলদগুলি সাজাইবার আয়োজনের বিষয় ছেলেদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়া কাণজী ফিরিয়া আসিল। যখন সে গ্রামে ফিরিল, তখন বুড়িরা ছাড়া আর সকলে পূর্বদিকে সিংহদ্বারের মুখে রওনা হইয়াছিল। কাণজীও

সোজা সিংহদ্বারে আসিল। গোরুগুলিকে সিংহদ্বারে পৌঁছান হইয়া গেলে স্ত্রীলোক ও বালকেরা গ্রামে ফিরিল, পুরুষেরা এক অতি পুরাতন মহুয়া গাছের দিকে ফিরিল।

সকলে গোলাকার হইয়া বসিয়াছিল। ঘরপিছু অন্ততঃ একজন করিয়া তো ছিলই, সকলে হিসাব করিবার পর মোড়ল উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর বলিল—'এখন কার দিকে চেয়ে আছ? এই বছর তো বেশ ভালো কেটেছে লড়াই ঝগড়া নেই—' এই বলিয়া পাশের ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিল। এইভাবে মিলনের কাজ শেষ হইল।

খুব অন্ধকার হইলে সকলে গ্রামের দিকে ফিরিল।

শেষ গান গাওয়া হইল—

বেঁচে থাক যদি তবে মজলিশ লাগাও
মরে যদি যাও তবে অন্তিম প্রণাম।

ইহার পর দেওয়ালি শেষ হইতে নববর্ষের একমাত্র কাজ বাকি ছিল বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে দেখা করা। এইজন্য বড় বড় ছেলে মেয়েরা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ফিরিতে লাগিল।

প্রতি দেওয়ালিতে কাণজী বড় বৌদিদি, খুড়ি প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পুরা গ্রামটাই ঘুরিয়া বাড়ি ফিরিত। কিন্তু এই দেওয়ালিতে সে সোজাই ঘরে ফিরিয়া আসিল। বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া তাহার আশীর্বাদ লইল, খাটে বসিয়া হুঁকা হাতে নিল।

ইহার পর গ্রামের কত যুবক, মেয়েরা, বধূঠাকুরানীরা দেখা করিতে আসিল, যাহাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত মনে করিল, কাণজীও তাহাদের নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ করিল। কিন্তু জীবী যখন আসিল তখন যেন সে মোহগ্রস্থ হইয়া পড়িল। জীবী তাহার ভাবীর সঙ্গে সম্ভাষণের পর উহার আপনিই ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু সেও উঠিল না, জীবীরও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা গেল না। তথাপি বৌদিদি বলিল, 'বসে রইলে কেন ঠাকুরপো? জীবী বৌ তোমাকে দেখে তো ঘোমটা দেয় না তবে···।'

'দেখা করেই বা কি হবে'—কাণজী বলিল। ইহার পরেও যদি জীবী, 'বড়দি, এখন চলি' বলিয়া না উঠিত তবে কাণজী হয় তো সম্ভাষণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত।

একপ্রকারের চোখাচোখি হইল না। কাণজীর তাহা ভালই লাগিল, কারণ অন্য প্রকারে উভয়ের সম্পর্কে প্রবঞ্চনার ব্যাপার ঘটিত। জীবীর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ ছিল না, বৌদি দেওরের সম্পর্কও নয়। অন্য লোকের মতো বৌদিরও সন্দেহ হোক। কিন্তু ভগতজী যেমন বলিযাছিলেন, 'জগৎকে তুমি ঠকাতে পার কিন্তু নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করতে পার না।'

অন্যদিকে কাণজীকে যেমন ভগৎজী জিজ্ঞাসা করেন তেমনি ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—'কেন তুমি এমন খেলা খেলছ? ইঁারা যা বলছে তা সত্য হোক বা না হোক, কিন্তু ভগবান জানেন, যেমন লোকে বলে, নানী কাকীর ধূলিয়ার জন্যে কিছু টান থাকতে পারে, কিন্তু তুমি ধূলিয়াকে সহানুভূতি দেখিয়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেন? কেবল জীবীকে তোমার চোখের সামনে রাখতে পারবে—এটাই তোমার লক্ষ্য ছিল। তাই তো?'

ভোজা আর বেলুর যে শেষ পঙ্‌ক্তি তা মনে রাখিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা সে বিড় বিড করিতে লাগিল—

'ভোজা বিয়ে করেছে বনের সীমানায আর আমি নিজেকে বরযাত্রী করে সাজিয়েছি।'

তারপরে কেন জানি না সে একটি বড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মর্যাদা রক্ষা

নারীর দেহে যৌবনের জোয়ার আসিতে আসিতেই শান্ত হইয়া যায়। ধরিত্রীর সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বর্ষার ঝড় তুফান শান্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অঙ্গের সবুজ শাড়ির রং যেন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। উহারই মধ্যে রবিশস্যের জন্য প্রস্তুত করা বিস্তৃত ক্ষেত দেখিয়া মনে হইতেছে তালি দেওয়া কাপড়ের আচ্ছাদন।

কিন্তু নারীর শান্ত যৌবনেরও একরকম অদ্ভুত সুষমা আছে। কূপের জলে পুষ্ট গমের ফসলের উপর ঐ সুষমা দেখা যাইতেছে। ফসলের সারিগুলি পূবের মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেছে, আবার একটু পরে শিশিরবিন্দুর উপর সূর্যের কিরণের খেলার শেষে গম্ভীর হইয়া যাইতেছে। দুপুরে তো ফসলের রং এমন ফিকা দেখায় যেন অত্যধিক কাজের চাপে পড়িয়াছে, আবার সন্ধ্যাকালে তাহারা প্রিয় মিলনের জন্য অধীর হইয়া রাঙা হইয়া উঠে। আর অর্ধ রাত্রিতে তো এই ফসলের সারিগুলি শীতল বাতাসে মাটির দিকে এমন দুলিতে থাকে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া প্রিয়ের ক্রোড়ে মুখ লুকাইতে চায়।

কৃষকরাও বর্ষার পর উচ্চ মাচান হইতে নামিয়া মাটির উপর আসন পাতিয়াছে। সাগের (এক রকম গাছ) পাতায় ছাওয়া ঝুপড়ির জায়গায় এখন ঘাসের আঁটি দিয়া ছোট ছোট ঝুপড়ি বানাইয়া নিয়াছে। বর্ষার বাদলা রাত্রিতে যে আলগোঝা বাঁশি বাজিত তাহার জায়গায় এখন দুই এক ঝুপড়ি হইতে একতারার মধুর আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

হীরার মতো কাণজীর নিজের আলাদা কুয়া ছিল না—আর গোরু চরাইবার বা জল তুলিবার অন্য সাথী না থাকায় এই দুই জন গত কয়েক বৎসর যাবৎ রবিশস্যের কাজ সাঁঝের সময়ই করিত। গোড়ায় তো হীরার আরেকটু সুবিধা ছিল। কাণজীর একা হওয়ায় ঝুপড়ির মধ্যে তাহার বরাবর শোবার ব্যবস্থা হইল। এখন তো হীরা দুই এক সন্তানের বাপ।

সেজন্য ঘরের ঝগড়াঝাঁটির অশান্তি অপেক্ষা ঝুপড়ির কড়া ঠাণ্ডা ওর বেশি ভাল লাগিত। কিন্তু সেখানেও কাণজী মাঝে মাঝে অশান্তির সৃষ্টি করিত—'তুই এখানে শুতে আসিস্। আমার খারাপ লাগে না। আমার পক্ষে তো খুব ভালই—কিন্তু ঘরে তো ওদিকে কঙ্কু বৌদি আমায় মেরে ফেলবে।'

হীরা হাসিয়া বলে, 'একদিন হয় তো জানত, কিন্তু আজ সেদিন নেই, এখন তো ঘরে শুতে গেলেই আমার প্রাণ বের করে দেবে।'

এমন কথার পরে কাণজী কখনও কখনও অর্ধেক রাত্রে হীরাকে ঠেলিয়া বাড়ি পাঠায়। হীরা রাগ করিত, নাচার ভাব দেখাইত, কিন্তু কাণজী কি মানে? বেচারি হীরা উপায় না দেখিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। 'এত রাত্রে কেউ যদি ঘরে যেতে দেখে, কি বলবে?' এই ভয়ের অপেক্ষা বেশি মুশকিল যে দরজা খুলাইবার জন্য চেঁচামেচি করিতে হয়। প্রায়ই তো ও অন্য কোন ঝুপড়িতে গিয়া শুইয়া থাকে। পরদিন কাণজী শুনিয়া পেট চাপিয়া হাসিয়া আকুল হয়।

এ বছরেও কাণজীর সেই পুরানো তামাসার কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার ঠাট্টাও করিয়া ফেলিল। হীরার কেমন সন্দেহও হইল, 'এই ভদ্রলোক অন্য কিছু করছে না তো?' আর যদি ঠাট্টাই হয় তবে বেশি কিছু ভাবিবার নাই। ধূলার ঘরের দিকেই ক্ষেত। কাণজীর কথা যাচাই করার জন্য এধার ওধার দেখিতে দেখিতে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ও ক্ষেতের ধারে লুকাইয়া রহিল—কিন্তু না কোন ঝুপড়ির আগুন নিভানো চোখে পড়িল, না কাহাকেও আসিতে দেখা গেল। সন্দেহ হইল এই টিলা দিয়া ঘুরিয়া গেল নাকি? কিন্তু দেখিল কাণজী তখন শিয়াল তাড়াইবার জন্য আর তামাক সাজিবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে। প্রত্যুষে নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে নিজের সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল—'ওরে মূর্খ। যদি একথা সত্যিও হত তবে কাণজী কি তোকে না বলে থাকতে পারত?' ঐ তো সেদিন ও শপথ করিয়া বলিয়াছে যে দেওয়ালির পর এই যে এতদিন কাটিল ইহার মধ্যে সে জীবীর মুখও দেখে নাই, কথাও বলে নাই।

কাণজীর এই কথার মধ্যে এতটুকু মিথ্যা ছিল না। দেখা করা তো

দূরের কথা। এই ভয়ে তো ও হঠাৎ কোথাও যায় না, চলা-ফেরাও খুব সাবধানে করে। জীবী রতনের সঙ্গে সই পাতাইয়াছিল তাতে রতনও ওর কাছে যাওয়া আসা করিত। সেজন্য কাণজী রতনের যাওয়া আসা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

একদিন পাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে রতনের কাছে একটু ঘোল নিতে আসিয়া জীবী রতনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা রতন, আমাদের বাড়ি আর যাস্ না কেন? আয় আজ চল্…'

রতন মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'না, যাব না।'

'আমি যে তোকে গুড় দেব, তুই খাবি না?'—বলিয়া জীবী রতনের হাত ধরিল।

রতন ভয়ে ভয়ে ঘরের দিকে তাকাইল। খেতের দিক হইতে আসিবার রাস্তার দিকেও চাহিল। কিন্তু শেষে করুণ নয়নে জীবীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'না, কাবা মারবে।'

মুহূর্তের মধ্যে জীবীর মুখ যেন হলুদের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। যেন বিশ্বাস হইতেছে না। এমন ভাবে বলিল, 'তোর কাকা মানা করেছে, না বাবা?'

'না, কাকা।' বলিয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে রতন জীবীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ভুল করিয়া বলে নাই তো, এই ভাবিয়া তৃতীয়বার জীবী এক প্রশ্নই করিল—'তোর কাকা মানা করেছে?'

'হাঁ-আঁ,' বলিয়া রতন মাথা নাড়িল।

জীবী তৎক্ষণাৎ ওর হাত ছাড়িয়া দিল, আর দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

এতদিন জীবীর বিশ্বাস ছিল কাণজীর এই ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়া থাকা লোক দেখানোর জন্য—কিন্তু আজ রতনের মুখে 'না, কাকা মারবে' শুনিয়া তাহার চোখ খুলিয়া গেল। একবার তো ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'এই-ই যদি করবে তো আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? কোন্ এক সৎ ভাইয়ের স্ত্রী জুটছিল না বলে কথা দিয়ে আমাকে এমন বেঁধে ফেললে!' আর আজ যদি ও কাণজীর দেখা পাইত তবে হয়তো রাস্তার মাঝে ওর সঙ্গে

লড়াই করিয়া বসিত।

ঘরে ঢুকিতে শুনিল শাশুড়ি বলিতেছে, 'ঘোল আনতে কি ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছিলে নাকি?' দিনের চরকি ঘোরানোর মতো খুট খুট করে যে শাশুড়ি তাহার কথায় অন্যদিন ভাবে যে তাহার স্বভাবই এই বলিয়া সহিয়া যায়। আজ কিন্তু জীবীর রাগ হইল। ঘোলের ছোট ভাঁড় ঘরের বাহিরে রাখিতে গিয়া বলিল, 'তাহলে তুমি নিজে গেলেই পারতে।'

'বুঝেছি, খুব কাজ করে এসেছিস্। কিন্তু ঘোলের হাঁড়ি তো ঠিক জায়গায় রাখবি।' নানী বুড়ি এই কথার পর জীবীকে বলিল, 'রাখতে চাও তো রাখ।'—আর যাঁতা রাখার তাকের উপর বসিয়া ডান কাঁধের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া বলিল, 'আমি সব করব, তবে তুই কি খাট-পালঙ্কের উপর বসে থাকার জন্য আমার ঘরে এসেছিস!'

'তুমি আমায় কী খাট-পালঙ্কে বসাবে?' বলিয়া জীবী ঝাঁঝের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোয়াল ঘর হইতে ঝুড়ি নিয়া বগলদাবা করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

বুড়ি বিড়বিড় করিতে লাগিল, 'কিন্তু আমার উনুনে তো আঁচ দিয়ে গেল না? আর ঘণ্টা খানিক পরেই তো ওরা ফিরে আসবে, এদিকে খাওয়া দাওয়ার কিছু যোগাড় নেই!' কিন্তু জীবী, 'করতে হয়, নিজে কর' বলিয়া খেতের রাস্তা ধরিল।

'এ ছুঁড়ির আজ হল কি'—বিড়বিড় করিতে করিতে শাশুড়ি নিজেই রান্না চড়াইল।

জীবী ঠিকই ঝুড়ি বগলে নিয়া খেতে ঘুঁটে তুলিতেছিল, কিন্তু সব কিছু যন্ত্রের মতো করিতেছিল। আধ ঝুড়ি ভরা হইলে পরই এক জায়গায় ঢালিয়া রাখিয়া অন্য জায়গায় যায়, কিন্তু কয় জায়গায় বা কোথায় কোথায় ঢেরা দিল তা ওর মনেই নাই। অনেকক্ষণ পর যখন হুঁস হইল, তখন দেখিল ও এত ঘুঁটে তুলিয়াছে যে একটি নয় দুইটি বোঝা হইয়া গিয়াছে। অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল, আর আসিয়াছে তো শাশুড়ির অমতে তবু ও এত ধীরে ধীরে কাজ করিতেছিল যেন ওর কোন চিন্তাই নাই। বোঝাগুলি মাথায় তুলিয়া দিবার জন্য বসিয়া বসিয়া জলভরনী মেয়েদের পথের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল, এক জন মেয়ে ঝর্ণায় জল নিতে

আসিয়াছিল, জীবী তাহাকে কাছে ডাকিল। ও যখন কাজ শেষ করিয়া ঘরের দিকে পা বাড়াইল সূর্য তখন যেন বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম আকাশে একটু নামিয়া পড়িয়াছেন।

ধূলা হুঁকা হাতে করিয়া দাওয়ায় বসিয়া জীবীর পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। জাবীকে দেখিয়া ওর প্রথম প্রশ্ন হইল, 'ঘুঁটে নিতে কে কে গিয়েছিল?'

জীবী জবাব দিল না। ঘুঁটেগুলি দাওয়ার এক কোণে ঢালিয়া দিয়া, ঝুড়ি হাতে ও ঘরে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় ধুলা আবার বলিল, 'কি কানে তুলো দিয়েছ নাকি?'

জীবী ঐখানেই দাঁড়াইয়া গেল, ধুলার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'কি হয়েছে?' তীব্র দৃষ্টিতে ধুলার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখের উপর ভয়ের নামগন্ধ নাই, তবে হাঁ, এমন এক কঠোর ভঙ্গী ছিল যে ধুলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ধুলা যে নিজের কর্তৃত্ব ফলাইবার এমন যোগটা ছাড়িয়া দিবে তেমন পাত্র নয়—ও যেন এই রকমই একটা পথ খুঁজিতেছিল। তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নামিয়া পড়িল। জীবীর গালে এক চড় মারিয়া তারপর এক লাথি মারিল। হুঙ্কার তো চলিতে'ছলই—'তোর মায়ের···রাঁড! তুই এখনও আমাকে চিনিস্ নি। আজ এইটুকু করেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এর পর যদি একলা বাইরে যাবি, কিংবা বুড়ির কথা না শুনবি তবে তুই দেখবি।'

যেন কিছু হয় নাই এমন ভাবে মিটি মিটি দেখিতে দেখিতে জীবী তখনও দাঁড়াইয়া রহিল। ধুলা পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল, 'আমার চোখের সমুখ থেকে সরে যা! নইলে, এখনই ঠেলা বুঝবি, শুনছিস?' জীবী এমনভাবে দাঁড়াইয়া ছিল যেন এখনই দেখিতে চায় কী সে করিতে পারে। চৌকির উপর বসা ধুলা এমন চেঁচামেচি করিতেছিল যে নানী বুড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—জীবীকে ধাক্কা দিয়া ঘরে সরাইয়া বলিতে লাগিল—'গায়ে হাত না তুললে বুঝি তোর বাহাদুরি দেখানো হত না?'

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, লোকের সামনে ধূলা তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে চাহিয়াছিল। যখন থেকে জীবী আসিল তখন থেকেই লোকে

ঠাট্টা করিয়া বলিত—'ধূলা ভাই তো রূপের ডালি নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওকে রক্ষা করা কঠিন হবে।'

ধূলা গোঁফে তা দিতে দিতে জবাব দিত—'রক্ষা করার কথা কি বলছ? যদি কয়েক দিনের মধ্যেই ওকে সোজা না করে দিই তবে আমার নাম ধূলিয়া নয়। ওর মধ্যে এমন জোর নেই যে একটু এদিক ওদিক হতে পারে।'

তবে যখন কেহ আজকের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিত—'ধূলা, শুনলাম আজ বাড়িতে মারপিট করেছ?' তখন উহার একটু লজ্জাও হইত, ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিত—'এখনই কি হয়েছে, এবার হবে।' কারণ ইহাতে ধূলার সন্তোষ হয় নাই, কারণ দরজার মধ্যে বসিয়া জীবী না করিল চিৎকার, না রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাতে তো বরং তাহার অসন্তোষ বাড়িয়া চলিল। গাঁয়ের লোকদের কথায় বুঝা গেল কি জন্য মারা হইয়াছে। কিন্তু মারা তো তখনই সার্থক যখন জীবীর বিলাপ শুনিয়া লোকে বলিবে যে ধূলা বৌকে মারিতেছে আর এই কথা মনে করিয়া সে ভাবিত, 'ভালো কথা, আরেক বার সুযোগ আসতে দাও, তখন চোখে দেখে নিও।' ইহার পর আবার কবে সুযোগ মিলিবে, কবে তাহাকে এক চোট দেখিয়া লইবে, এই গোলমালে জীবীর সেদিনের নিশ্চল মূর্তি স্মরণ করিয়া বিড়বিড় করিত—'করে যা, আমিই ভুল করেছি, নয়তো আমার উচিত ছিল তখনই সিধা করে দেওয়া। ভালো কথা—এখন সুযোগ হাতে পাই তো মজা দেখাব।'

এই সুযোগ ধূলা পাইল চার দিনের দিন সন্ধ্যা বেলায়। কূয়ার কাছে খাইতে বসিয়াছিল এমন সময় তাহার প্রতিবেশী রেশমা কোথা হইতে খবর আনিল যে অমুক দিন সন্ধ্যাবেলা জীবী গোরু খুঁজিতে খুঁজিতে কাণজীর ঝোপড়িতে গিয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু এই কথাও বলিল যে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বলিতেছিল সে এতক্ষণ সময় সেখানে ছিল যাহাতে একমণ মকাই পেষা হইয়া যায়।

এ কথা শুনিয়া ধূলার মেজাজ আগুন হইয়া গেল, এক দিকে সে কাণজীকে ভয় করিত, আবার তাহার কর্তৃত্ব ধূলাকে লজ্জাও দিত। 'যা কিছু হবার তা তো হয়েইছে'—এই কথা বলিতে বলিতে সে বাড়ি চলিল।

জীবীকে খুঁজিল কিন্তু ঘরে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল, শুনিল সে জল আনিতে গিয়াছে।

'আসতে দাও, আজ ওর রক্ষা নেই' বলিয়া ও দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল।

পিছন হইতে আসিয়া বুড়ি বলিল, 'কিন্তু হয়েছে-টা কি? তোকে কি ভূতে পেয়েছে?'

'ভূত তো তোর বৌয়ের ঘাড়ে চেপেছে। সেদিন এত গালিগালাজ শুনল, তবু ছুঁড়ি আজ…।'

কথার মাঝখানেই বুড়ি বলিল, 'নিজের লোকের কথা এত জোর গলায় না বলে, একটু আস্তে বল।' তারপর চৌকির উপর যেখানে ধুলা বসিয়াছিল, তাহার পায়ের দিকে বসিয়া বলিল, 'আজ আবার কি হল?'

রাগ করিয়া কিন্তু আস্তে আস্তে ধুলা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল বুড়িকে বলিল। আরও বলিল, 'ও বেটি তো আমাকে বিয়ে করে নি ওতো কেবল এই ছলায়…।'

বুড়ি বলিল—'লোকের কথায় কান না দিয়ে চুপ করে থাক। লোকে তিলকে তাল করে। এতে ওদের বাপের কী? মারপিটের ফলে যদি বৌ পালিয়ে যায় তখন ওরাই উল্টে তোকে দুষবার সুযোগ পেয়ে যাবে। বৌ পালিয়ে গেলে তুই-ই তো জলে পড়বি! ওদের কি এসে যাবে? তুই যা, এখন খেতে যা। মোষগুলির ফেরার সময় হল। কারুর মোষ যদি ঢুকে পড়ে তো পাঁচ মণ ফসল নষ্ট করে দেবে! যা, ওঠ।' বিড়বিড় করিতে করিতে বুড়ি ধুলাকে উঠাইয়া খেতের দিকে রওনা করিয়া দিল। বলিল, 'লোকের কথায় কান দিলে তো ভিখ্ মেগে খেতে হবে। আজকাল দিনকাল এমন হয়েছে যে চোখে দেখা ব্যাপারও মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়।'

খাবার তৈয়ারি হইলে একটি ছোট ছেলেকে দিয়া তাহা খেতে পৌঁছাইয়া দিল। অন্যান্য দিন তো ধুলার রাগ হইলে, 'আচ্ছা এবার ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এর পরে যদি এরকম দেখি তো দেখিস্ কি করি? এই কানিয়াকে যদি দেখিস তো জন্মের মতো তোর স্বভাব ঘুচিয়ে দিই, তবে মনে করিস্ ধুলার কথা—সে কী বলেছিল?' এই সব বলিয়াও তাহার

রাগ ঠাণ্ডা হইল না। বুড়িকে সাবধান করিয়া বলিল, 'এবারকার মতো চুপ করে গেলাম, কিন্তু ফের যদি বে-চাল কিছু দেখি, তবে জ্যান্ত ছাড়ব না, বুঝলি ?'

অপর দিকে গাঁয়েও লোকের মধ্যে নানারকম কাণাঘুসা চলিতেছিল। কিন্তু প্রকৃত কি হইয়াছিল তাহা তো শুধু জীবী আর কাণজীই জানিত। গোরু খুঁজিতে জীবী গিয়াছিল ঠিকই, আর সামনে কাণজীর ঝুপড়ি দেখিয়া না ঢুকিয়া থাকিতে পারে নাই।

কাণজী ঘরে বসিয়া তম্বুরার ছেঁড়া তার জোড়া দিতেছিল। জীবীকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। একদিকে সন্ধ্যার রক্তিম আকাশ কালো হইয়া উঠিতেছে, অপর দিকে গ্রাম হইতে ওঠা ধোঁয়ার অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। কাণজী বলিয়া উঠিল, 'কি রে, তুই কোত্থেকে, এ সময়ে ?'

ঝোপড়ির বাতা ধরিতে ধরিতে জীবী বলিল, 'গোরু খুঁজতে এসেছিলাম।' তম্বুরার দিকে চাহিয়া হাসিয়া জীবী কাণজীকে বলিল—'কি বাবাজী, বাজাবে নাকি ?'

কাণজী বলিল—'তোর দয়ায়! হয় ঘরের ভিতর আয়। না তো ফিরে যা! মিছিমিছি··· !'

কাণজীর মুখ দেখিয়া জীবী আরও হাসিয়া উঠিল, আর উহাকে জ্বালাতন করিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'তা, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? এই তো আমি এসে বসেছি !'

'কিন্তু···কিন্তু এ সময় তুই এখানে এলি কেন, তোর গোরু কি এই ঝোপড়িতে—'

জীবীর মনে একটু কষ্ট হইল, কিন্তু নিজের আমুদে স্বভাবের বশে তাহা গ্রাহ্য করিল না। 'আরশি আছে ? তাহলে নিজের মুখটা একবার দেখ।' তাহার পর যেন কাণজীকে করুণা করিয়া বলিল—'কোথায় সেই মুখ, আর কোথায় এই গরীব গো-বেচারির মতো মুখ !' কাণজীর দিকে চাহিয়া একটু রাগত ভাবেই বলিল, 'এরকম হতে তোমার লজ্জা করে না ? কি এমন হয়েছে যার জন্য তুমি এত ঘাবড়ে গেলে ? তোমার খেতের উপর দিয়ে কি কোনও স্ত্রীলোক যাওয়া আসা করে না ?'

'আরে না, না, আমার নিজের জন্য তো ভারি ভয়!' বলিয়া কাণজী হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াই কিছুটা নিজের আগের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—'আমি তো তোর জন্যই···? ঐ বাঁদরটা জানতে পারলে ফের মারধোর করবে! নইলে আমাকে কে কি···?'

'কিন্তু তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি যদি তোমার কাছে নালিশ জানাতে আসি, তখন বলো। তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ছিল, তাই মনে হল, আচ্ছা এদিকে যখন এসে পড়েছি তখন এই ঝোপড়িতে···।'

'কী কথা'! বলিয়া কাণজী পিছনে হাত রাখিয়া জীবীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

কত দিন পরে জীবী এই হাসি দেখিল। কাণজীর দিকে আড় চোখে চাহিয়া রহিল। কাণজী চোখ ফিরাইয়া নিল। ঘরের মাঝখান হইতে তম্বুরাটি তুলিয়া নিয়া ঘরের এক ধারে রাখিয়া আবার প্রশ্ন করিল 'কী কথা জিজ্ঞাসা করবে, বল না?'

জীবী বলিল, 'ছাই ভস্ম! কী কথা জিজ্ঞাসা করব! আমি তো এই—'

কাণজী বলিল—'তুমি চালাকি করছ।'—ঘরের বাঁশের খুঁটি ধরিয়া জীবী *দোল খাইবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় কাণজী ধরিয়া ফেলিয়া* বলিল, 'দেখো, ফেলো না যেন!'

'দেখা যাক'—বলিয়া জীবী আরও চাপ দিল। কাণজী বলিয়া উঠিল—'পাগল হয়েছিস নাকি? এখনই যদি উঠে পড়ি। দুষ্টুমি করো না বুঝলে··· সত্যি বলছি।'

'না নামলে কি করবে!' বলিতে বলিতে জীবীর মুখ, উহার বক্র দৃষ্টি, বয়সের মাদকতা, মৃদু মৃদু হাসিভরা ঠোঁট, গালের উপর পড়া অল্প অল্প ধূলা এসব ছাড়াও ওর শরীরের বাঁধুনি দেখিয়া কাণজীকে বলিতে হইল—'এখান থেকে যাবি কি না? কোন কথা থাকে তো আরেক দিন আসিস্! এখন তুই যা!'

'কিন্তু যদি না যাই! বেশি কথা বলবে তো এই আমি এখানে বসলাম!' বলিয়া জীবী সত্যই বসিয়া পড়িল। বলিল, 'যাব না তো, তোমার যা খুশি কর।'

'আমি কিছু করব না। আমি তোকে হাত জোড় করে বলছি, তুই এখান থেকে যা!' বলিয়া কাণজী এমন জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল, বেশ বোঝা গেল, যে কোন অসহনীয় ব্যথায় ওর ঠোঁট কাঁপিতেছে। তবু আবার বলিল, 'ও জীবী তুই ওঠ্। সত্যি বলছি। আমার কাছে এখন—' বলার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠিয়া দাঁড়াইল—পাগলের মতো জীবীর দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। 'তা দেখ্' বলিয়া হাতও বাড়াইল, কিন্তু তখনই উরুদেশে হাল্কা ঠেলা মারিয়া, কেহ যেন উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে এমন ভাবে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কিছু দূর গিয়া দাঁড়াইয়া জীবীকে বলিল, 'তখনই কি আমি বলি নি? এখনও সত্যি বলছি! বেরিয়ে যা।' 'না যাব না' জীবী আবারও এই কথা বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া রহিল—কাজেই কাণজীব আরেক দিকে চলিয়া যাইতে হইল! যাইতে যাইতে সে বলিল, 'তবে থাক্ একা বসে থাক্।'

তাহার গভীর দীর্ঘশ্বাস ঝোপড়িতে যেন ধরিল না। বাহিরে আসিয়া সে মুখ নীচু করিয়া গাঁয়ের রাস্তা ধরিল। কাণজীর দুইবার ডাকে সে থামিল না। কিন্তু তৃতীয়বারের ডাকে ঝট করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাণজীর মুখ গম্ভীর, থমথমে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, 'দেখ জীবী, অনেক দিন থেকে তোকে আমার একটা কথা বলার ছিল। আমি তোকে এখানে এনে ভারী ভুল করেছি! কিন্তু এখন আর শোধরাবার পথ নেই। আজ থেকে তুই আর আমি এমন ভাবে চলব যেন দুজনে কেউ কাউকে চিনি না—এই ঠিক, আর এতে তোর আমার দুজনেরি ভাল হবে।' বলিয়া একটু থামিল। জীবীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়া আবার বলিল, 'তোর উপর দিয়ে কত কি যে যায় সে সবই আমি জানি···কিন্তু আমার মনে কি হয় তা কাকে বলি? কিন্তু এখন তো···।' আবার কথা উল্টাইয়া বলিল, 'আজ না হয় এখানে এসেছিস্, কিন্তু আর কোন দিন এ দিকে···'

'আর আসব না'—বলিয়া কাণজীর দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টি হানিয়া পিছন ফিরিয়া জীবী চলিয়া গেল!

জীবীর পিঠের দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিয়া কাণজী অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। হুঁশ হইলে পর চারিধারে চাহিয়া দেখিল,

তারপর গাঁয়ের দিকে চলিল। মাথায় হাজার রকমের ভাবনা চিন্তা ঘুরিতেছিল। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও জুটিতেছিল। তার মধ্যে একটা কথাই বড় হইয়া দেখা দিতেছিল—আমি একে কেন এখানে নিয়ে এলাম? আর অনুশোচনায় নিজের মনেই বলিল, 'চোখের সামনে এনে উল্টে দুঃখ বাড়ালাম!' সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, ধুলিয়াকে কে পরোয়া করে? মিঞা-বিবি রাজী, তো কি করবে বাজী? দুনিয়ার লোক নিন্দা করুক না। এমনিতেও করছে! কিন্তু ইহার পরও ওর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল—'না, না, ভগতজী তো সেদিন বলেছিলেন, 'কাণজী, তুমি জীবীকে এখানে এনেছ, এখন আনার মর্যাদা রাখ।'

গ্রামে ঢুকিতে গিয়া কাণজী মৃত বাপ-মায়ের নাম লইয়া শপথ করিল, 'দুনিয়া উল্টে গেলেও আমি নিজের মন বিগড়োতে দেব না। আজ থেকে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাব না।'

কিন্তু কাণজীর এই আত্ম-বিশ্লেষণ আর সংকল্পের কথা দুনিয়ার লোক জানিল কই? ও এমন সব কথা বলিল যার অস্তিত্বই নাই। ভগতজীর কানে এসব কথা পৌঁছিলে তিনি কথায় কথায় কাণজীকে বলিলেন, 'শরীর বিগড়ে যায়, একথা তো আমি বুঝি, আজ না হয় দুই দিন পরে নতুন চামড়া গজায়। কিন্তু মন যদি বিগড়ায় তবে আরেক জন্মেও মন থেকে দাগ মুছে ফেলা যায় না।'

'ঠিক কথা ভগতজী' বলিয়া কাণজী চিন্তামগ্ন হইল। ভগতজী যে তাহাকে দেখিয়াই এই উদাহরণ দিলেন তাহা বুঝিতে দেরি হইল না। সেই দিন হইতে সে শেষ সিদ্ধান্ত লইল—'আজ থেকে জীবীকে আমার শেষ বিদায়!' আর মনে মনে বলিল, 'আজ থেকে যদি কখনও ওর নাম উচ্চারণ করি তবে ভগতজী। আমাকে ধিক্কার দিও।'

আর সেইদিন হইতে কাণজী যেন জীবীর উপর হইতে নিজের মন সরাইয়া নিল! হয়তো ছেলেদের কোন জমায়েতে বসিয়া আছে, জীবীকে আসিতে দেখিলে উঠিয়া পড়িত, যদি বা বসিয়া থাকিত তবু জীবীর সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, ওর দিকে ফিরিয়া চাহিত না! যতক্ষণ জীবী থাকিত, তার দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিত। অন্তের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝে 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার কথা কি কিছু বলে' এই প্রত্যাশায় নিরন্তর চাহিয়া থাকিতে

থাকিতে জীবীর শুধুই নিরাশ হইতে হয়।

কাণজীর কাছে এই অবহেলা পাইয়া জীবীর দুঃখ আরও শত গুণ বাড়িয়া গেল। সে মনে মনে বলিত, এমন লোক তো কখনও দেখি নি। 'লোকে আমাদের পুরোপুরি জানে। এত দূরে থেকে কী হবে? এ কথা কি গাঁয়ের কারো কাছে লুকানো আছে! কিন্তু যদি একবার কাণজীর সঙ্গে দেখা হয় তবে আমি ওকে বলব।'

—'এত দূরে থাকার কি দরকার?' আর মনে মনে ভাবে কাণজীর সঙ্গে কোনদিন দেখা হইলে বলিবে, 'সামনে গেলে, চেয়ে দেখলেও এমন পাপ হয় তবে অর্ধেক রাত্রে কি মিছিমিছি আমাকে আনতে গিয়েছিলে?'

কিন্তু কবে বলে? কাণজীকে কাছে পাইলে তো বলিবে? অনেকদিন বাদে যদি জীবীর সঙ্গে দেখা হয় তবে সে পিছন ফিরিয়া ঘুরিয়া যায় নয় তো অন্য রাস্তা দিয়া যায়। জীবী মনে মনে ভাবে—'ছায়া পড়ে যায় হয় তো?' একদিন তো কোন কথাপ্রসঙ্গে আর পাঁচ জনের মধ্যেও বলিয়াই ফেলিল, 'হীরা ভাই, খুব তো বড বড কথা বল। মুখের উপর পুরুষের গোঁফও আছে। কিন্তু কলিজা তো দেখি একটা ছোট ভীতু পাখির মতো।' জীবী কথাটা তো বলিল হীরাকে লক্ষ্য করিয়া কিন্তু দেখিতেছিল কাণজীর দিকে। কাণজী এমনভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল যেন সে কালা, না শুনিল, না জীবীর দিকে তাকাইল। জীবীর খুব রাগ হইল, কিন্তু কি করা? ধূলার মার, শাশুড়ির ঝগড়া সহ্য করিতে পারিত কিন্তু কাণজীর এই উদাসীনতায় ওর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

দূর হইতে কাণজীকে দেখিয়া ওর বুকের মধ্যে এক ঝড় উঠিল—'আর তো কিছু নয়—কথা না হয় না-ই বলল, চোখ তুলে একবার দেখতেও পারে না! আমি এমন কি অপরাধ করেছি?' আজকাল তো উহার চোখ জলে ভারী হইয়া আসিত।

বিয়োগ ব্যথা

গমের মাথায় গোলাপী রং কিরণ ঢালিয়া দিয়া শীতের সূর্য ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল। রাত্রির অন্ধকারে গাছের পাতায় যে শিশিরবিন্দুগুলি জমিয়াছিল, তাহারা ক্রমে রোদ উঠায় মিলাইযা গেল। মাথার উপর পিতলের ঘড়া কাঁখে কাপড়ের আঁচলে হাত লুকাইয়া জল ভরিতে মেয়ের দল কূয়ার দিকে চলিয়াছে। দুই একটা খেতের কূয়া হইতে কলসে জল ভরার 'চিক্‌রুক চিক্‌রুক' আওযাজ শোনা যাইতেছে। কাণজী আর হীরা তো এখনও নিজের ঝুপড়িতে। আগুন পোহানোর জন্য উনানে ভারি একখণ্ড কাঠ জ্বলিতেছে। দুই ধারে পাতলা ঘাসের তৈরি বিছানার ওপর দুইজনে বসিয়া আছে।

অগোছালো লেপ জড়াইয়া হীরা আর কাণজী তামাক খাইতেছিল। হঠাৎ নিকটের কূয়ার পাড়ের মশক হইতে একটি আওয়াজ কানে আসিল— 'নে, ওঠ হীরা, আমাকে মশক লাগাতে দে, আর তারপরে বাড়ি যাবি তো যা। আমি ততক্ষণে এক আল বরাবর জল দিয়ে যাব'—বলিয়া কাণজী উঠিয়া দাঁড়াইল। 'আমি ঐ আলের...'

'আরে তুই একবার গোরু তো জুড়ে দে, আমি অর্ধেক করা কাজ পুরো করে দিয়ে যাই। তারপরে বাকিটা তোর একাই করতে হবে।'—এই বলিয়া হীরাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

'ঠিক কথা' বলিয়া কাণজী ঝোপড়ির বাহিরে আসিল। আলসেমি ত্যাগ করিয়া হাই তুলিতে তুলিতে হীরা বলিল, 'ওহো, বেলা তো অনেক হল।'

'হবে না, তোর মুখ চেয়ে বসে থাকবে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাণজী খেতের ডানদিকে ঘুরিয়া গেল। খেতের বাঁধের ধারে দড়ি দিয়া বাঁধা দুইটি বলদকে লইয়া মশকের সঙ্গে জুড়িয়া দিল। বলদ দুটি আকারে ছোট বড় যাহাই হউক, শক্তি কম নয়, শক্তিতে ষাঁড়ের মতো তাগড়া। এজন্য

কাণজীর এই বলদ দুটির কথা তো প্রবাদের মতো হইয়া গিয়াছে—'বলদ দেখতে চাও তো কাণার আস্তানায় যাও।'

কাণজী মশক ভরিয়াছে দেখিয়া বলদ দুইটির লেজে হাত রাখিল। মাটির সঙ্গে মুখ রাখিয়া চলিতে চলিতে বলদ দুইটি এমনভাবে মশকে টান দিল যেন মশকগুলি খালি। আরেকটি মশক আসিল। আরও একটির উপরে বলদকে সোজা দাঁড় করাইয়া দিল। জল তুলিবার চাকার দুইপাশের কাষ্ঠখণ্ডের নিকট হইতে দুইটি পুরিয়া লইয়া চাকাতে ছড়াইয়া দিল। ইহার পর ঐ চাকা হইতে যে মসৃণ আওয়াজ উঠিতে লাগিল তাহার সঙ্গে কাণজী দোহা গানও শুরু করিয়া দিল।

মশকের গতির সঙ্গে যে দোহা গাওয়া হয় তাহার ঢংও এমন যে এই পদ্ধতি যাহার অভ্যাস হইয়াছে সে গদ্যকে পদ্য করিয়া গাহিতে পারে। এই ঢং লইয়া অনেক যুবক মনকে ভাসাইয়া লইবার মতো দোহা গায়। কিন্তু কাণজী যখন গায় তখন অনেকে স্বীকার করিতেই পারে না যে কাণজী নিজের রচনাই গাহিতেছে। অনেকে তাহার কাছে গিয়া শিখাইবার জন্য মিনতিও করে। কাণজী বলে—'ওরে ভাই। ওতো ঐ সময়ে ভেতর থেকে একটা ভাব আসে, তাতেই গান হয়। এখন আমার কি আর মনে আছে যে তোমাকে শিখিয়ে দেব।' প্রথমে লোকে মানিত না, কিন্তু যখন রোজ নিত্য নিত্য বাহির হইতে থাকিল তখন স্বীকার করিতেই হইল। যাহাদের সন্দেহ করা অভ্যাস তাহাদের কেহ কেহ, তাহারা তো কাণজীর নিকট হইতে 'গজরামারু', 'সদাবন্ত', 'সাঁওতালিয়া', 'রাশরিসালু', 'ভজন' প্রভৃতি পুস্তক লইয়া ভগতজীকে দিয়া পড়াইয়াও দেখিল। তাহার মধ্যে এসব দোহা পাওয়া গেল না। আর যাহা কিছু ছিল তাহা তো সারা পৃথিবীর জানা। কিন্তু কাণজীব দোহার আসল মজা ছিল যখন সে গাহিত তখন সে পুরাভাবে বিভোর হইয়া থাকিত।

হীরার খেত ছিল জলঘাট থেকে অনেকটা দূরে। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া গাঁয়ের চাল হইতে আসিয়াছে যে পগদণ্ডী ও কুয়া সবই দেখিতে পাওয়া যায়। জলের প্রতিবারের খেপ ভরিয়া যুবতীরা যখন চলিয়া যায় তখন তাহাদের নিকট গিয়া দেখার চেয়ে দূরে থাকিয়া দেখিলেই বেশি ও বাস্তবিক আনন্দ। কখনও তাহারা সম্মুখ দিয়া

যাইতেছে, অল্পক্ষণের জন্য কাহার সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়াইল, কখনও কাঁধে যে দড়ি ঝুলিতেছে তাহা দিয়া অগ্রবর্তিনীকে চাবুক দিয়া প্রহার করিল, একা হইলে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরাইয়া মাঠের হাওয়ায় আশপাশে নজর দিল। কিন্তু দেখিবার মতো লোক দূরে থাকিলে, তবে তো এসব দেখিতে পাওয়া যায়।

জল ভরিবার সবুজ ভরা ঘাটের দৃশ্য দেখিয়া কাণজী আজ অনেকদিন পরে পূর্ণ মেজাজে গাহিল—

'হে বন্ধু, শীতের বাতাসে তোর কখনও কাঁপে হৃদয়।

কিন্তু যৌবনের বাতাস কোনও বাঁধন মানে না।'

এক পাশের বাঁক হইতে জল দিতে দিতে হীরা সমর্থন করিয়া বলিল—'এ বাতাস অন্য ধরণের বাতাস রে ভাই!'

'চলো বাহাদুর।'...বলিয়া কাণজী মশকের 'চিকরুক, চিকরুক' আওয়াজের সঙ্গে আবার নিজের মুক্তস্বর মিলাইয়া দিল—

'হে বন্ধু, এক মুঠি আমার জীবন। তবু কেন এমন? বিরহের মুহূর্ত তো যুগ যুগ ব্যাপী।'

হীরা আরও বিড বিড় করিতে লাগিল—'এ রকম না লাগলে আর বিচ্ছেদ বেদনা কি?' জল ভরিতে আসিয়া জীবীর কানে তো সকাল থেকে উচ্চারিত কাণজীর এই শেষ দোহা দুটি উল্কাপাতের মতো লাগিল। যে মেয়েরা জল নিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন তো বলিয়াই উঠিল—'কাণা ভাই, আজ এত খুশি কেন?'

আরেক জন ঠাট্টা করিয়া বলিল—'তোকে দেখে।'

প্রথমা জীবীর দিকে আড চোখে চাহিয়া বলিল—'নারে ভাই, আমার আমার এমন রূপ নেই যে দেখে কেউ মোহিত হবে, আর এ রকম দোহা গাইবে।' বলিয়া সে আবার আড়চোখে জীবীকে দেখিল।

কিন্তু জীবীর মন আজ তাহার বশে নাই—কেহ যেন উহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—গলা ফাটাইয়া কেহ যেন উহাকে জোরে ডাকিতেছে, বলিতেছে—

'হে বন্ধু, আমার দৃষ্টি চলেছে তোমার বেণীকে অনুসরণ করে। বন্ধু আমার, তোমার দীর্ঘ বেণীর মতো তোমার আমার মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ থেকে

আমি বঞ্চিত।'

জীবী খালি কলসি একদিকে রাখিয়া দিয়া হীরার বোন নাথীকে বলিল—'আমি একটু চাল[1] শাক তুলে আনি।'

'কোথায় পাবি?'

'এই খেতেই…'

আর ভগবান যেন ওর মুখ দিয়া বলাইলেন এমন ভাবে নাথী বলিল, 'এর চাইতে চল না আমার খেতিতে যাই, এক ঘন্টার মধ্যে শাক তুলে ফিরে আসব।'

'আচ্ছা দেখি এখানে যদি পেয়ে যাই, নইলে ওখানে যাব।' এই বলিয়া জীবী পাশের খেতে প্রবেশ করিল।

'আমি তবে এতক্ষণে একঘড়া জল চেলে আসি।'

'ভাল কথা, কিন্তু শীগ্‌গির, শীগগির ফিরে এসো!' বলিয়া জীবী খেতে চলিয়া গেল।

আর শাক তুলিয়া আঁচলে ভরিয়া জীবী নাক বরাবর সোজা চলিতে লাগিল। 'কেউ যদি দেখে ফেলে? কি বলবে?' এই রকম ভয়ও তাহার আর ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর বুকের ধড়ফড়ানি হইতে উহার সমগ্র চিত্ত এই দোহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। প্রথম দোহার অর্থ খুঁজিয়া উহার মন যেন বলিয়া উঠিল—'সংলাপ থেকে আমরা বঞ্চিত। ঐ দীর্ঘ সংলাপের অভাব আমি অনুভব করছি।' আর অন্য দোহাটি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল—

'বন্ধু আমার চলার পথে তোমার সঙ্গে আমার কথার বিনিময়। তার জন্যে আমাকে অনেক মূল্য দিতে হল। বন্ধু আমার, ঐ দীর্ঘ সংলাপ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে।'

মুহূর্তের জন্য জীবীর আশঙ্কা হইল, 'কি জানি কার কথা বলছে?' কিন্তু অন্তরের গভীরে বিশ্বাস হইতেছিল যে, আজ কাণজী সবই তার কথাই বলিতেছে। ও নিজের হৃদয়ের কথাই প্রকাশ করিতেছে। জীবীও মনে মনে বলিল অন্তরের সঙ্গে যদি জড়াইয়া ধরিতে চাহিলে, তবে কেন স্বীকার করিলে না? কে বারণ করেছিল? আবার মশক ঘুরিতে লাগিল।

১ এক রকম আনাজ।

গান শোনা গেল—

'বন্ধু আমার, কাজল কালো চোখ আমার ছানি পড়া চোখের মতো ঝাপসা হয়ে গেছে।'

ইহার শোকে একেবারে যেন ডুবিয়া গিয়াছে এইভাবে বলদ দুটিকে বলিল, 'চল চল...' আর উহাদের লেজে হাত রাখিল। মশকটি কুয়োর মধ্যে ডুবাইবার সময় আর একবার ঘাটের দিকে চাহিল। জীবীকে তো ও দূর হইতেই চিনিয়াছিল। ইতিমধ্যে ও খেতের একটা আলের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হাওয়ায় ওর আসমানী রঙের চাদর দুলিতেছিল, কাণজী সেইদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। আজ অনেক দিনের পর দুই জনে চোখে চোখে মিলিল। লজ্জায় কাণজী চোখ নামাইয়া লইল। জীবী কিন্তু এখনও নিজের আঁখি হইতে কটাক্ষে অভিযোগ জানাইতেছিল। যেন উহার মন বলিতেছে—'কোথায় বদলেছে? যেমন ছিল তেমনই তো আছে।' হুঁশ হইলে আবার শাক তুলিতে লাগিল।

আবার মশক ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু এবার কাণজী দোহা গান ধরিল না। এখনই হয়তো জীবী কাছে আসিবে এই আশায় আর একটি মশক লাগাইয়া দিল। কিন্তু জীবী তো এ পর্যন্ত যেখানকার সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। দেখা না করিয়াই ও চলিয়া যাইবে না তো? এই আশঙ্কায় কাণজী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মশক ভরিতে ভরিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে নাকি?'

শাকের গোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে জীবী বলিল—'হাঁ, তোমার চোখ তো এখন ছানিতে ঝাপসা হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় কাছে গিয়েই বা আমি কি করব?'

একবার টানা ভরা মশক আর একবার টানিতে টানিতে কাণজী বলিল, 'তা তো ঠিক, কিন্তু যখন অমৃতে পূর্ণ ভাণ্ড মরাকে বাঁচিয়ে তোলে, তখন আমার এই ছানি কি সারবে না?'

জীবী হাসিতে হাসিতে কাণজীর দিকে চাহিয়া বলিল—'যার জন্য এই চোখ-জ্বালা তাকে দেখে রোগ বাড়বে বই কমবে নাকি?'

কাণজী মশক আবার টানিয়া ধরিল। 'তা ঠিক, কিন্তু তুমি কি জানো না যে কাঁকড়া বিছে কামড়ালে সেই কাঁকড়া বিছের মাথা কেটে ক্ষতস্থানে

লাগিয়ে দিয়ে বিষ টেনে নেয়—এও সেই রকম।' বলিয়া জীবীর দিকে চাহিয়া কাণজী হাসিতে লাগিল। হুঁশ হওয়ায় গোরুর লেজে হাত রাখিয়া বলিল, 'আমি এখনই আসছি।'

শাক তুলিতে তুলিতে জীবী আলের এধারে আসিয়া পড়িয়াছিল—কাণজীও ফিরিয়া আসিয়া উহার পাশে দাঁড়াইল। কিন্তু এখন দুইজনেই যেন বোবা হইয়া গেল। গোরুদের জল খাওয়ার অপেক্ষায় এখন সব চুপচাপ। দুই জনেরই অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু কে আগে শুরু করে।

জীবীর দিকে চাহিয়া প্রায় যান্ত্রিকভাবে কাণজী মশক ভরিতেছিল, দেখিয়া জীবীর হাসি পাইল। বলিল, 'আমার দিকে এমন করে চেয়ে কি দেখছ?' আর এতক্ষণের তোলা আনাজগু'ল বাছিয়া ঠিকঠাক্ করিয়া যেন চলিয়া যাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া জীবী আরও বলিল—'দাঁড়াতে বলেছিলে যে, বল না কি বলছিলে?'

জীবীর দেহের উপর প্রত্যাশী হইয়াও একরকম তৃপ্তিভরা চোখে ওর দিকে চাহিয়া কাণজী বলিল—'এইটুকুই ঢের! তোকে প্রাণ ভরে শুধু দেখতে চাই! তার উপর দুটি কথা যদি শুনতে পাই···' বলিয়া কাণজী হাসিয়া ফে'লল। তার এই হাসি দেখিয়া কিন্তু জীবীর উল্টা দুঃখ হইল। মশকের মুখের কাছে বাধা দড়ি চাকার উপর লাগাইয়া কাণজী বলিল—'এর চাইতে বেশি কি বলতে পারি? বলার যোগ্যতা কি আমি রেখেছি?' জীবীর দিকে আর না চাহিয়াই বলদদের ঝাঁকুনি দিল।

কিন্তু জীবী তখনও দাঁড়াইয়া। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কাণজীকে বলিল—'কেন আমার উপর বড় রাগ করেছ বুঝি?' যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে এমনভাবে গমের শীষ লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

'তোমার উপর রাগ করার মতো কাজ তুমি কি করলে। বরং আমার উপরই তোমার রাগ করার কথা', বলিয়া কাণজী জোরে নিঃশ্বাস ফেলিল।

'তবে এতদিন মুখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছ কেন?' তবু কাণজী চুপ করিয়া আছে দেখিয়া রঙ্গভরে বলিল, 'লোকের ভয়ে বুঝি?'

কাণজী বলদের দড়ি খুলিয়া দিল। তারপর বেড়ার বাহিরে আসিয়া 'তাতো বটে, হীরা দে তো এক ছিলিম তামাক খাই' বলিয়া ডাক দিল।

'এই যদি হয় তবে অর্ধেক রাতে ডাকতে আসা উচিত ছিল না'—জীবী

আজ হালকা রাগের সুরে বলিয়া ফেলিল এবং কাণজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

পকেট থেকে তামাকু বাহির করিয়া কাণজী বলিল—'এ সবই ঠিক, কিন্তু যে ভুল করে ফেলেছি তার জন্য এখন কি করা?' তামাক ভরিতে ভরিতে আরও বলিল—'তুই যদি পারিস্ তো ভুল শুধরে নে।' কাণজীরও একটু উষ্ণ ভাব।

'বেশ' বলিয়া জীবী ঘাড় ঘুরাইয়া পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল হীরা এখনও যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

কাণজীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তার মানে আমি চতুর্থবার স্বামীর খোঁজ করব।'

'চার বারের মানে'—কাণজীর মুখে তো এই প্রশ্ন আসিয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিল, 'না যদি বলে, তবে চার কেন পাঁচ বারও করা যায়। আর এই কাজে যদি ধূলিয়া বাধা দেয় তবে তাকে আমি দেখে নেব। এর জন্য যদি…'

আঙ্গুলে গমের পাতা জড়াইতে জড়াইতে হঠাৎ জীবী উপরের দিকে তাকাইল। 'তোমার মাথা তো খারাপ হয়নি!' বলিয়া তেজোদীপ্ত চোখে কাণজীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'জীবী কোনও স্বামীর খোঁজের জন্য কাঙাল নয়, বুঝেছ? খোঁজার দরকার হলে সে খুঁজে নিতে পারে।' একটু থামিয়া আবার বলিল, 'হয়েছে কি জান? কার জন্যে যেন একটা টান হয়েছিল, তা যদি না হোত তাহলে…'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে' যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে এইভাবে কথাটা বলিয়া কাণজী হীরাকে দূর থেকে আসিতে দেখিয়া জোরে হাঁক দিল, 'ভাই একটা বিড়ি কি হবে না?'

'কোথায় বা কবে কিছু থাকে?' বলিয়া জীবী চলিল। গমের পাতা ছিঁড়িয়া টুকরা করিতে করিতে জীবী চলিয়া যাইতেছে, উহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাণজীর চোখে জীবীর মূর্তি ঝাপসা হইয়া আসিল। পাশের কুয়াও যেন চোখে দেখে না। তখন কাণজীর হুঁস হইল, চটপট চোখ মুছিয়া ফেলিল। দেখে, পাশে হুঁকা হাতে হীরা দাঁড়াইয়া আছে। হাতের মুঠা হইতে তামাক নিতে নিতে কাণজী বলিল—'তবে চল, আজ

থাক। সূর্য তো মাথার ওপর উঠেছে, তবু এখনও···।'

কিন্তু হীরা কিছু প্রশ্ন না করিয়া পারিল না, বলিল, 'সে সব তো হবে, কিন্তু কেন এমন হয়েছিস ?'

কাণজী হাসিয়া বলিল, 'কিছু নয় রে! তুই শীগগির কর না, আজ যখন এত জল দেওয়া হয়েছে···'

হীরা বলিল 'না হয় কালই হবে তাতে কি ?' বলিয়া হীরা তামাক সাজিতে লাগিল। আজকের দৃশ্য আর কাণজীর জলভরা চোখ তাহাকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। মনে মনে বলিল—'আজ নয়, কিন্তু আর একদিন শপথ করিয়ে নিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'তোর পাথরের মতো কঠিন বুকে এসব কি হচ্ছে ? মায়ামুক্ত, গীতার ভক্ত, তোর মনে এসব জঞ্জাল কিসের ?' আর যে দিকে কাণজী হুঁকায় মুখ লাগাইয়া, মাথা ঝাঁকাইয়া পায়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল সে দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের মনেই বলিতে লাগিল—'যাই বল হীরা এর মধ্যে বড় কিছু রহস্য আছে। না তো দুঃখের পাহাড় কি টলে ? নিজের বাবার মৃত্যুতে যার চোখে জল আসে নি, তার চোখে দিনে দুপুরে এই অশ্রু।'

সেদিন কাণজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জীবী তো দিনকতক গুম হইয়া ঘুরিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এই শূন্যতা তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল। 'ও যদি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে, তবে আমিই বা কেন ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না?—এই চিন্তার পর সে যেন বেশি করিয়া লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে লাগিল। যেখানে কাণজী সেখানে জীবী বেশি করিয়া যাইত, তরুণ বয়সের উপযোগী ঠাট্টা তামাশা করিত।

আজও জীবী তাহাই করিতেছিল। কাণজী, মনোর, আরও কয়েকটি ছেলে হীরার ওখানে বসিয়াছিল। জীবী সেখানে উপস্থিত হইল। কথা বলিবার সুযোগ পাওয়া মাত্র বলিল, 'মনোর ভাই, মুখ তো ভারি সুন্দর, মন যে কালো।' সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'ওহো! সেদিন ভজন গাইতে গাইতে ভারি মত্ত হয়ে গিয়েছিলে! গানে তো ভুল-ভাল হচ্ছিল, কিন্তু পাখোয়াজের সঙ্গে এমন উদ্ভাসিত হয়ে গান গাইলে যেন তুমি গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করছ!'

এ কথা শুনিয়া কাণজী কেন জানি কড়া চোখে জীবীর দিকে চাহিল। কিন্তু জীবী তো ওর দিকে পিঠ করিয়া বসিয়াছিল। কাণজীর রাগ বাড়িয়া গেল। জীবীকে মনোর প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিতেছে দেখিয়া ওখানে বেশিক্ষণ থাকিল না। যাইতে যাইতেও জীবীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু না পড়িল তাহার চোখের পলক না করিল সে কথাবার্তা বন্ধ। কাণজী বিড় বিড় করিয়া বলিল, 'শালী! এ যে দেখছি রীতিমত বেহায়া! আমি বৃথাই জীবী জীবী করে মরছি! ঠিক আছে? ফের যদি বেহায়াপনা করতে আসে তবে এমন কথা শুনিয়ে দেব যে আর মুখ খুলতে হবে না।'

সুযোগও জুটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কাণজী আর হীরা খেতের দিকে যাইতেছিল। জলের কলসী লইয়া জীবীও এদিকে আসিতেছিল।

কাছে আসিতে হীরাকে ও ঠাট্টা করিয়া বলিল, 'ও হো, হীরা ভাই, এমন বুক ফুলিয়ে কোথায় চলেছ?'

কাণজী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কড়া চোখে জীবীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'কার উপর আবার? নিজেরই উপর...'

কাণজীর দিকে চোখ না তুলিয়া যেন নিজের মনেই জীবী বলিল, 'জিজ্ঞাসা না করতেই, যেখানে দেখা সেখানেই কথার মাঝখানে কথা বলা—এ কেমন স্বভাব?'

জীবী তিরস্কারসূচক মুখের ভাব করিয়া চলিতে লাগিল। রাগে লাল হইয়া কাণজী হীরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

'বাপতেবৌ অকারণে মুখ খিস্তি করতে শিখেছে, না রে।'

হীরার অবশ্য একে মুখরা বলিয়া মনে হয় নাই। গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও যেমন কথাবার্তা বলে, জীবীও সেইরকম করিত। কিন্তু খোঁচা দিবার সুযোগ সে ছাড়িল না। বলিল, 'আমি আগেই বলেছিলাম মেয়ে জাতকে বিশ্বাস নেই। ভাল খেতে পরতে পেলে আর তোকে আমাকে কাউকেও পরোয়া করবে না।'

'ও যদি পরোয়া না করে তো আমিও করব না। ওর মতো অনেক দেখে'ছ।' এত রাগ হইয়াছিল যে তখন যদি জীবী সামনে পড়িত, তবে বেশ কড়া কথা শুনাইয়া দিত।

হীরা হাসিয়া বলিল, 'তা তোরই বা ওর কথায় কি দরকার?'

কাণজীর একথা সহ্য হইল না। ইচ্ছা হইল বলে, 'পরোয়া না করত তবে কি অর্ধেক রাতে আমার পিছন পিছন আসত?' কিন্তু সামলাইয়া বলিল 'ঠিক কথা', আর যে হীরা জীবীর প্রতি উহার আকর্ষণ কিছু দিনের মতো শেষ হইয়াছে দেখিতে চায়, তাহার মনোবাঞ্ছা ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

আবার কথা পাড়িবার জন্য হীরা বলিল—'দুদিন পরেই তো ওর উপর গান বাঁধতে শুরু করবে।' কাণজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ও ফের বলিল—'আর ও তো ফুলে যাবে।'

ইহার জবাবে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাণজী শুষ্ক হাসি হাসিল, বলিল—'আরে তুই বলিস কি? ওর জন্য আমি গান বাঁধা ছেড়ে দেব

না কি? আর ও জানবে কি করে যে আমি ওরই জন্যে গান বাঁধছি? ও তো এখানে এসেছে মাত্র চার মাস! তার আগে আমি কার জন্য গান বাঁধতাম?' একটু তিরস্কারের সুরে এই কথাগুলি বলিয়া হাসিল, বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'কি কথাই বললি?'

হীরা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'ভাই, তোমাকে গান করতে কে মানা করছে? তুমি খুব গাও, কার কি এসে যাবে?' ক্রোধভরা চোখে কাণজীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'লোকে এসব কথা বলে, তাই আমার বলা। আমি কি বানিয়ে বলছি?'

কাণজী একটু দমিয়া গেল। হীরাকে বলিল, 'ছ্যাখ, আমি তোকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি···' আঙ্গুল উঁচু করিয়া বলিল, 'আমি কোন লোককে কি তার বাপকে—বাপের···কাউকে ডরাই না, ডরাবার লোক আমি নই' সে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া দিল, ফের দাঁড়াইয়া পড়িল আর রাগত মুখে হীরাকে বলিল, 'হ্যাঁ কথা তো ঠিক যে আমি ওকে নিয়ে গান বাঁধি, কিন্তু কাল যদি আমি ওকে নিজের ঘরে নিয়ে আসি; তবে কি তোরা সবাই মিলে আমার নাক কান কেটে দিবি নাকি?'

হীরার মনে হইল, শালা বিগড়ে গেছে। বলিল, 'বেশ তো, ঘরে আনবি তো আন না! কে তোকে মানা করছে?'

'কিন্তু হীরা, তুই ভুল করছিস। তাও করে দেখাতাম···একটা কথা মনে আসছে···এই বাঁদরটার সঙ্গে ওর গাঁঠছড়া বাঁধা না হয়ে যেত যদি, তো তাও করে তোদের দেখাতাম!'

'হয়েছে হয়েছে। মিথ্যে বক্ বক্ করছিস কেন? ······যদি সাহস থাকে তবে ঘরে না এনেও তো···। কিন্তু ভাই, এতো ছেলে খেলা নয়। প্রাণ হাতে করে চলতে হয়।'

'সময় এলে তাও হতে পারে।' কাণজী বলিল।

হীরা বলিল—'তবে দেরি করছিস কেন?' কাণজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হীরা বলিল—'তুই ওকে ঘরেও আনছিস না আর পিছুও ছাড়ছিস না। এতে তোর লাভ কি?'

কাণজী হীরার মনের কথা বুঝিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া বলিল—'কিন্তু তাতে কি হয়?'

'তবে ওর আশা ছেড়ে দে।'

কাণজী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—'যেদিন এল সে দিন থেকেই তো আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

অনেকক্ষণ গভীর নিস্তব্ধতা, দুজনেই চুপচাপ।

হীরা যেন চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিল, আর বলিল, 'আমি ভাবছি, তুই কবে থেকে এত ভক্ত হয়ে গিয়েছিস?'

কাণজী বলিল—'ভক্ত হয়ে গিয়েছি কি আর কিছু হয়েছি জানি না, কিন্তু আজ যখন কথা উঠল তখন তোকে সত্যি বলছি, যদি করব তো পুরোপুরি করব! খোলাখুলিভাবে যদি ওকে ঘরে এনে রাখতে পারি, তবেই ওর দিকে যাব। নইলে পৃথিবী উলটে গেলেও আমি ভুল পথে চলব না।' বলিয়া কাণজী জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল।

'তা—তুই-ই জানিস'—বলিয়া হীরা গোঁফে তা দিতে লাগিল। পরের দিন হীরা ভগতজীর ঝোপড়িতে গেল। দুইজনে ছোলা ভাজা খাইতেছিল। হীরা কথা পাড়িল, 'ভগতজী, তুমি স্বীকার কর আর না-ই কর, কাণজীর কিছু একটা হয়েছে। আমার যেন মনে হচ্ছে, ও কিছু একটা করে বসেছে।'

ভগতজী না হইয়া অন্য কেহ হইলে তাহার হাতের ছোলা হাতেই থাকিত, হীরার শোকার্ত মুখাকৃতি দেখিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া যাইত— কে, কার কথা বলছ, কে কি করেছে। কাণজীর কিছু হয়েছে নাকি। কিন্তু ভগতজীর এসব কিছুই হইল না। হীরার দিকে একবার চাহিয়া ছোলার দানা মুখে পুরিয়া বলিলেন, 'তোর কথা বুঝলাম না, হীরা!' ফের ছোলা চিবাইতে লাগিলেন।

হীরা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কিছুই যেন জান না, ভগতজী! ঐ দিন তুমিই তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'কাণজী আজকাল আমার কাছে আসা যাওয়া বন্ধ করেছে কেন? আর আজ উল্টে···'

'হাঁ, হাঁ, কিন্তু ওর হয়েছেটা কি? তুই 'ও ও' বলছিস তা এতে কি বুঝব?' এই বলিয়া হীরার দিকে একবার চাহিয়া ভগতজী আবার ছোলাভাজা খাইতে লাগিলেন।

হীরা নিজের মনেই বলিল, 'আমিও যদি পুরোপুরি না শুনে থাকি তো

তোমাকে কি বলব?' হীরার রাগ দেখিয়া ভগতজী হাসিতেছিলেন। ঝোপড়ির বাহিরের দিকে নজর করিয়া হীরা ভগতজীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। 'ঐ নাপতে বৌয়ের কথা হচ্ছে। তুমি মন্তর-তন্তর বিশ্বাস কর বা না কর ভগতজী, আমি কিন্তু করি। আমার মনে হয় ঐ ষাঁড় কাণজীকে যাদু করেছে।'

ভগতজীর হাসি আসিল—'কেমন করে জানলি? তুই কি নিজের চোখে যাদুকরকে দেখেছিস্?'

হীরা বলিল—'এর মধ্যে যাদুকর আবার কি করবে ভগতজী, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি।'

ভগতজী বলিলেন—'কি দেখেছিস্, বল তো? কাণজীর মন জীবীর ওপর পড়ছে?' হীরা বলিল, 'কিন্তু এ রকম হলে…' ভগতজী বলিলেন, 'কি করে জানলি, লোকে বলে, এই না, কিন্তু আমার তো মনে হয় লোকের এই কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যি নেই।'

'আর সত্যি হলেও তো দোষের কিছু ছিল না। ওর পাপ ওকেই জিজ্ঞাসা করতাম কিন্তু এ যে একসময়ে এরা যেন দুই দেহে এক প্রাণ, আবার ক্ষণপরেই দেখি এ ওর ছায়াও মাড়াতে চায় না—এ থেকে কি বুঝব বল? ওকে প্রশ্ন করাই যায় না।'

ভগতজী হীরার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন আর গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিলেন, 'তা তোর কি মনে হচ্ছে বল্ তো!'

'আমি তো তোমাকে বলে দিচ্ছি, এই জীবী ওকে কিছু করে দিয়েছে—তা না হলে…। আমি এর চেয়ে ভালো মেয়ে দেখেছি ভগতজী। কোন জায়গায় হয়তো পা পিছলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ধন্য এই কাণজী। রত্তি প্রমাণ এদিক ওদিক হয় না। হাঁ, হাসি ঠাট্টা করে বটে—কিন্তু স্থান কাল সব ঠিক দেখে নেয়। যাওয়া আসার নাম কিন্তু করে না।' তখন ভগতজীর হাসির সঙ্গে নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমিই বল ভগতজী। এরকম লোক জাত পাতের ঠিক নেই এমন মেয়ের পেছনে অন্ধ হয়ে ঘুরছে, এও কি কিছু না করলে সম্ভব হত।' ভগতজী মুখ নিচু করিয়া ছোলার দানা ছাড়াইতেছিলেন, তাঁহার মাথা নাড়া দেখিয়া হীরা বলিল, 'তুমি বিশ্বাস করলে না ভগতজী, আমরা ডুগডুগি বাজিয়ে যদি পরখ করে দেখিয়ে দিই? যদি

কাণজীর ওপরে কিছু না ভর করে থাকে তো কি বলেছি।'

'তোর সব কথা সত্যি, কিন্তু ঐ যাদু করার কথাটা মিথ্যে।' বলিয়া হীরার দিকে হাতের ইশারা করিয়া বলিলেন, 'আরে পাগলা, স্ত্রীলোকের চোখের মহিমা তুই কি জানিস্? স্বয়ং মহাদেব ফাঁদে পড়ে গেলেন আর এ বেচারা কাণজীর দোষ কি?' ভগতজীর মুখে হাল্কা ধবণের একটা হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। 'না না, কিন্তু ভগতজী···'

ভগতজীর মুখের ছায়া একটু সরিয়া গেল। 'না রে এসব মিথ্যা, মেয়েরা নিজেরাই মায়াবিনী! ওদের অন্য যাদু করার দরকারই নেই।' একটু দম নিয়া বলিলেন, 'তুই আর কাণজী মনে করিস ভগতজী কিছু জানে না, কিন্তু আমি স-ব জানি। ও আমার কাছে আসে না কেন? ওর তম্বুবার তাল তো কানে আসে। ও কি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে? জীবীর মুখ দেখবে বেশ কথা। কিন্তু গাঁয়ের কারু কাছে একথা কি লুকানো থাকবে।' হীরার দিকে চাহিয়া তিনি আরো বলিলেন—'তুই যাদু বলছিস্, আমি তো দেখছি বড় একটা কষ্টের রোগ যার কোন ওষুধ নেই। তবে হাঁ, এরা দুজনে যদি এক হয়ে যেতে পারত আলাদা কথা। কিন্তু তাহলে তো বুঝব স্বর্গ নেমে এসেছে। নইলে ওর এই কাঁদা আর গান গাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।' যেন খুব একটা আশ্চর্য কথা বলিয়াছেন এমন ভাবে, জোরে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া হীরাকে বলিলেন, 'এ যাদু টাদু নয় রে, এ হলো এক জনের সঙ্গে অন্যের হৃদয়ের মিলন।' বলিতে গিয়া ভগতজীর মুখ এমন ভাবে খুলিয়া রহিল, মনে হইল তিনি বুঝি হাসিতেছেন।

'কিন্তু এ কথায় তুমি এমন প্রসন্ন হয়ে উঠলে কেন ভগতজী? একটা উপায় খোঁজ না। মন যে দুজনেরি মিলেছে তা তো আমি বুঝেছি, কিন্তু এর একটা উপায় তো বার কর। তবে তো বুঝব, ভগতজীর ভালোবাসায় কিছু কাজ হল।'

'নারে ভাই। ভগতজীর হাতে যদি উপায় থাকত, তবে তো ভগতজী নিজেই আজ স্বর্গ সুখ—' তখনই কথা পাল্টাইয়া বলিলেন, 'হীরা এর নামই জীবন। তুই কেন মিথ্যা এই ঝামেলায় জড়াচ্ছিস্। যা হবার হতে দে, আর যা দেখছিস দেখে নে। যদি সহ্য করতে না পারিস, তো নিজের রাস্তা—'

হীরার তো মনে হইল ভগতজী বুঝি পাগল হইয়া গিয়াছে। ও একটু রাগত ভাবেই বলিল, 'ভগতজী, তুমি কি পাগল হয়েছ? ভাব তো যদি কিছু হয়ে যায়...ওরা দুজনে নাহয় ঘর বসত করে নিল, কিন্তু তার পর জাত-পাঁত, ভাই বন্ধু আত্মীয় কুটুম্ব—এদের সকলের কি হবে। আর ধর, ওদের ছেলেপুলের—।'

'ভালো রে ভালো, 'তুই ভগবানকে তো মানিস। এসব ভাবনা তাঁরই উপর ছেড়ে দে না? মিছিমিছি···'

'ছেড়ে দিই আর কি? তোমার চালাকি রাখ—তুমি তো সোজা পথ না দেখিয়ে বাঁকা পথ দেখাচ্ছ। লোকে যা বলে তা তো আর সব মিছে নয়। তোমার কাছে আজ থেকে আর এসে বসব না।'

ভগতজী না হইয়া আর কেহ হইলে, 'বেশ তো, বসো না। কে তোমাকে ডাকতে গেল' বলিয়া হীরাকে ভাগাইয়া দিত। ভগতজী কিন্তু হীরার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। করুণা মাখা স্বরে বলিলেন, 'এ তুই কি বলছিস্ হীরা। তোর আর কাণজীর মন্দ দেখে কি আমি হাসতে বা খুসি হতে পারি? আর তোদের দুজনের কথা তো যেতেই দে, রাস্তার লোকেরও দুর্ভাগ্য আমি দেখতে চেয়েছি কি?'

'তা বলছি না, তবে তুমি বললে কিনা, যা হবার তা হতে দে, তাই বলছি। তোমার মতো লেখাপড়া জানা লোকের কি এমন কথা বলা উচিত?'

'লেখাপড়া করেছি বলেই তো এরকম বলছি রে হীরা।'

'কখনো না, তুমি একা মানুষ, তোমার কথা আলাদা, সেজন্য তুমি যাখুসি বল, যা খুসি কর। তোমার তো সবই সাজে, কিন্তু আমাদের মতো···।'

'বল্ তো, কাণজীর জন্য তোরই ভাবনা, আমার কিছু নয়?' ভগতজীর মুখ বিষাদে ছাইয়া গেল।

'তা নয়, কিন্তু তবু তুমি···তুমি যা বলছ তা তো ভগতজী···!' হীরাকে সাবধান করিয়া দিয়া ভগতজী বলিলেন, 'তুই তো আচ্ছা লোক!'

'কিন্তু তোর জায়গায় আমি কাণজীর বন্ধু হলে এখনই জীবীকে নিয়ে ওর ঘরে বসিয়ে রেখে আসতাম।'

এ কথায় রাগ করার কিছু অবকাশ না থাকিলেও হীরা রাগ না করিয়া

পারিল না, 'থাক্ তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, তুমি চুপ করে থাক।' এই বলিয়া যেন আপন মনেই আস্তে আস্তে বলিল—'আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার মতো লোকের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম।'

'রাখ্, নে, নে, এখনই কি হয়েছে? এই তামাকটা একটু নে তো! ধোঁয়ার সঙ্গে তোর কথার বাষ্পও উড়ে যাবে।' বলিয়া ভগতজী ছিলিম সাফ করিতে লাগিলেন।

অন্যমনস্ক হীরার উদাস মুখের ভাবে মনে হইল যেন সে ভাবিতেছে যে তাহার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল।

হীরা তো কাণজীর সঙ্গে পথে কোন কথাই বলিল না, কিন্তু সকালে একজন লোক তাহাকে বলিল—'কাণজী ভাই, কিছু শুনেছ? তুমি কি জান না ধুলিয়া রাত্রিবেলা তার বৌকে খুব মারপিট করেছে?'

'কেন, কিজন্য?' কাণজীর মুখ হাঁ হইয়া গেল।

'কেন, তা ভগবান জানেন। কিন্তু দুইদিন হল কোন জায়গায় তোমরা সকলে বসেছিলে! লোকে বলে যে সেখানে গিয়ে জীবী সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছিল, কাল রাত্রেতে ধুলিয়ার কানে একথা পৌঁছে থাকবে। এরপর বৌকে খুব মারপিট করেছে!'

'কর্মফল ভোগ করতে হবে, শালা, আমার কি?' বিড়বিড় করিতে করিতে কাণজী বাড়ি যাইবার জন্য উঠিল। পথে রাস্তার ধারে জীবীকে আসিতে দেখিয়া উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কাল রাত্রির মারপিট সম্বন্ধেই— ইচ্ছা হইল, কিন্তু এই দেবীও কি কম! এমন কাজ করে, যাহাতে কিনা মার খাইতে হয়? এই কথা ভাবিয়া চুপচাপ চলিয়া যাইবে স্থির করিল। মনে মনে ইহাও ভাবিল, 'এর বলার গরজ নেই, আমারই বা জিজ্ঞাসা করার গরজ কি?'

কিন্তু অন্যদিকে জীবীও কাণজীকে দেখিতেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। চোখে কিছু জলও আসিয়া পড়িয়াছিল। পা-ও একেবারে আলগা হইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল বুঝি এখন পড়িয়া যাইবে। যদি ঐ পথের পাশে একটু জায়গা থাকিত তবে সে ঐ রাস্তা দিয়াই বা কেন যাইবে, একবার তো ঐ সরু পথ দিয়াই অবশ্য চলিয়া যাইত। চোখের জল রোধ করিবার জন্য সে ঠোঁট কামড়াইয়া থাকিল আর কাণজী যেন মুখ দেখিতে না পায় সেজন্য আঁচলে মুখ ঢাকিল। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল…।

কাণজী কিছু বলিবে না ভাবিয়াছিল। কিন্তু সে-তো আর না বলিয়া

থাকিতে পারিল না। 'কি! কাল রাত্রিবেলা কি হয়েছিল?'

জীবী একটু ফোঁপাইয়া উঠিল। চোখ হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রু একেবারে ধারায় পরিণত হইল। কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না। দাঁড়াইয়াও থাকিল না। যেমনই কাণজীকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইবে, অমনই তার কানে একটা কঠোর শব্দ পৌঁছিল—'দাঁড়াও!'

তথাপি জীবী তো দুই পা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর এক পা-ও আগাইবার সাহস হইল না। সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কাণজী পিছন ফিরিয়া আবার প্রশ্ন করিল—'কাল রাত্রে কিসের ঝগড়া হয়েছিল?'

চোখের পাতা আটকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে জীবী কষ্টে-সৃষ্টে বলিতে পারিল—'কিছু হয়নি।' এই বলিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

'কিছু হয়'নি কেন? দাঁড়াও, যা হয়েছে সব সত্যি সত্যি আমাকে বল।'

কাণজীর চোখে ছিল আগুন। সামনে পিছনে লোক জল আনিতে যাইতেছিল, সেদিকে তাহার দৃষ্টিমাত্র নাই। জীবী বধির হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'কি, শুনতে পাও না? বলছি যে দাঁড়াও!'

সে জলভরা চোখে তাহার প্রতি তাকাইবার চেষ্টা করিল। কান্না ও শব্দ দুই-ই একত্র মিলিয়া গেল—'সকলে মিলে চারদিক থেকে কেন আমার অপমান···'আর বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চলিয়া গেল।

কাণজী গাঁয়ের দিকে চলিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে বিড় বিড় করিতে লাগিল—'ঠিক রে ব্যাটা, আজ আমি তোর খবর নেব। আমি তো ভেবেছিলাম, যেতে দাও, কোন কথা নয়; কিন্তু এই ধরণের ব্যাপার, মাথার উপর চড়ে বসেছে' গ্রামের মধ্যে যদিও সে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু তাহার চালচলন ভিতরের ভাবকে প্রকাশ করিতেছিল। দুই-একজন তো প্রশ্নও করিয়াছিল, তাহাদের সে যাহা হউক একটা জবাব দিয়া চুপ করাইয়াছিল। সে সোজা ধুলার ঘরের দিকে যাইতেছিল!

হীরা ঘরের বড় দরজার পাশে ভিতরের দিকে পাতা খাটের উপর বসিয়া দড়ি বুনিতেছিল!

আঙিনা হইয়া যাইবার সময় রাস্তার উপরে কাহাকেও জোরে জোরে হাঁটিতে দেখিল। পিছন হইতে তাহার সন্দেহ হইল—'ওরে, কাণজী না,

আর কেউ? কে যায়?'

'হাঁ, কেন!'

কাণজী দুই পা পিছনে হটিয়া জিজ্ঞাসা করিল! তার চোখ দুটি ছিল লাল, মুখ রাগে থম্‌থম্‌ করিতেছে।

'এ ভাব কেন?' হীরা বলিয়া উঠিল! হাসিয়া বলিল, 'আরে আয়। ভগতজী নিশ্চয় এখনও খেতে পৌঁছয় নি।'

এই বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, 'আন, হুঁকাটা ভরে দিই।'

কাণজী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাড়ার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কাতর নয়নে ধুলার ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দীর্ঘশ্বাস টানিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া দরজার দিকে ফিরিল! দরজার দিকে মুখ করিয়া পা ঝুলাইয়া খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িল। হাতের তালুর উপর কান রাখিয়া আবার নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া রহিল।

হীরার বৌ কংকুর কাছেও কাণজীর এত গম্ভীর মুখভঙ্গী অভাবিত ছিল। 'কাণা ভাই, কোন চিন্তায় ডুবে আছ?' কংকু ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

'কিছু নয়?' বলিয়া কাণজী হীরাকে জিজ্ঞাসা করিল 'ওরে, তুই তো তামাক সেজে রেখে দিয়েছিলি, না?'

দড়ির সঙ্গে হাত চালাইতে চালাইতে হীরা বলিল, 'এইটুকু বাকি আছে, ঠিক করে তামাক সাজব। তোর এত তাড়া কেন রে?'

'যা হচ্ছে, ঠিকই হচ্ছে, তুই একবার তামাকটা সাজ তো!' এই বলিয়া কাণজী দরজার বাহিরে চাহিতে চাহিতে নবোদ্গত গোঁফে তা দিতে লাগিল।

'কিন্তু বল্‌ না; খেতে গোরু মোষ ঢুকে গেছে কি?'

'না, ভাই, না।' কাণজী একটু রাগিয়াই বলিল।

'তবে এত রাগ করে কোথায় যাচ্ছিস্‌?'

কাণজীর মুখের ভাব আবার কঠিন হইল। বলিল, 'কোথায়? ঐ চামারকে একবার দেখে নেব। ও শালা ভাবছে কি?'

'কিন্তু, হয়েছেটা কি?' এই বলিয়া দড়িটা একদিকে সরাইয়া দিয়া দেওয়ালের পাশে রাখিয়া হুঁকাটা হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করিল,

'তোকে কিছু বলেছে?'

'আমাকে কি বলতে পারে? বলবে তো ঐ··· কিন্তু ওকে চলতে ফিরতে মারে। ও নিজেকে কি মনে করে?'

'কিন্তু তাতে আমাদের কি? ওর জিনিস, দোষ করলে তো মারবেই, এই কথা নিয়ে আমাদের লড়তে যাওয়া কি ভালো দেখাবে? কারও সন্ধান পেলে তবে তো···'

'হীরা, তুই এ সময়ে আমাকে কিচ্ছু বলিস্ না! সত্যি বলতে কি, এসব তুই-ই করিয়েছিস্। আমি বলেছিলাম না ঐ লোকটার কানা কড়িরও দাম নেই! উল্টে বেচারি দুঃখ পাবে! কিন্তু···'

'কিন্তু, ভালো মানুষের বেটা, যদি একথা বলতেই হয় তবে বলার ধরন রেখে তো বলতে হবে! এইভাবে একপক্ষ নিয়ে কোথায় লড়াই করতে যাবে? পথে চলতে চলতে লোকে বলবে, 'ওদের কি দরকার? আমাদের জাতের সঙ্গে তো ওদের জাতের কোনও সম্বন্ধ নেই! উল্টে'···

'সম্বন্ধ নেই কেন? ওকে এখানে নিয়ে আসার মধ্যে তুই আর আমি —আমরা দুজনেই তো ছিলাম? ওর অন্তর্দাহ আজ এভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তুই তো জাতের কথা বলে কেটে পড়লি, কিন্তু আমি যে তা পারি না।' আর কাণজীর এত রাগ হইয়া গেল যে বলিল— 'হুঁকাটা একবার আমাকেও দে, আমি এখনই একবার ওকে দেখে নেবার ব্যবস্থা করে আসি।'

হুঁকা দিতে দিতে হীরা বলিল, 'তুই একটু শান্ত হ'। এসব কথা বলার জন্য তো আমরা আছি। মিছিমিছি নিজের হাতে নিজেকে থাপ্পড় মারিস কেন?'

কাণজী তামাক ছাড়িয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'এসব খোলাখুলি অপমানে আমি ভয় পাই না, বুঝলি হীরা? এর বিপরীত আমি তো কোন মেয়ের জন্য— যে বেচারি শ্বশুরঘর করে নাই, বাপের বাড়িও যার নেই— তার অপমানে কাঁদি না। আমি আর পেরে উঠছি না।' বলিয়া হুঁকায় একটা টান দিয়া হীরার হাতে দিয়া বলিল, 'তুমি যদি লোকের ভয় কর তো, চুপ করে থাক। আমি ওকে কিছু বলবই! যদি শালা যা-তা কিছু বলে, তো মারও লাগাব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

কংকু স্তব্ধ হইয়া গেল! সে আর হীরা দুইজনে মিলিয়া ধীরে ধীরে

কাণজীকে শান্ত করিল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,··· আজকের মতো··· কিন্তু যদি ও কখনো আবার ওকে মারে তবে···। যদি ওর কোনো দোষ থাকে আর মারপিট করে তবে সে কথা আলাদা ; কিন্তু এভাবে চলতে ফিরতে বিনা দোষে মারে— তবে তার ফল তো ভালো হবে না হীরা! বলতে হয় তো ওকে বলে দিও।' এই বলিয়া কাণজী উঠিল।

পরে কংকু ধূলাকে ধমক দিল! হীরাও ধূলাকে খারাপ ভাবে গালাগালি দিয়াছিল! সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিল—'গরম গরম রুটি পাস্ তো চুপচাপ খেয়ে যা। যদি আবার এমন হয় তবে তোর কাকা কাণজী তোকে না মেরে ছাড়বে না। আর তোকে সত্যি বলছি, ওর রাগ হল চণ্ডাল। আমার তো মনে হয়, তোকে মারবে, ওকে মারবে আর নিজেও মরবে। বিশেষ কোন লাভ কারুর হবে না।'

যদিও ধূলা কাণজীকে খুব ভয় করিত, তথাপি অন্য দিকে মোড়ল ও ও রাজ্যের আমলাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইত। প্রত্যেকবার সঙ্কটের সময় তার মনের কথা শুনিত রেশমা। সে ওর প্রতিবেশী ছিল। যদি কাণজীর জায়গায় আর কেউ হইত, তাহা হইলে আমলাদের সাহায্য লইয়া তাহাকে ঠাণ্ডাও করা যাইত। কিন্তু সে জানিত যে কাণজীকে মোড়ল তো দূরের কথা, আমলাদের পর্যন্ত থামাইবার সাধ্য নাই। মাত্র গত বৎসরই পুলিসের একজন লোককে গলা টিপিয়া তাহার আজন্ম গালি দেওয়ার অভ্যাস ছাড়াইয়া দিয়াছিল! এ বিষয়ে অফিসারেরাও অল্পবিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অনেক কষ্টে উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ধূলা জানিত, যদি কাণজীকে কোন আইনে ধরা যায় তবে রাজ্যের আমলারা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া উহার মাথায় চড়িয়া বসিবে। কিন্তু এমন কোন আইনে ধরা যায়, তবে তো? হীরা বুঝাইলে উহার চেতনা হইল না, বরং রাগ বাড়িয়াই গেল—'আমিও দেখে নেব, ও কিরকম করে মারে। এতদিন ধরে আমলাদের যে পদসেবা করেছি তার কি কোনও ফল হবে না?' আর ধূলার এই প্রভাবের কথা কাণজী না জানিলেও হীরা তো তাহার ক্ষমতার কথা ভালো করিয়াই জানে। সে রাত্রিবেলা কাণজীকে খুব বুঝাইল, কিন্তু কাণজীও কাঁচা লোক নয়। ব্যাকুল হইয়া সে হীরাকে

বলিল, 'আমি সব জানি হীরা, কিন্তু ওর উপর যে মার পড়ে, আমি তা চোখে দেখতে পারি না।'

কিছুক্ষণ থামিয়া 'আমারও ভয় হয় যে আমি হয়তো কাউকে মেরে বসব, নয় তো' বলিতে বলিতে কাণজী চুপ করিয়া গেল। কিন্তু হীরা বুঝিতে পারিল কাণজী কি বলিতে চায়। বলিতে চায়—'না হয় আমি ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যাব।'

সেদিন ভগতজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার পর হীরার সন্দেহ কিছু কমিল বটে, কিন্তু যে কাণজীর হৃদয় পাথরের মতো তাহাকে এমন বিবশ দেখিয়া উহার বিশ্বাস হইল যে জীবী নিশ্চয় উহাকে কিছু তুক্‌তাক করিয়াছে। আবার মনে মনে ভাবিল, 'সকলে মিলে মাথা ফাটাফাটি করে মর। মরলে আমার কি?'

হীরা ও কংকু ধুলিয়াকে বুঝাইবার পর তো ধুলার মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল। শুধু দিনের বেলায় জীবীর চোখে তাহার খারাপ মেজাজ ধরা পড়িত। জীবীরও মর্যাদাবোধ ছিল। এজন্য ধুলাভাইয়ের রাত ব্যর্থ যাইত। সত্য কথা বলিতে কি, দিনের বেলা উহার যতখানি ধমক, রাত্রে তাহার কিছুই থাকিত না। জীবী তাহার বুকে এক-আধবার লাথি মারিয়াছে কিনা তাহা ঐ দুজনারই জানা, কিন্তু এ কথা সত্য যে রাত্রিবেলায় ধুলা তাহাকে দেখিয়া ঘাবড়াইত। রাত্রে তো নানী বুড়ি বাহিরের বারান্দায় শুইয়া থাকিত, সে ধুলাকে অকথা গালি দিতে শুনিয়াছিল এবং পরে ধমাধম শব্দ শুনিয়া দরজাও খুলাইয়াছিল। কিছু গোপন রহিল না। উভয়কেই সে মিহি গলায় যাহাতে শুধু ঐ দুইজনই শুনিতে পারে এমনি ভাবে গালি দিয়া ধুলাকে বাহিরে শুইতে পাঠাইল, আর নিজে ঘরে গেল।

জীবীকে কাছে বসাইয়া 'আমাদেরও তো জোয়ান বয়স ছিল' বলিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

পরে ধুলাকেও ভর্ৎসনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া জীবীর মগজে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'দুইজনের বংশের মর্যাদা জীবীদেরই হাতে।' সকালে ধুলাকেও শিক্ষার ঢঙে ধমক দিয়া বলিল—'এইভাবে মারপিট করলে কি কোথাও কাজ হয়? এক দিকে চোখ রাঙাবে অন্যদিকে স্নেহ ঝরবে তবে না পুরুষ।'

'সে তো ঠিক কথা', বলিয়া ধুলা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'যদি এই ষাঁড়কে আর ঐ নাগরকে মজা না দেখাই তো আমার নাম ধুলা নয়।'

এই কথাটা ধুলা এমন করিয়া মনে রাখিল যে সে গ্রামের ঠাকুর বংশের দুই-চার জন জোয়ান চৌকিদারকে বলিয়া রাখিল, যদি কাণজীকে এমন

ভাবে ধরা যায় যে সে আইনের কবলে আসিয়া পড়ে, তো সে ইনামস্বরূপ একটা মহিষ পর্যন্ত দিতে পারে।

কিন্তু গ্রামে কাণজীর যত শত্রু ছিল তাহার অপেক্ষা বন্ধু ছিল বেশি। যখন তাহার কানে এই কথা পৌঁছিল তখন সে খুবই দুঃখিত হইল। একদিন তো সে হীরার নাম করিয়া ধূলাকেই নিজের ঝুপড়িতে ডাকাইল। নিজে ডাকিতেছে বলিলে ধূলা আসিত কি না আসিত। বাড়ি হইলেও নাহয় কথা ছিল। কিন্তু গ্রামের বাহিরে খেতের মধ্যে কখনই আসিত না।

হীরার জায়গায় কাণজীকে দেখিয়াই ধূলার প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলিল—'কাণা ভাই, হীরা ভাই কোথায় গেল? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তা সে কোন কাজে?'

কাণজীর বিশ্বাস ছিল যে যদি 'না' বলি তো অমনি মুখ ফিরাইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিবে আর তাহার উপর ডাকিলে বড় জোর 'মেরে ফেলেছে রে' বলিয়া গাঁয়ের দিকে পালাইতে আরম্ভ করিবে। এজন্য হাসিয়া বলিল, 'এখনি এসে পড়বে। ঐদিকে বেড়া বাঁধতে গিয়েছে। বসো-না!' এই বলিয়া কাণজী তামাক সাজিতে বসিল।

'আমারও তো বেড়া বাঁধার কথা।' বলিয়া ধূলা ঝুপড়ির দরজার উপরেই বসিয়া গেল।

দুই-এক ছিলিম তামাক দেওয়া-নেওয়ার পর কাণজী বলিল, 'দেখ ধূলা, আজ যে তুই আসিয়াছিস, তোকে একটা কথা বলি।'

'বলো না কাণা ভাই! একের জায়গায় বিশ কথা বলো। কি আছে তাতে?'

কাণজী সোজা প্রশ্ন করিল— 'এ কথা কি সত্যি যে তুই মনে করিস যে তোর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আছে?'

কাণজীকে একেবারে শান্ত দেখিয়া ধূলারও সাহস হইল। বলিল, 'আমি তো এমন কিছু বুঝি না ভাই, কিন্তু দুনিয়া বেটা এই কথা বলে। বাকি আমার···'

'দুনিয়া তো যেমন-তেমন। আমি তো তোর কথাই বলি— লোক চুলোয় যাক। আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি। তুই কি এ কথা বিশ্বাস করিস? এই বলিয়া ধূলার পাংশুবর্ণ মুখের দিকে ভালো করিয়া দেখিয়া

বলিল—'দেখ, ভয় কি লজ্জার দরকার নেই। যা হোক, তুই আজ খোলাখুলি বল। আমি আমার নিজের মনের কথা বলি।'

কিন্তু ধূলা কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। অমুক মেয়ে এই বলিয়াছে, অমুক পুরুষ ও কথা বলিয়াছে—বলিয়া সে উল্টা-সোজা কথাই বলিতে লাগিল। কাণজী একটু পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। কনুইয়ের উপর মাথা রাখিয়া সে প্রশ্ন করিল— 'আর এ কথা কি ঠিক যে আমাকে ধরতে পারলে তুই চৌকিদারদের একটা মোষ দিবি?' কাণজীর তো হাসি আসতেছিল।

'এ কথা তো সত্যি, কানু ভাই। কিন্তু আমিও…'

'তোর মনে যা হয় হোক। কিন্তু আজ তোকে আমি স্পষ্ট কথা বলে দিই। এ কথা বলার জন্যই আমি তোকে ডেকেছি।' এই বলিয়া কাণজী উঠিয়া বসিল। বলিল, 'দেখ ধূলা, যদি আমাকে খারাপ কাজ করতে হয় তবে তুই সাতজন পাহারাদার লাগালেও আমি করব। কিন্তু আমার মনে সেরকম কিছু নেই। আমি এমন কিছু করবই না। হাঁ, আমি যখন তাকে আনিয়েছিলাম তখন আমার মনে কোন পাপ ছিল কি না, তা ভগবান জানেন। কিন্তু একদিন যখন ভগতজীর মতো লোক আমাকে সাবধান করে দিল তখন আমি মনকে বেঁধে ফেললাম। আমার আর ওর মধ্যে কোনও অনুচিত ব্যবহার এপর্যন্ত হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। এইটুকু তুই বিশ্বাস করিস ধূলা। হাজার হোক, মানুষ তো, তাই হাসিঠাট্টা হতে পারে, কিন্তু আমি তো ওর সঙ্গে তাও কিছু করিনি। এজন্য তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমা। রেশমার মতো লোকের কথায় এসে ওকে যেতে আসতে মারপিট করা ছেড়ে দে!' এই পর্যন্ত বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস লইয়া এই কথা বলিল—'আমাকে নিয়ে এইসব কথা হয় তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু কোনও কারণ না থাকলেও ওকে নিয়ে এসব কথা হয়, এ আমি আর সহ্য করতে পারি না! এজন্য বলছি, যদি আমার কথা শুনে সুখী হতে চাস তো এসব সংশয় দূর করে দে। আমার দিক থেকে বড় ছোট কোনও কথা শুনলে আমাকে বলবি। দোষ হয়ে থাকলে দণ্ড ভোগ করার জন্য আমি তৈরি থাকব, কিন্তু ওকে মারপিট করা তুই ছেড়ে দিবি!'

'এখন তো ছেড়েই দিলাম কাণা ভাই।' বলিয়া ধূলা উঠিতে উঠিতে

কাণজী আবার বলিল—'এইটা খেয়াল রাখিস, ধূলা! মাঝরাতে বেচারী আমাদের পিছনে পিছনে চলে এসেছিল। ওকে মারধর করলে ওর আত্মা কি বলবে!' বলিয়া কাণজী এক শ্বাস লইয়া তামাক বাহির করিয়া ছিলিম ভরিতে ভরিতে বলিল—'এজন্য আজ থেকে তুই এসব ছেড়ে দে! আর যদি তুই বৌয়ের সঙ্গে মিলে থাকিস তবে জানবি যে সাত জন্মেও এরকম মেয়ে পাবি না। না হলে রোজ যদি এরকম ঝগড়াঝাঁটি হয় তবে ওকে হয়তো কুয়াপুকুরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে, নয়তো···। মানে ভাই, সর্বনাশ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিই যে আমিও এসব বেশি দিন সহ্য করতে পারি না।' বলিয়া কাণজী ছিলিমের দিকে ঝুঁকিল।

ধূলা এ পর্যন্ত যেখানে 'হাঁ, ঠিক আছে সত্যি, কাণা ভাই', বলিতেছিল, সেখানে অন্যদিকে ইহাও ভাবিতেছিল যে কাণজীর কথা কখন শেষ হইবে, কখন সে উঠিয়া পড়িবার সুযোগ পাইবে। কারণ, তাহার ভয় ছিল যে যদি কাণজীর রাগ হয় তবে এই ঝুপড়িতে তাহাকে সাহায্য করিতে কেহ আসিবে ন।

ছিলিম শেষ হইতেই তাহার মুক্তিলাভ হইল। বিদায়ের সময় কাণজী আবার বলিল—'কি বলিস ধূলা? মনে কোনও সন্দেহ থাকলে এখনি বলে ফেল।'

'আরে না কাণা ভাই। এখন আর কিসের সন্দেহ!' এই বলিয়া ধূলা গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল। খেত পার হইবার সময় পর্যন্ত তার ভয় ছিল। কিন্তু যেমনই সে খেত পার হইল, অমনই তাহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

হৃদয়ের সমস্ত ভার যেন হালকা হইয়া গেল। কাণজীর মন একপ্রকার শান্ত হইল।

কাণজীকে এই ভাবে নরম হইতে দেখিয়া ধূলা তো আরও গোঁফে তা দিতে লাগিল; কিন্তু এ কথা শুনিয়া রেশমা তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিল—"ওরে যা, বোকা কোথাকার। এসব দুশ্চরিত্র লোককে তুই চিনবি কি করে? ও প্রতিজ্ঞা করলেও ওকে বিশ্বাস করা চলে না। এজন্য দেখবি, কখনও ওর কথার ফাঁদে ধরা দিস না!"

'না রে না, রেশমা। কথা তো ও সত্যই বলেছিল। ও স্বীকার করেছিল— ও-দুজনের প্রাণ এক দিন··· ।'

এই কথা বলিতেই রেশমা হাসিয়া ফেলিল—'ধূলিয়া তুই স্ত্রী পেয়েছিস, কিন্তু যেমন বোকা ছিলি তেমনি আছিস, বুঝেছিস?' আর ধূলার হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিল—'কি করে সব কথা বলতে হয়, কি করে খেলায় হেরে খেলায় জিততে হয়, একা তো সেই জানে, যে ওতে অভ্যস্ত। তোর মাথায় এ কথা আসবে না।'

ধূলা রেশমাকে ভাল করিয়াই চিনিত। তার বিশ্বাস, এ সব কথায় কাণজীর অপেক্ষা রেশমা দু পা অগ্রসর। এইজন্য রেশমা এভাবে বলায় চিন্তায় পড়িল না।

যেন তাহার কথা শেষ হয় নাই। সেইমতো আলগা ভাবে বলিতে থাকিল—'সরল কথা শুনেই তো এসেছ বন্ধু। কিন্তু একদিন যখন কুটিল কথা শুনবে তখন রেশমাকে মনে পড়বে।'

ধূলারও এ কথা ঠিক মনে হইল। 'নাও, মোড়লের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কাণজী তো স্বীকারই করেছে যে তার মন লেগে গিয়েছিল।' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মোড়লের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মোড়ল ও গ্রামবাসী পাটোয়ারি প্রভৃতি ধূলাকে পুরাপুরি সাহায্য করিবে বলিয়া কথা দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল যে এততেও কিছু হইবে না। আরও বলিল যে—'কাণজী তোকে মারতে এলে মারতে দে। তারপর আমরাও আছি আর ও আছে।'

এইভাবে যে কথা একদিন যুবক-যুবতীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা এখন বৃদ্ধদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কাণজীর কানেও একথা আসিল। তাহার কখনও হাসি পাইত, কখনও মনে দুঃখও হইত। কখনও 'দেখি এরা সব করে কি' ইহা ভাবিয়া চোখ দুইটি লাল হইয়া যাইত, কখনও জীবনের প্রতি বিরক্তি জন্মিত। কখনও মনে ভাবিত, জীবীকে বলি 'চল পালাই।'

এই ভাবিতে ভাবিতে এক মাস কাটিয়া গেল।

আর জীবী? মানুষ মার খাইতে খাইতে পরে পশু হইয়া যায়, নয়তো নির্বিকার হইয়া যায়, এতদিনের মধ্যে জীবী ইহার একটিও হইল না। দিনের বেলা বাড়িতে থাকিলে কোনও দিন মূক পশুর মতো থাকিত কখনও রাত্রে ধূলার সহিত অমানুষের মতো ব্যবহার করিত। কিন্তু বাড়ির বাহিরে সে এখনও হাসিমুখে আসিতে পারিত। যাহারা সহানুভূতি দেখাইতে আসিত, তাহাদের নিকট 'হইতে দাও, ঘর থাকিলে ঝগড়া-ঝাঁটি থাকিবেই' একথা বলিয়া তাহার সম্মুখে গ্রামের উদাহরণ দিয়া বলিত—'ওতো এই রকমই বলে কারও ঘরে কম, কারও ঘরে বেশি।'

এমন করিতে করিতে কাটিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের অলস দিন আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাধারী নিষ্কর্মা লোকেদের খুঁজিয়া বাহির করিতে 'ভমন্তী মা' (এক ধরনের কুলক্ষণা প্রেতিনী) উধড়িয়া গ্রামে দেখা দিল। একটি যুবতী জলের কলসি মাথায় লইয়া কাঁপিতে থাকিল। গহনা মাটিতে পড়িয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল। জল ভরিতে

আসিয়াছে এমন দুই একজন তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল ও গ্রামে পৌঁছাইয়া দিল। 'ক্ষমা কর মা! ক্ষমা কর মাগো!' বলিতে বলিতে মেয়েরা তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছিল।

গাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমিল। মাতা ও ভক্তির উপাসক ঠাকুরডা হাজির হইল। ধূপদীপ দিয়া মাতার সামনে পাগড়ী খুলিয়া প্রশ্ন করিল—'বলুন আমাদের মনিব, আপনি কোন দেবতা? আমাদের গরীবের বাড়ি আপনি সোনার পা রাখিয়াছেন কেন মা?'

অনেকক্ষণ দোলার পর যুবতী উত্তর করিল—'আরে আমি মতিছড়া দেবতা। প্রথমেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা পিছনে পিছনে আসছে। গ্রামে আসন সাজাও, পাখোয়াজ বাজাও, আমাদের খেলতে হবে দু দিন খেলে আমরা নিজেদের পথ ধরব গ্রামে কোন রোগ টোগ থাকে, বা আর কিছু থাকে, তা সে সময় বলবি। আমরা সব দূর করে দেব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা মা। আমাদের কি ভাগ্য, না ডাকতেই না আর্তনাদ করতেই আপনি এসেছেন।' জীবা ভগত নামে একজন ঠাকুরডা বলিয়া উঠিল। আবার নারিকেল ফাটাইয়া কথা দিল 'কাল গাঁয়ের পক্ষ দিক আসন সাজিয়ে পাখোয়াজ বাজাব। আপনার সঙ্গীদের নিশ্চিন্তে নিয়ে আসুন।'

'আচ্ছা রে আচ্ছা।' বলিতে বলিতে মেয়েটি গড়াইতে লাগিল। পরের দিন সকালে 'সুখড়ী' রাঁধিতে ও আলো জ্বালাইবার জন্য গ্রামে ঘি, আটা ইত্যাদি বাহির হইতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপ সাজানো হইল। আর পাখোয়াজ গমকের পূর্বে তো প্রায় কুড়ি জন লোক—বিশেষ করিয়া যুবক ও কিশোর দল—হেলিতে দুলিতে আরম্ভ করিল।

তিন বৎসর পূর্বে যখন মতিছড়া দেবতা আসিয়াছিল তখন গ্রামবাসীরা যতটা ভয় পাইয়াছিল এবার ততটা ভয় পায় নাই।

সে সময়ে কাগজী প্রভৃতি যুবকের স্থানে আধবুড়ো আর তাও বিশেষ করে ঠাকুরডাই এই চৌকি সাজাইয়াছিল আর সব ব্যবস্থা সামলাইয়াছিল। একের পর দুই এমনি করিয়া ছয় সাত ঠাকুরডা আসিয়া পৌঁছিল। রোলী গুলাল আর হলুদের আলপনা দেওয়া হইল। তাহার উপর ঘটি। ঘটির

উপর নারিকেল রাখিয়া ঘটে সুতার হার পরানো হইল। দুইদিকে দুইটা খোলা তলোয়ার রাখা হইল আর এ সকলের সামনে সামনে রাখা হইল অগ্নিকুণ্ড। জীবা ভগত ঠোঁট নাড়িয়া বিড়বিড় করিতে ধুনো ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

দর্শকদের ভিতর এই চৌকির নিকটে বসিয়াছিল পাঁচ সাত জন লোক—তাহাদের দেখিলেই ভয় করে। সকলেরই পরণে একপ্রকার পোষাক্, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর দীর্ঘ কেশের উপর দুই তিন প্যাঁচ পাগড়ি এক-রকমেরই ছিল। এখন তো জীবা ভগত শুধু ধুতিই পরিয়াছিল। তাহার অল্প অল্প নেশাখোর চক্ষু দেখিয়া ভয় করিত।

কিন্তু আসলে গণ্ডগোল তো এই মণ্ডপের বাহিরে—দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া বড মণ্ডপ পর্যন্ত গণ্ডগোল হইতেছিল। দরজার সামনে অন্য ভগতদের সঙ্গে জন পঁচিশেক যুবক বসিয়া বসিয়া পাখোয়াজ ও ঝাঁঝর-মঞ্জীরের শব্দে ঝড় তুলিতেছিল। এক দিকে মোড়ল ও গ্রামের জন পনের কুড়ি লোকের ভিড়, অন্যদিকে মেয়ে ও শিশুদের বাহিনী। সামনে ময়দানে বিশ পঁচিশ জন লোক, তাদের মধ্যে কেহ কেহ হাত নাড়িতে নাড়িতে টলিতেছিল মাতালের মতো তাঁহারা হুস্ হুস্ করিয়া দুলিতেছিল তাহাদের কেহ কেহ জল খাওয়াইতেছিল, কেহ কেহ বা মাটির উপর জল ছিটাইতেছিল।

ইহাতেই একদিকের চিৎকার শোনা যাইতেছিল। একজন লোক লাফাইয়া চার ফুট দূরে গিয়া পড়িল। পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া পডিয়া সোজা ঘেরা জায়গাটার চারদিকে পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ঘুরিতে লাগিল। ও ছিল রেশমা। ঐ ভক্তদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ওর মধ্যে দেবতার ভর হইয়াছে, সে ঐ সমস্ত ফৌজের কোতোয়াল। নিজেকে ঢোলের ঘেরে রাখিয়া অড়হরের দানা ফেলিতে ফেলিতে রেশমা এত জোরে ঘুরিতে লাগিল, যদি কেহ উহার চাপড়ের মধ্যে আসিত তবে অমনি ধূলায় পড়িত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা হইতে থাকিল, তাহার পর রেশমা আর দুইজন বড় ভক্ত চৌকীটা আগে লইয়া গেল। তিনজন এত জোরে দুলিতে লাগিল যে যাহাদের মন দুর্বল তাহাদের খেলা তাকাইয়া দেখিবার সাহসই হইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলিবার পর রেশমা পাখোয়াজ প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিল।

জিজ্ঞাসা করিল—'ওরে, কারও কিছু অভিযোগ আছে?—বল না, যা চাই। ওরে, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করে দেব।'

জীবা ভগত কুণ্ডের মধ্যে এক মুঠো ধুনো ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'তুমি না করলে আর কে করবে মালিক।' দরজার সামনে ঠাসা লোকের ভিড়। কাণজীর মতো যুবকরাও ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

'তবে বল, বলে ফেল! বলে ফেল নিজের দুঃখ!' এই বলিয়া রেশমা আরও জোরে দুলিতে লাগিল। পিছনে থাকিয়া ঐ দুজনেও অনুকরণ করিতে লাগিল—'হাঁ রে, তোর দুঃখ যা আছে তা গান করে বলে ফেল।'

'মা-বাপ! আমাদের দুঃখ কি আর তোমাদের কাছে লুকানো আছে? তুমি তো…'

কিন্তু দেবতা কিছু বিড়বিড় করিয়া বলিল, তাহা শুনিয়া জীবা ভগত চুপ করিয়া গেল।

রেশমা বলিতে লাগিল—'আরে, আমার কাছে কিছু গোপন থাকতে পারে কি? বল তো তোদের গাঁয়ের যা কিছু খারাপ তোর সামনে বলে ফেলি। বলিস তো যারা এই ধরনের কাজ করে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিয়ে দি।'

'মা-বাপ, হতে পারে। মানুষের তো মাথায় কালো চুল, ভুল যদি না করি তবে আর মানুষ কি?' একজন বৃদ্ধ ঠাকুরডা আর একজনকে বলিল।

'কিন্তু একজন সবল আর একজন দুর্বল—সবল যদি দুর্বলকে মেরে ফেলে—তার ইজ্জতের উপর হাত দেয় তবে তা কেমন বিচার!' বলিয়া রেশমা কট্‌মট করিয়া নিজের শরীরকে ডাণ্ডা মারিতে লাগিল।

এ কথা শোনামাত্র কাণজীর কান খাড়া হইল। সে অন্য দিক দিয়া থামে ভর করিয়া ভগত যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার কাছে গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'এ দেবতা তো খুব জবরদস্ত মনে হচ্ছে?'

এতক্ষণ দেবতাকে বলিতে শুনিয়া ভগত তাহাকে চুপ করাইল। দেবতা বলিয়া যাইতেছিল—'ওরে, আমি যা জানি তা তোদের গ্রামবাসীরাও জানে না।' বলিয়া 'হা! হা। হা। হা '…শব্দ করিয়া যন্ত্রণায় কুঁকড়াইয়া গিয়া এমন দুলিতে লাগিল যেন কোনও গুরুতর কষ্ট হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিল 'বল রে ভগত।' জীবা ভগতকে দিয়া বলাইতেছিল—

'বলে ফেল। এমন সময় লম্পটকে দণ্ড দেব, না ক্ষমা করে দেব।'

কাণজীর চক্ষু প্রসারিত হইল। 'এতো বড অদ্ভুত দেবতা মনে হইতেছে।' বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—'ক্ষমা করবে কেন মালিক। সেও মানুষ। পরিচয় তো দাও।'

'ওরে, ওরে, কিন্তু···এতে লাভ হবে না কিছু।' রেশমা আবার জোরে জোরে দুলিতে লাগিল। কোনও পাম্প যেন টানিতেছে উহার মুখ হইতে 'সুড়র···সুড়র' শব্দ হইতেছিল।

কাণজী আগে আসিয়া পড়িয়াছিল। বলিল, 'না, লাভ হবে কেন? একবার সে পাপীর দণ্ড হোক, সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিচয়ও পাওয়া যাবে। আর এমন অন্যায় যারা করে তাদেরও শিক্ষা হবে।'

জীবা ভগত ও মোড়ল প্রভৃতি কাণজীকে চুপ করিতে বলিল। কিন্তু কাণজী এখন চুপ করিবার পাত্র নহে। দেবতাকে দুলিতে দেখিয়া সে আবার বলিল—'যদি তুই সত্যি সত্যি দেবতা হোস, তবে এখন পরীক্ষা দিয়ে ফেল। এই মুহূর্তে সভা দেখুক—এই চৌকীর সামনেই।'

'ভগত। এ লোকটা কে? একে বলে দে যে আমার সঙ্গে টক্কর দেওয়া ঠিক নয়···আজ আমাকে কখিস না। দেবতার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কথা ছেড়ে দে।' আর এই কথা শেষ হইতে না হইতেই রেশমা ভয়ঙ্কর চিৎকার ছাড়িল। পিছন হইতে ঐ দুইজন তাহার স্বরে স্বর মিলাইল। তাহার পা এত জোরে পড়িতেছিল যে যাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের পায়ের নীচে ঝন্‌ঝন্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এমন বোধ হইল। কাহাকেও যেন খাইতেছে এমনভাবে দাঁত কড়কড করিয়া রেশমা গর্জন করিল—'এ লোকটা কে যে দেবতার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস রাখে? আমার সামনে এসে দাঁড়া।···হায়। হায়। কত দেরি আছে রে?'

লোকের হৃৎস্পন্দন যেন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। শিশুরা মায়েব কোলে লুকাইয়া পড়িল। যুবতীবা যেখানে ছিল সেখান হইতে পালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্যই যেন সম্মুখ হইতে পিছনে পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কঠিন হৃদয় ভগতরাও পবস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কাণজীকে অনেক ধরা হইল, অনেক অনেক বোঝান হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে এতখানি তেজ আসিল যেন তাহাকেও বুঝি দেবতা ভর

করিয়াছে। শরীরও মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। শান্ত চক্ষু হইতে যেন স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বলিল—'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, দেবতা! আমিও আজ দেখব, জীবন্ত লোককে তুমি কি করে খাও?'

'ওরে, এখনও বলি। দেবতার সামনে দাঁড়ানোতে কোনও লাভ নাই। ...তোর জন্য আমার করুণা হচ্ছে।' রেশমা একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিল।

কিন্তু কাণজী আজ যেন মরিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে, সে বলিল —'যদি করুণা করাই হয় তবে দুনিয়াতে এমন অনেক লোক আছে যারা তা চাইছে। তোর করুণায় আমার কোনও দরকার নেই। আমি তো এখানে বসে আছি—আমাকে তো আজ তোর পরীক্ষা নিতে হবে।' কাণজী দেবতাকে পাছে আর কিছু বলে তার আগেই তাহার দাদা আসিয়া পড়িল। বাহু ধরিয়া উঠাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—'হতভাগা! বৃথা তর্কাতর্কি করে অন্যকে হায়রান করবার চেষ্টা কেন!' হীরা ও অন্যান্য যুবকেরাও আসিয়া পৌঁছিল।

'তোমরা সব আমাকে ছেড়ে দাও। আজ আমাকে সত্য মিথ্যা ফয়সলা করতে হবে। এই ঠাকুরডায় কোন দেবতা সেঁধিয়েছে, তা আমাকে দেখতে হবে।' কাণজী বলিলেন। কিন্তু এই কথা শেষ হইতে না হইতেই উহাকে ধাক্কা দিয়া দরজা পর্যন্ত আনা হইল। 'কিন্তু তোর পরীক্ষা নিতে হয় তো নিস। এখন তো বাড়ি চল। এখন তো ওরা আরও দুদিন পূজো-পাঠ করবে' হীরা বলিল।

কাণজী শান্ত হইতে গিয়া বলিল—'কিন্তু তুমি আমাকে এখানে কেন টেনে আনলে? ঐ দেবতাকে আমার এই কথা বলতে হবে যে যদি ও সত্যিকারের দেবতা হয় তবে গলায় জলন্ত নিকেল পরিয়ে নিত।'

'হাঁ, হাঁ, কিন্তু এসব সন্ধ্যাবেলায় হবে। এখন তো বাড়ি গিয়ে খাবে চল।' ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে গিয়া ভগতজী বলিলেন। মোড়লও এই কথাই বলিল। আর একের পর এক সকলে বাহিরে আসিল।

যে লোকটি পূজা করিতেছিল এই হৈ-হল্লার মধ্যে সেও শান্ত হইয়া গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জীবা ভগত আর সঙ্গী সাথীরা সকলে খাইতে চলিয়া গেল।

সকলে তো খাইবার জন্য চলিয়া গেল, কিন্তু কেহ পেট ভরিয়া খাইল

কিনা সন্দেহ। যেখানে যাও এই কথা লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। কেহ বলিতেছে—'আজ হয় কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটিবে, নয় তো দেবতা কাণজীকে পাগল করিয়া দিবে।'

এইসব কথা হইতে অজানা লোকেরা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—'কি বলছ, কাণা কি দেবতার সামনে দাঁড়াতে সাহস করেছে? বেকুব কি নিজে নিজে আগুনের মাঝে ঝাঁপ দেবে!' আর অনেকে তো তাহাকে বুঝাইল পর্যন্ত—'কাণা, কেন নিজে নিজে মৃত্যুর গ্রাস হতে যাচ্ছ?' কাণজী হাসিয়া উত্তর করিল—'আমি মৃত্যুর গ্রাস হতে যাচ্ছি না সেই দেবতা তা সন্ধ্যাবেলায় বোঝা যাবে! হয় এই দেবতাকে এই গ্রাম থেকে সমূলে বের করে দেব, নয়তো আমি মরে যাব। কিন্তু আজ তো আমি ছেড়ে কথা বলব না।' আর বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—'শালা চণ্ডী!'

'কিন্তু ওরে, এই যে ছোট বাচ্চারা দুলছে এদের মধ্যে চং কেন হবে? একটু ভাব তো! ঐ মথুরা আর লালা তো তোরই আড্ডার, আর ঐ যে ধুলিয়া নাপিত সে তো গানের সঙ্গে ঘোরাও জানে না! ও কেন দুলছিল? কোনও দেবতার প্রভাব আছে বলেই তো?'

কিন্তু এ সকল কথার জবাব তো কাণজীর নিকটে তৈরী ছিল—'এ শালারা তো পাখোয়াজ ও মঞ্জীরের ধুন শুনে শুনে দুলছে। আমি এইসব ন্যাংটা দেবতার কোনও কিছু বিশ্বাস করি না। হাঁ, তবে যদি জ্বলন্ত নিকেল গলায় দিতে পারে তবে তো বুঝব।'

কাণজীর বৌদিদি তো কাঁদিয়াই ফেলিল। 'তোমার মতো বৈরাগীর আর কি? ওই দেবতা যদি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে আমার বলদ অথবা মোষকে মেরে ফেলবে না হয় আমাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।' কাণজী উত্তর দিল—'কিন্তু তোমার মোষ বা বলদ তো কোনও দোষ করে নি। ওদের কেন মারবে। আমি প্রস্তুত আছি।' কাণজীকে থামাইয়া দিয়া তাহার দাদা বলিল—'না, ভাই না, তোমাকে এমন কিছু করতে হবে না। ওরা চং করলে নিজেদেরই কপাল ভাঙবে। তাতে আমাদের কি? তুই খেয়ে যা। ঐ যে ধানের আঁটি আছে ওগুলি ঝাড়া নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দে। গোরু নিয়ে আমি এখনই তোর পেছনে পেছনে আসছি।'

'এত বেশি ঘাবড়াচ্ছ কেন, দাদা? এ শালা তো আর বাঘ নয়, যে খেয়ে ফেলবে! সত্যি যদি দেবতা হত তো তাহলে তার এত রাগ হত না। তাদের হৃদয় খুব উদার হয়।'

'হৃদয় উদার নয়, এতো ক্ষতি করার কথা। আমরা পাখোয়াজ বাজাতে যাব না, পরীক্ষাও নেব না। তুই খেত বাড়িতে যা।'

আজ প্রথম কাণজী দাদার কথায় রাগ করিল—'তুমি যাই বল আজ আমি পিছন ছাডছি না। এই দেবতার কথা সত্যি, না আমার, প্রমাণ হবে। আমি এ যাচাই করে নেব।'

কাণজী একটুও টলিল না। বাড়ি হইতে উঠিয়া ভগতজীর বাড়িতে গেল। ভগতজী গাঁয়ের লোকদের মন বুঝিতেন। তিনিও পরামর্শ দিলেন—'মরতে দেনা কাণজী। আজ বাদে কাল যদি গায়ে কিছু হয় তো···! আর আমাদের সব বড বড পরিবার। মানুষের যদি কোনও কিছু না হয় তো গাই গোরু মোষের কিছু না কিছু হবে, সে তো ঠিকই আছে। কিন্তু এরা তো দেবতার রাগ হয়েছে মনে করবে, আর অনর্থক নিজেদের বদনাম করবে।'

'কিন্তু ভগতজী! আমাদের উপর বদনাম দেবে কেন? গাঁয়ের লোকদের সামনেই তো এই দেবতা যারা সেজেছে তাঁদের হাতে আগুন ধরিয়ে দেব! সত্যি হলে আগুন ধরে নেবে। এই প্রকার প্রমাণ দেবার পর আমাদের ছেড়ে আর কোনও ডাল ধরে থাকবে কি? ও শালা কি দেবতা না কোনও মুর্খ।'

'বেশ, সে তো ভাল কথা?' একজন যুবক বলিয়া উঠিল—তাহার পর অন্য দুই চার জন যুবকও সায় দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু কাণজী তাহাদের বলিল—'না ভাই, তোমরা যা হবে তা দেখে যাও, মাঝখানে কিছু বোলো না। আমি একা লোক, এজন্য যা ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু তোমাদের তো পরে কাঁদবার লোক আছে।' এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ওদিকে মোড়লদের অঞ্চলেও একথা লইয়া আলোচনা চলিল। সেই ভগত মোড়লের নিকট বলিতেছিল—

'দেবতাকে বিরক্ত করলে গাঁয়ের কিছু ভাল হবে না, মোড়ল। তাই

ছোঁড়াদের কথায় না গিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ ওদের খেলতে দিয়ে সন্ধ্যায় বিদায় করে দাও!'

মোড়ল ও গ্রামের দুই চার জনেরও ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হইল। কাণজীকে ডাকিয়া আনা হইল, কিন্তু সে জবাব দিল, 'আমি ঐ চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছি, যা বলবার ঐখানেই বলতে হবে। আমি কারও পঞ্চায়েত শুনব না।'

মোড়ল হারিয়া ভগতজীর নিকট আসিল। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। নিরাশ এইজন্য যে যদি কাণজী একা হইত, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্মুখে তাহার জিদ বজায় হয়তো রাখিতে পারিত না। কিন্তু এখানেও আট দশজন জমা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আবার ভগতজী আসিয়া জুটিলেন।

হারিয়া গিয়া মোড়ল ভগতজীকে এক দিকে লইয়া গিয়া বুঝাইলেন। তাহার পর ঐসব যুবকদের বাড়িতে বাড়িতে চক্কর লাগাইতে লাগাইতে বলিলেন—'তোমাদের ছেলেরা দেবতাকে অসন্তুষ্ট করবার জন্য দাঁড়িয়েছে; কিন্তু গ্রামে যদি কিছু কাণ্ড হয় তবে তার জন্যে দায়ী হবে তোমরা!' এইরূপ ধমক দিতে দিতে ও ভয় দেখাইতে সে নিজে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিল।

মোড়লের এই কৌশলে খুব কাজ হইল। প্রত্যেক যুবকের বাড়ির লোক, কাহারও কাহারও পুরা পরিবারের লোক ভগতজীর কাছে আসিল। কেহ কেহ ধমক দিয়া কেহ বা বুঝাইয়া সুঝাইয়া ছেলেদের নিজের নিজের বাড়ি লইয়া গেল। আর তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে যাইতে দিল পাকাপাকিভাবে প্রতিজ্ঞা করাইবার পর।

রহিয়া গেল কাণজী। কিন্তু এখন তো তাহার মধ্যে আরও সাহস আসিয়া গেল। যাহারা বুঝাইতেছিল তাহাদের দিকে ফিরিয়া 'তুমিই বা কেন আছ ভগতজী! জেনে শুনে এই সব কথা বলছ?' এই বলিয়া একাকী যুদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগতজীকে বলিল, 'তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো ভগতজী! সেখানে গেলে হয় তোমার কথা বৃথাই যাবে, নয় তো বলার পর মাথায় কলঙ্ক বইতে হবে।' এই কথা বলিয়া 'হীরা গেছ না আছ' বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে তার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল।

'এতো ঠিক কথাই...তুই যা না আগে, পিছনে আমি আসছি' এই কথা

বলিয়া চিন্তায় পড়িয়া ভগতজী তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কাণজীর তো যেন জিত হইবার নয়, কিন্তু ভগতজীর ভয় ছিল এমন লোকেদের যারা নিন্দা করিবে এই বলিয়া যে ভগতজী কাণজীর দ্বারা প্রভাবিত। ইহা ছাড়া ভগতজীর আরও বেশি ভয় ছিল যদি ঐ দেবতা ভক্তদের সঙ্গে মারপিট হয় এবং কথায় কথায় তলোয়ার খাপ হইতে খোলা হয়। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার নজর পড়িল, জীবী ঘর হইতে বাহির হইতেছে। ভগতজী একদম দাঁড়াইয়া পড়িল। থুতু ফেলিবার বাহানায় মণ্ডপের নীচে আসিয়া জীবীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছ না কি?'

'হাঁ' বলিয়া জীবী ঘোমটা আরও একটু নীচে টানিল।

ভগতজীও তাহার আগে আগে চলিতে লাগিল।

'পরে কি হোল ভগত কাকা?' জীবী জিজ্ঞাসা করিল।

'কিসের?' ভগত একটু ধীরে বলিল।

'দেবতার গলায় কি সব শিকল পরানোর কথা ছিল না?'

'আর সকলকে তাদের আত্মীয় স্বজন বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু ঐ জেদীকে কে বোঝাবে। ওকে বোঝাবে এমন বা কে আছে? নাহক সমস্ত গাঁয়ের চক্ষুশূল হয়ে থাকবে। ছাখ, এখনো তো হীরার বাড়িতে মাথা গুঁজে কথা বলছে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ও তো কাউকে মানবার লোক নয়।' এই বলিয়া ভগতজী বলিয়াই ফেলিল—'তুই ওখানে যাস তো ভাল। শোন তো আগে, কি বলে?' এই বলিয়া চুপ করিয়া গিয়া ভগতজী বলিয়াই ফেলিল—'তুই বললে ঠিক হবে। রাজি হয় তো ভাল। তুই বললে নিশ্চয় রাজি হবে আমি জানি।'

জীবী বেচারি দেবতাদের মানিত। তাই কাণজীর সহিত দেখার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়াই সে হীরার বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু সকলের সামনে কি করিয়া বলিবে? এ কথা ভাবিয়া সে হীরার ঘরের পিছন দিকে—পায়ের কাঁটা বাহির করিবার ছলে তাহার হৃদয়ের কাঁটা বাহির করিতে লাগিল।

ততক্ষণেই কাণজীকে বলিতে শুনিল—'তোর আসা হবে না, তা ঠিক আছে হীরা, কিন্তু আমি তো নিশ্চয় যাব।' পরমুহূর্তেই সে দরজার বাহিরে

গিয়া দাঁড়াইল। জীবীকে দেখিয়া একটু সরিয়া গিয়া অগ্রসর হইল। জীবী বলিল—'কোথায় যাও? দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কিছু...' কথা আরম্ভ করিয়া দিল।

'একদিন দেখা হবে...' বলিয়া কাণজী দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইল।

'এতো ঠিক আছে, কিন্তু আজ যদি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শিকল-টিকলের গোলমাল কর তো আমার মাথার দিব্যি রইল, আমার রক্ত খেতে চাও তো তাহলে তুমি গোলমাল করবে।' এই বলিয়া জীবী কাণজীর দিকে এক নজর তাকাইয়া দেখিয়া হীরার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, কাণজীর মনে অবশ্য বিরক্তি ছিল খুব, কিন্তু শিকলের কথা আর উঠাইল না। বরং ইহার পর সে পাখোয়াজ হাতে তুলিয়া লইল। হাতুড়ি দিয়া ঠিক-ঠাক করিয়া খোলা হাতে বাজাইতে লাগিল। কাছাকাছি যে সব যুবক বসিয়াছিল, তাহাদের বলিল—'একটা তান ও একটা রাগে ভজন গাইতে হবে। আবার দেখতে হবে কি, মাতার ভক্ত তিন দিনের মধ্যে রোগশয্যায় পড়ে যায় কিনা।' এই বলিয়া ভজন ধরিবার পূর্বে যাহারা ঢুলিতেছিল তাহাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিল সকালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক সংখ্যা, আর তাহার মধ্যে রেশমাকেও না পাইয়া সে একথা না বলিয়া পারিল না—'কী বড় দেবতাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যে।'

'ওতো গেছে চাষবাড়ি। বাড়িতে কাজ ফেলে এখানে আর সারাদিন থাকে কি করে।' রেশমার জোতদার মনারে বলিল।

প্রায় অর্ধেক লোক হাসিয়া ফেলিল। কাণজী পাখোয়াজে অল্প অল্প আওয়াজ করিতে করিতে বলিল—'এসে থাকলেও এখন শিকল তো পরানো হত না। একটু পরে স্পষ্ট করিয়া বলিল—'ওরে ভাই, কোনও ভয়ে লুকিয়ে থেকো না। শিকল-টিকল কেউ পরাবে না। কাজেই চাও তো ঘণ্টা তুই দোলো।' বলিয়া আশপাশের যুবকদের এক নজর দেখিয়া লইল। একটি ছেলে মঞ্জীরা লইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে বলিল—'রাজা, এখন মঞ্জীরা এই মনারেকে দে, তুই পরে বাজাস।' আবার পাখোয়াজে এক গত ধরিল। কাণজীর হাত চলিতেছিল না পাখোয়াজ চলিতেছিল বলা কঠিন। মধুর কণ্ঠে ভজন উঠিল—

প্রিয় রে। মুরলী বাজো তীক্ষ্ণ স্বরে।

প্রিয় রে! মুরলীতে মন মজেছে, ঘরে রইতে নারি রে।
রইতে পারি না, বলতে পারি না, প্রিয় রে।

কাণজীর কণ্ঠে এমন কিছু মধু ছিল যাহাতে মনকে যাহারা ভাল করিয়া বশে রাখিতে পারে তাহারাও ঝিমাইয়া পড়ে। মৃদঙ্গের ঠেকা তো সোজা হৃদয়ে গিয়া লাগিতেছিল। নাচিবার জন্য পা সুড়সুড় করিতেছিল। ভজন যতই জমিতেছিল গায়কদের মধ্যে ততই নেশা আসিয়া যাইতেছিল। কেহ কেহ তো লাফাইয়া নাচিতেও লাগিল। এক ঘণ্টার মধ্যে দশ জনের বদলে বিশজন নাচিতে লাগিল।

ভজন শেষ হইতেই কাণজী ভগতজীকে বলিল—'বল তো ভগতজী এখানে যারা বসে আছে সকলকে দোলাই!'

'মরুক গে।' ভগতজীর পাশে বসিয়া মোড়ল হাসিয়া বলিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে যাহাই হউক, ভগতজীর এই সাকরেদের নিকট কোনও খাঁটি বিদ্যা আছে। না থাকিলে সে দেবতাদের সামনে এতখানি স্পর্ধা করিবার সাহস পাইত না।

কিন্তু মণ্ডপের ভিতরে বসিয়া জীবা ভগত অন্য সাত আটজন ঠাকুর-ডার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করিতেছিল। মাতাজী ও অন্য দেবতাদের সুনাম নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এইজন্য একজন তো রেশমাকে ডাকিতে ছুটিল। জীবা ভগত ধুনো ছিটাইতে ছিটাইতে গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। বাহির হইতে কথাবার্তা শুনিয়া তাহার কলিজায় আগুন ধরিয়াছিল। ততক্ষণে রেশমা আসিয়া পৌঁছিল। মণ্ডপের পিছন দিয়া ভিতরে গেল। জীবা ভগত তাহাকে বকিতে লাগিল—'বল হারামি, তোর মধ্যে যে খেলছিল সে কি দেবতা?'

একটু এদিক ওদিকের কথা কহিয়া রেশমা বলিল—'আমার মা ছিলেন জীবা কাকা।'

'তবে এনে দে তোর মাকে! আমরাও নিজেদের দেবতাকে স্মরণ করি। এই গাঁয়ের লোকদের দেখিয়ে দেব—দেবতার সঙ্গে টক্কর দেওয়া ছোট ছেলের কর্ম নয়।'

কাণজী অন্য এক ভজন ধরিল যাহা মরা লোককেও বাঁচাইয়া তোলে—

'রাজার শহরে কেটে গেল বীর !
সহায় তুমি, এস রামদে !'

আর যখন এক চরণ ধরিল—

'শ্বেত ঘোড়ায় চড়ে এস পীর রামদে,
ক্ষমা কর রামদে, এস এস।'

তখন তাঁবুর ভিতরে হট্টগোল। পৃথিবী এত জোরে নড়িতেছিল যে মনে হইল ধরণী নিজেও বুঝি এই নৃত্যে যোগ দিয়াছেন।

কাণজীর কাণে কে যেন বলিল—'আজ একটা না একটা ছুতা ধরে ঝগড়া হবেই।' সে সেদিকে বিশেষ মন না দিয়া বাজনা চালু রাখিল। দরজার ভিতরে লোকের ভিড় আবার জমিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন বাহিরে যাহারা নাচিতেছিল তাহাদেরও ভিতরে নবচেতনা আসিয়া গিয়াছে।

তাঁবুর ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল—'কোথায় গেলে হে মোড়ল! এস, পরীক্ষা নেবে যারা, কোথায় গেলে? আমার সামনে এসে পড়!' জীবা ভগত গর্জন করিতেছিল। ভগতজীকে আগে দিয়া মোড়ল কাণজীর কাছে বলিল—'তুই তোর ভজন চালু রাখ না।'

ভিতরে গিয়া দেখে কি, সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা জীবা ভগত আর তাহার পিছনে পিছনে রেশমার সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনজন লোক লম্বা চুল খুলিয়া ধুমধাম লাগাইয়াছে। মুখের 'হাউস-হাউস' শব্দে শান্তভাবে যে সব প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহাদের মধ্যেও যেন কম্পন ধরিয়াছিল।

বাহিরে ভজন গান যাহারা করিতেছিল তাহাদের আওয়াজও কাঁপিতেছিল। কাণজীও কিছু কিছু কাঁপিতেছিল—ভয়ে নয়, রাগে। তাহার মনও ভজন গান হইতে হটিয়া গিয়া ভিতর হইতে যে গর্জন আসিতেছিল তাহার উপর পড়িল। কোনও কোনও বৃদ্ধ বলিতেছিল—'ভাই! এখন পাখোয়াজ বাজানো বন্ধ কর। দেবতা কি বলছে একটু শুনতে দাও!'

'শুনতে হলে ভিতরে যাওনা, পাখোয়াজ কেন বন্ধ করব?' হীরা বলিল।

কিন্তু তখন কাণজীর কানে আওয়াজ আসিল—'না রে মোড়ল! আমি কিছু শুনব না! যা প্রথমে মায়ের ভোগ নিয়ে আয়।...যারে, যারা

আমার পরীক্ষা করবে তাদের ডাক, আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দে!' অন্যেরাও 'হাঁ রে, নিয়ে আয়!' জীবা ভগতের কথা সমর্থন করিল।

মোড়ল বলিয়া যাইতেছিল—'থাক বাবা! ছেলেমানুষ, ভুলে গিয়েছিল! এইটুকু অপরাধ ক্ষম করো দেবতা! তুমি তো...'

ভীষণ আওয়াজ করিয়া জীবা ভগত গর্জিয়া উঠিল—'হাঁ রে...আজ তোর মান থাকবে না, মোড়ল! আমার ভোগ নিয়ে আয়—রেখে দে এখানে! ওর দাঁত গুণতে হবে!' সে করবর কট্ কট্ করিতে করিতে দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল।

সমস্ত লোক কখনও দেবতাদের তাঁবুর দিকে কখনওবা কাণজীর দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। মায়েরা কোলের ছেলেদের দিকে মন দিতেছিল না। সকলের চোখ মুখ হাঁ করিয়াছিল, হৃদয়ের গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

'আমাকে ওর দাঁত গুণতে হবে।' কথাগুলি কানে আসিতেই কাণজী মৃদঙ্গটা এক পাশে রাখিয়া দিল। লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল—'তোর দেবতার নিকুচি করেছে! দেখি কি করে আমার দাঁত গুণতে আসে!' রক্তচক্ষু করিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইল। কাহারও কাহারও মনে হইল কাণজীর উপরও বুঝি দেবতা ভর করিয়াছে। চার পাঁচজন স্ত্রীলোকও বলিয়া উঠিল—'কাণা ভাই! ওকে কেউ ধরে ফেল না।' দেখিতে দেখিতে কাণজীর এক হাত ধরিয়া জীবী জড়াইয়া ধরিল, অন্যদিক হইতে হীরা ও কাণজীর দাদা। কিন্তু কাণজীর এদিকে কোনও জ্ঞান ছিল না। যখনই সে পুরুষের হাত বুঝিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, তখনই স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল। জীবীকে চিনিতে দেরি হইল না। জীবীর মুখ 'হাঁ' হইয়া গিয়াছিল, চোখ দুইটি বড় বড় হইয়া এমন মনে হইতেছিল, বুঝি উহার মধ্য দিয়া এখনই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

'তুই-ই আমার প্রাণ শেষ করতে চাস! আচ্ছা চল, ছেড়ে দে।' কাণজী বলিয়া উঠিল। আর দেবতার প্রতি এক কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইল। হীরা ও কাণজীর দাদা তাহার পিছনে পিছনে ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

জীবীর যখন হুঁশ হইল যে সে কি করিয়াছে তখন তাহার মনে হইল যে মাটি বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশের পথ দিক, তাও ভাল। সে ঘরের দিকে পা বাড়াইল সত্য, কিন্তু তাহার যে অনুভূতি হইল মনে হইল দুনিয়ায় কাহারও সেইরূপ অনুভূতি হয় নাই। পিছনে পিছনে গাঁয়ের লোকের চোখ এমন ভাবে জীবীর প্রতি লাগিয়া রহিল যেন বল্লম হইয়া তাহাকে বেষ্টিত করিয়াছে।

বাহিরে যে সব মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারাও এমনই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যেন সব কিছু শেষ হইয়া গিয়াছে—যাহা হইবার ছিল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মণ্ডপে যে শোরগোল ছিল তাহা আরও বাড়িয়া চলিল। কাণজীর স্থান লইয়াছিল ভগতজী, কিন্তু সে শান্তভাবেই দেবতাকে বলিল—'এখানে ডাকলে কি হবে? তুই তো হাওয়া, যত ইচ্ছা দূর থেকে মন মতো কাজ কর।'

'এ কে?' জীবা ভগত গর্জন করিল—'আনরে, আমার খড়্গটা নিয়ে আয়। আন, একে জব্দ করি।'

ভয় যাহাকে ছোঁয়ও না, এমন যে ভগতজী সে ধীরে ধীরে দুই পা আগাইয়া আসিল। জীবা ভগতের সামনে আসিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল—'জীবা ভগত, দেবতার তো খড়্গের প্রয়োজন হয় না, বুঝে দেখ! খড়্গ তো মানুষে ব্যবহার করে। এজন্য যদি খেলতে আস, তবে চুপচাপ খেলে হাসিখুসিতে নিজের পথ দেখ।' এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—'ওঠ, মোড়ল, দুই ঘন্টা ভজন গান হয় তো গান করে বিদায় কর! দেবতা ও তার কেরামতি তো দেখলাম!' বলিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভগতজীর কথা বলিবার ঢং ও মুখভঙ্গী এমনই ছিল যে শুধু মোড়ল নয়, একপ্রকারের সাহস সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে আসিয়া গিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতেছিল—'ভগতজী কারো বাপেরও পরোয়া করে না! ও কারো পিছনে ছুটাছুটি করবার লোক নয়।'

'উনি তো ধরেছেন এক সৎনাম—ওর ভগবান ভরসা। এসব দেবদেবী ওঁর প্রভুকে কি করতে পারে?'

আবার তৃতীয় একজন বলিতেছিল—'ভাই, কোনও একটা বিদ্যার বল

না হলে কারো সামনে দাঁড়ানো যায় না। ভগতজী কথা বলতেই ও দেবতা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওর জায়গায় কাণজী থাকলে মজা দেখতে।'

তখন একজন সার কথা বলিল—'রোগের মূল কোথায় তা জানা দরকার। এসব লম্বা চওড়া কথা বললে হয় না!'

কিছুক্ষণ মৃদঙ্গ বাজাইয়া দোলাইবার পর গাঁয়ের লোকেরা উঠিল আর পাঁচটা নারিকেল ভাঙিয়া গ্রামের সীমানার উপর রাখিয়া আসিল। সকলের মনে হইতে থাকিল এ বৎসর দেবতাদের আগমনে কোনও লাভ হইল না, প্রস্থানেও কোনও ক্ষতি হইল না।

সকলে সোজাসুজি চলিয়া গেল, তথাপি অনেকের মনে হইল যেন কিছু না কিছু অনিষ্ট হইয়াছে—কাহারও পরীক্ষা অবশ্য হইয়াছে।

চলে গেলেই ভাল

চৈত্রের প্রভাত সূর্য এখনও দোলনায় ঝুলিতেছে বলা যাইতে পারিত, কিন্তু ইহাতেই 'ছেলের পা দোলনায়' প্রবাদের অনুকরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়াইতে শুরু করিয়া দিল। লোকে গবাদি পশু গোয়াল হইতে বাহিরে আনিয়া ঘাসের ছাউনির নীচে বাঁধিয়া দিয়াছিল। যাহাদের ঘরে বেশি লোক তাহাদের জলের কলসী আনা শুরু হইয়াছিল, যে ঘরে দুই একজন লোক তাহাদের ঘরে এখনও ঝাঁট দেওয়া হইতেছিল। যে সব মহিষ দুধ দেয় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিতীয়বার জাব খাইবার জন্য চালের নীচে দাঁড়াইয়া ছিল আর তাহাদের মনিবপত্নী জাব শেষ হইবার পূর্বেই দোহা শেষ করিবার তাড়াতাড়িতে 'ঘরর্ ঘরর্' করিয়া ঝাঁট টানিতেছিল।

কলসী ভরিয়া হীরার বোন নাথী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে জীবীকে দেখিতে পাইল। জোর চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'জীবী বৌদি জল আনতে যাচ্ছ না কি?' জীবীর কথা শোনা গেল না। কিন্তু তাহাকে মাথা নাড়িতে দেখা গেল। 'আচ্ছা তবে চল' বলিয়া নাথী ঘরে গেল এবং কলসী খালি করিয়াই আবার বাহিরে আসিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার ডাকিল—'জীবী বৌদিদি, আর কত দেরি?'

জবাব না দিয়া স্বয়ং জীবীই কলসী লইয়া বাহিরে আসিল। দুইজনে কূয়ার দিকে হাঁটিতে লাগিল।

চোখ নিচু করিয়া চলিতে থাকিলেও জীবী বুঝিতে পারিতেছিল যে, গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোক—কেহ উহার পানে তাকাইয়া, কেহ তাকাইয়া না দেখিয়াও—ঘৃণা বর্ষণ করিতেছিল। মানুষ দূরের কথা, একটা কুকুরের দিকে তাকাইবার সাহসও তাহার ছিল না। গাঁয়ের বাহিরে আসিলে তবে সে খানিকটা শান্তি পাইল। কিন্তু এই পর্যন্ত আসিয়াই সামনে জল লইয়া যাইতে এক স্ত্রীলোককে ব্যঙ্গ হাসি হাসিতে দেখিল। জীবী বুঝিতে পারিল, উহার পিছনে যে জল লইয়া যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে উহারই

বিষয় কিছু বলিয়া থাকিবে। সংকুচিত হইয়া জীবী এইসব লোকদের এড়াইয়া মাথা নীচু করিয়াই চলিয়া গেল।

মজার কথা এই যে, যে সব মেয়ে কাল পর্যন্ত মাথায় ভরা কলসী সত্ত্বেও, জীবীর সঙ্গে একরাশ ভুট্টা পেষার সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া কথা বলিত, তাহাদের মধ্যে আর একজনও উহার দিকে চোখ ফিরাইল না। কালী তো উহার আপন সখীর মতো ছিল। কিন্তু সে-ও আজ দূর হইতে সরিয়া পড়িল। এই দেখিয়া জীবীর মনে বড় আঘাত লাগিল। মনে হইল, বলিয়া ফেলে—'ওরে, আমি তোর বাপমাকে তো মারি নি যে আমাকে এ'ড়িয়ে যাচ্ছিস।' কিন্তু উহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

কিন্তু যদি কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত—'ও গো, এতে কি হয়েছিল? কাণজো চলেছিল মৃত্যুর মুখে, এ দৃশ্য সে সহিতে পারছিল না, তাকে বাঁচাবার জন্য চলেছিল, এতে খারাপটা কি হয়েছে? ও-তো কোন পাপ করেনি যে সকলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলছ?' তবে সমস্ত পরিবেশই বদলাইত। এমন পরিষ্কার করিয়া কথা বলিতে পারিত কালী, কিন্তু সেও যে কেন কিছু বলিতে পারিল না, সে অবশ্য একটা প্রশ্ন।

নাথী আগে আগে চলিতেছিল, সে একটু ধীরে চলিতে লাগিল। একবার চারদিক দেখিয়া লইবার পর হাসিতে চোখ ছলছল করিতেছে, তাহাতে জিজ্ঞাসা ভরিয়া সে প্রশ্ন করিল—'কি বল জীবী বৌদিদি! কাল তোমার হয়েছিল কি? এত লোকের মধ্যে কাণাভাইকে জাপটে ধরলে।'

এত দুঃখের মধ্যেও জীবী হাসিয়া ফেলিল। তির্যক নয়নে নাথীর দিকে দেখিয়া শুধু এইটুকুই বলিল—'এসব কথা বুঝতে তোর দেরি হবে বোন?'

'না, না কিন্তু তুমি একটু ভাবলেও না? আর পাশেই তো দাঁড়িয়ে ছিল ধূলা ভাই।' এই কথা বলিয়া সে জীবীর প্রতি ভর্ৎসনা দৃষ্টিতে চাহিল।

'ভাবলে আর এমন হবে কেন?' নাথার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল—'সত্যি কথা কি, নাথা বোন, তখন আমার কোন হুঁশই ছিল না!

এ সব হয়ে গেলে তারপর আমার জ্ঞান হল।'

কিছুক্ষণ থামিয়া নাথী আবার প্রশ্ন করিল—'ধূলা ভাই তো ঘরের কোণে মারপিট করেছে, নয়?'

'তোমরা কি শোন নি?' বলিয়া জীবী শুষ্কহাসি হাসিতে লাগিল।

'না, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বৌদিদি অনেকক্ষণ জেগে ছিলেন, কিন্তু তিনিও শোনেন নি।'

'মারপিট না হলে শুনবে কি করে!'

'বৌদিদিও তাই বলছিল। তা ধূলা ভাই বা এতক্ষণ না মেরে থাকল কি করে?'

'এ আমি কি করে বোঝাব বোন।' বলিয়া সে একটু থামিল। 'ছুতোরের কাছে ডাণ্ডা তৈরি করিয়ে আনতে সময় লাগবে না?' বলিয়া হাসিতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস লইয়া আবার বলিল—'এও তো হতে পারে যে আর কিছু ভাবছিল?' নাথীর প্রশ্নময় দৃষ্টি দেখিয়া আবার বিড়বিড় করিতে লাগিল—'কিছু একটা হোক।'

'আর কি হবে, ওর মাথা? তোমাকে প্রাণে মেরে দেবে, ব্যস্।' আর জীবীকে তাও 'হতে পারে' বলিতে শুনিয়া নাথী বলিল—'তবে কি ধূলা ভাই তোমার শ্রাদ্ধ দেখতে বেঁচে থাকবে?'

'কেন?' নাথীর জবাব শুনিবার জন্য উহার প্রাণের স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গেল।

'কাল আমার ভাই বলছিল, যদি এবার জীবী বৌদিকে মারপিট করা হয় তবে কাণজীভাই রাগে গমগম করছে এবার ওকে ছাড়বে না।'

জীবীর ইহার চেয়ে ভাল কথা আর কি শোনার ছিল? তখনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস লইয়া বলিল—'আমার জন্য অন্য কেউ এরকম একটা ঝগড়া মাথায় করবে কেন।'

এখন দুইজন জল ভরিয়া চুপ করিয়া ফিরিতেছিল। পৃথক পথ ধরিয়া যাওয়ার সময় নাথী বোন ভাল করিয়া বলিল.

'বৌদি, যদি ও মারপিট কিছু করে, তো আমাকে বলে দিও—কেমন? এবার তো আমার ভাই-ই ওকে সোজা করে দেবে। কাণা ভাইয়ের দরকারই হবে না।'

কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জীবী সরিয়া গেল।

ধূলিয়া যে জীবীকে কেন মারে নাই, এ প্রশ্ন অবশ্য ছিল। কিন্তু সে নাড়ী চঞ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে ইহাই ভাবিতেছিল যে—'এ শালী তো আমার নাক কেটে নিয়েছে—আর তাও সভার মাঝখানে।' আর কোথাও কেহ উহার উপর কোন হাঙ্গামা না করে, এই ভয়ে যে আশপাশের খেতবাড়িতে তামাক খাইতেও যাইতে পারে না।

পরের দিনও সে নিজের খেতবাড়িতে কাটাইল। তৃতীয় রাত্রেও খেত-বাড়িতেই শুইল।

যতক্ষণ না চৈত্র-ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না কিছুটা ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ততক্ষণ ধূলার চক্ষে ঘুম আসিল না। তাহার অস্থির মস্তিষ্কের মধ্যে মাঝে মাঝে এই চিন্তাও আসিতেছিল—'আমাকে উঠতে দাও। রাঁড়কে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলব।' পরমুহূর্তে দেবতাদের পরীক্ষা করিবার জন্য উদ্যত কাণজীর রক্তচক্ষু চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। ধূলা সর্বদা মনে মনে ভাবিত, 'আমারই তো স্ত্রী, আমি ওকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। এর মধ্যে কথা বলার তুই কে?' কিন্তু যখন ইহার পরিণামের দিকে মন যাইত তখন তাহার পা কাঁপিত। অন্যদিকে রাগও খুব হইত। অনেক কিছু ভাবিয়া, জীবীকে দণ্ড দিবার জন্যই ধূলা উঠিল। কাঁথা গুটাইয়া ঝুপড়ির কোণে রাখিল। যদিও নিঃশব্দ পদে চলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ও সাবধানের সঙ্গে অন্য ঝুপড়ি পার হইয়া যাইতে দুই একটা খেত ছাড়াইয়া জলন্ত আগুনের পাশে গেল।

পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগিয়াই থাকুক অথবা ঘুম হইতে জাগিয়াই হউক, অতি শীঘ্র 'কে রে?' বলিতে বলিতে রেশমা উঠিয়া বসিল। ধূলাকে দেখিয়া তাহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল—শালা কিছু উল্টা সোজা করিয়া রাঁড়কে মারিয়া আসে নাই তো? ঝট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি এখন বাড়ি থেকে আসছিস নাকি?'

ঝুপড়ির ভিতরে ঢুকিয়াই ধুলা বলিল—'আস্তে কথা বল।' এ কথা শুনিয়াই রেশমার শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? এখানে আমার কাছে এসেছিস কেন?'

ধূলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। 'কেন? তামাক খেতেও আসব না? খেতবাড়িতে আগুন নিভে গেছে…'

'তবে আজ বুঝি খেতবাড়িতে শুতে এসেছিস্? উত্তরে ধূলাকে 'হাঁ' বলিতে দেখিয়া রেশমা দুই চারিটা গালি দিয়া বলিল—'তবে প্রথমেই বলতে কি হত?' ধূলাকে তামাক সাজিয়া দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল। তাহার বুক ধড়ফড় করিতেছিল, এখনও তাহা শান্ত হয় নাই। খানিকক্ষণ পরে বলিল—'আমার তো ভাবনা হয়েছিল বুঝি কিছু গণ্ডগোল করে এসেছিস।'

আগুন থাকিতে থাকিতেই ধূলা বলিল—'কার সাথে?'

'কার সঙ্গে কি? তোর বউয়ের সঙ্গে? গলা টিপে এসেছিস নাকি?'

ধূলা মুখ হইতে কলিকা সরাইয়া নিল। রেশমার দিকে তাকাইয়া রাগে অস্থির হইয়া বলিল, 'গলা টিপে মারতে পারার সাহস থাকলে আর কি চাই?' উহাকে কথা বলিবার সুযোগ দিয়াই যেন কথার সূত্র ধরিয়া বলিল—'তবে এই মাঝরাতে তোর কাছে আসলাম কেন রেশমা ভাই?'

'আমি জানতাম, ঠাকুর বিনা মতলবে আস নাই। আচ্ছা আমাকে দেতো।' হাঁটুর উপর কনুইয়ে ভর দিয়া সে তামাক খাইতে লাগিল। ধূলার দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু ধূলাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কলিকা সরাইতে হইল—'বল না, এমন কি কাজ?'

ধূলা আবার বাহিরের দিকে তাকাইল। বলিল—'বলছি, কিন্তু একবার তুই কথা দে, রেশমা ভাই! তুই মায়ের পেটের ভাইয়ের কাছেও এ কথা প্রকাশ করবি না।'

'আচ্ছা এই পাথর ছুঁয়ে বলছি।' বলিয়া রেশমা ধূলার ডান হাতের আঙ্গুলে নিজের আঙ্গুল চড়াইয়া দিল, আর ছিলিম মুখে লাগাইবার পূর্বে বলিল—'মাথা উড়ে যাক, তবু তোর কথা বাইরে যেত দেব না।'

'আমার তো তোর উপর এটুকু ভরসা আছে' বলিয়া ধূলা আবার এদিক ওদিক তাকাইল। দেখিতে না দেখিতে রেশমার নিকটে আসিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে কানে কানে বলিতে লাগিল—'ষাঁড়ের উপর তোর মন্ত্র চালাতে হবে।'

রেশমা চমকিয়া উঠিল—'কার উপর? খোদ তোর স্ত্রীর উপর! কি বলছিস্। তোর মাথা খারাপ হয়নি তো?'

ধূলার চেহারা কালো পাথরের মতো মনে হইতেছিল। বলিল, 'তবে তো মাথা খারাপ হবার মতোই কথা রেশমা ভাই!'

'ওরে কিন্তু যদি কাণিয়ার ওপর মন্ত্র চালাবার কথা বলতিস্, তাও একটা কথা ছিল, কিন্তু খোদ তোর স্ত্রীর ওপর?'

'তা ঠিক, কিন্তু ওর তো দেবতার উপর দেবতাও কিছু করতে পারে নি। এ কথা তো কাল দেখে নিয়েছি। এজন্য আমাকে এ স্ত্রীকেই মেরে ফেলতে হবে। আমার ঘরে এমন স্ত্রীর দরকার নেই।'

'আরে এমন হলে ঘাড় ধরে বের করে দে।'

ধূলা, মুখের কাছে লইয়া আসিলেও ছিলিম সরাইয়া বলিল—'যদি ওকে ঘর থেকে বার করি তবে এই ষাঁড়…। কিন্তু তার চেয়ে এটা কি খারাপ? কে মেরেছে তার কি সন্ধান ও থেকে পাওয়া যাবে?'

রেশমার তো একবার মনে হইয়াছিল যে, ধূলাকে লাথি মারিয়া ঝুপড়ি হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য কথা মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু কি করে জানলে যে আমি মন্ত্র চালাতে পারি।'

'একি কোথাও লুকানো থাকে? তুই তো সেদিন আমাকে বলেছিলি। যখন আমি কাণিয়ার ছু মন্তরে ভয় পেয়েছিলাম, তখন তুইতো বলেছিলি 'এমন ছু মন্তর আমার পকেটে আছে।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—'আর আজ তুই বোবা হয়ে আছিস কেন?'

রেশমার বুদ্ধিতে আসিল না এ লোকটাকে পাগল বলিবে না চতুর? তার কথা শুনিয়া হাসিবে না রাগ করিবে? আর খালি গায়ে বসিয়া থাকা ঐ ধূলার ডান হাতের রূপার বালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রেশমা যেন কোন চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল।

শূন্য খেতের উপর ছড়াইয়া থাকা ম্লান জ্যোৎস্না যেন একেবারে উদাস হইয়াছিল। খেতবাড়িতে গমের ভুষির স্তূপের উপরও নিজের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য জ্যোৎস্না পুরোপুরি চমকিয়া উঠিতেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম যেন লম্বা চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া আছে।

পশ্চিমে চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে ও যেন রেশমা ও ধূলিয়ার মধ্যে বোঝাপড়া জানিবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইয় আছে।

রেশমার ঝুপড়ি হইতে অল্প কিছু দূরে ছিল কাণজীর ঝুপড়ি। আজও

সে কাল রাত্রির মতো জাগিয়াই ছিল। প্রতিক্ষণ মনে হইতেছিল জীবীর পিঠে যেন লাঠির বাড়ি পড়িতেছে। দুই দিন হইল সে ধূলার ঘরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া আছে। আজও তাহার মনে হইতেছিল—'এখন ধূলিয়া আসিয়া বসিবে, তখনই জীবীর চিৎকার শোনা যাইবে।' একবার তো জীবীর চিৎকার বলিয়া ভুল করিয়া সে তাহার লাঠিও সামলাইয়া ধরিল। পরের বার চিৎকার শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়াছে. কিন্তু প্রথমবারের মতো গভীর শান্ত পরিবেশ দেখিয়া লাঠি ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল। নিজের এই মূর্খতায় সে বিরক্ত হইয়া গেল—'যদি মারিয়াও ফেলে তবে তোর তাতে কি? তোর আর ওর সম্বন্ধ কি যে তুই ওর পক্ষ গ্রহণ করিবার জন্য দৌড়াইয়া তৈরী হইতেছিস্?' অন্যদিকে তাহার মন পাহাড়ে চড়িয়া যেন ডাকিতেছিল,—'না, না, আন্তরিক সম্বন্ধ তো ওর আর আমার। ধূলিয়ার তো কিছুই নাই। ওতো কেবল ওর দেহেরই মালিক। কিন্তু ওর প্রাণ তো…'কিন্তু এই চিন্তায়ও কাণজী ক্লান্তিবোধ করিল। একটা দীর্ঘশ্বাস লইয়া বলিল—'না, না, কাণা, এই আপন পর করার মানে কিছু নেই। দুনিয়া তো তোকেই মূর্খ বলবে।' তাহার ব্যবহারিক বুদ্ধি তাহাকে বুঝাইল, সে যদি গ্রাম ছাড়িয়া—বেশি নয়, অন্তত কয়েক দিনের জন্য, অন্য কোন জায়গায় চলিয়া যায়। সে স্থিরও করিয়া ফেলিল।

পরের দিন তাহার এই সংকল্পের কথা সে হীরাকেও বলিয়া ফেলিল—'হীরা ভাবছি, এটাতো বেকার সময়—গরম কাল, দুমাসের জন্যে কোথাও চাকরি করে আসি?'

'কথা তো ঠিক কিন্তু তোর চাকরি জুটবে কি করে? কোথাও কি কোন খোঁজ পেয়েছিস্?' হীরা জিজ্ঞাসা করিল।

'খোঁজ তো নেই, কিন্তু আমাদের জাতের সেই কুবের ভাই আছে না? তার কাছে যাব। যেখানে হোক লাগিয়ে দেবে। আর নিজের গাঁয়ের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো তো সেখানেই আছে।' এই সঙ্গে হাসিতে হাসিতে এ কথাও বলিল—'আহা-হা, এত লোক যায়, তাদের চাকরি মিলে যায়, আর আমার জুটবে না?'

হীরা ভাবিল চাকরি নাই মিলুক, এই রকম অল্প সময়ের জন্য কাণজী যদি দূরে যায় তাহাও ভাল, আর উভয়ের মধ্যে এই যে বিয়োগ ব্যথা তাহার

শোকে দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে বলিল—'হাঁ, হাঁ খুব ভাল। দু মাসের জন্য চলে যা।'

তাহার পর বড ভাইয়ের সামনেও এই সব কথা বলিয়া জানাইল—'চারটে পয়সা যদি পাওয়া যায় তবে দেওয়ালী পর্যন্ত শেঠ-বেনিয়াকে টাকার ব্যাপারে অপেক্ষা করতে বলতে পারি।'

পয়সার কথা ওঠা মাত্র বৌদিদি চট করিয় রাজি হইলেন, কিন্তু দাদার কাছে ইহা ঠিক হইতেছে মনে হইল না। ঘরের মজুরি হইতে বিদেশে মজুরি কিছু এমন কঠিন নয়, কিন্তু নিজের বাড়িতে ছায়ায় ছায়ায় কাজ করা, তাহার চিন্তা হইল—'যাই বল। বিদেশ তো!'

দাদার শরীর ছিল দুর্বল, মনও দুর্বল কাণজীকে 'হাঁ' তো বলিয়া দিল. কিন্তু টপ্ টপ্ করিয়া চোখের জল পাড়তে লাগিল। সেদিন জীবীকে লইয়া কথাবর্তার পর কাণজীর প্রতি তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছিল। কাণজীকে ধমক দিয়াছিলেন খুব। কিন্তু আজতো পস্তাইতেছিলেন। তাহার মনে মনে সন্দেহ হইতেছিল, যে তাহার ঝগডার জন্যই বুঝি কাণজী অভিমান করিযা চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই আমার ওপর অভিমান করে চলে যাচ্ছিস্ না তো, কাণা?'

কাণজীর গলার স্বরও ক্ষীণ হইয়া আসিল। 'না দাদা, তোমার উপর অভিমান করব কেন? আমি ভাবছিলাম, অবসরের সময়, দু-চার পয়সা পেলে তো ভালই হয়। অন্তত নতুন ধরনের শিক্ষা তো হবেই দাদা?' বলিয়া কাণজী হাসিতে চেষ্টা করিল।

ইহার পরও দাদা কিছু কিছু তর্ক উঠাইল। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে তাহার মনে হইতেছিল যে, ইহাতে কাণজীর মনে কষ্ট হইবে। যখন উহার যাওয়ার জন্যে পুরাপুরি মন হইয়াছে তখন চলিয়া যাওয়াই ভাল।

ইহা মনে করিয়া বলিল—'কিন্তু তুই তো আর আজই যাচ্ছিস্ না?'

'আজ তো নয়, কিন্তু কাল কাপড চোপড ধুয়ে পরশু চলে যাব। এমনি 'যাই যাই' করে কেন দিনগুলো নষ্ট করি।'

'আচ্ছা' বলিয়া বড় ভাই চুপ করিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার মনের সন্দেহ এখনও দূর হয় নাই। মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, চাকুরিতে সে যত রোজগার করিবে তাহা তো গাড়ি জুতিয়াই উঠাইয়া লইতে পারিবে।

প্রতি বৎসর এই কাজই তো করে! এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে শেষে তিনি ভগতজীর সঙ্গে দেখা করিবেন ভাবিলেন।

ভগতজীর সঙ্গে ত কাণজী এই কথাই ব'লতেছিল, কিন্তু বুদ্ধিমান ভগতজীর পক্ষে এই ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় নাই। কাণজীর সিদ্ধান্তে তিনি খুশি হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কারণ তাহাকে দুঃখিত করিয়াছিল। কর্মফল ত্যাগ করিয়া শুধু কর্মে বিশ্বাসী ভগতজীর মনে হয় নাই যে কাণজী যাহা করিতেছে তাহা ঠিক না ভুল। এ বিষয়ে বেশি চিন্তা ত তিনি করেন নাই। 'দেখ কি হয়' বলিয়া উহা ভবিষ্যতের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরোক্ষভাবে কাণজীকে সাহসও দিয়া ব'লযাছিলেন—'দুঃখ যতই হোক, তা ভুলে যাওয়া খাঁটি মানুষের লক্ষণ। দুঃখই তো মানুষকে গড়ে তোলে। এতে তুই শিক্ষারও কিছু পাবি।'

কাণজীর বড ভাইয়ের কাছেও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। 'ভালই যাচ্ছে তো। পয়সা না থাকলেও অন্তত দেখাশোনা অভিজ্ঞতা তো হবে।'

'সে কথা অস্বীকার করবে কে, ভগতজী। কি ও যাচ্ছে কেন? আমি তো ভাবছি সে দিনের...' আর ধূলার ঘরের দিকে দেখাইয়া বলিলেন—'ঐ কথার জন্য তো যাচ্ছে না?'

'আরে না, না।' ভগতজী হাসিয়া বলিলেন, 'এতে কি হয়েছে? আর যদি লোক লজ্জায় যেতে হয় তবে তো ওকেই (জীবীকেই) যেতে হয়। ওতে কাণার কি? কেউ তো ওকে বলতে যায় নি যে তুই আমাকে আটকাতে আয়।' এই কথা বলিয়া বড ভাইকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভগতজী আবার বলিতে লাগিলেন—'না, না, কাণজী আর ওর মধ্যে এমন কি আছে যে...আর ঐ স্ত্রীলোকটার মনেও এমন কিছু পাপ নেই। হাঁ, প্রথম প্রথম ওকে এখানে আনবার সময় কাণজীর হাত ছিল, এজন্যে এক প্রকার মোহ অবশ্য আছে। ও বেচারির বাপের বাড়ির রাস্তা তো বন্ধ; এ জন্য বাপের বাড়ি কি মামার বাড়ি, যা কিছু মনে কর, এক তোমার বাড়ি কি এদিকে হীরার বাড়ি—এ দু ঘরই তো মাত্র আছে?'

'হাঁ, হাঁ, অবশ্য, নেই কেন?' বলিয়া জীবীকে সেদিন যে সব গালি সে দিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িল তাহাতে বড ভাইয়ের মুখ মলিন হইল।

পস্তাইতে পস্তাইতে বলিল—'সে দিন কি বুঝেছিলাম জানি না। বেচারিকে সে দিন বিনা কারণে গালি দিয়েছিলাম। তুমি ওকে বলে দিও আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা করতে।' আবার বলিল—'ঠিক তো! ও বেচারির কে আছে?'

ভগতজী তখন মুগ্ধভাবে হাসিতে লাগিলেন যেন এই ভোলা মানুষটির উপর দিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেছেন।

বড়ভাই দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল—'তবে কাণজার যাওয়ায় আর কোন বাধা নেই তো ভগতজী? তবে চলে যাওয়াই ভাল। তোমার কথাই ঠিক। আর যদি কিছু নাই হয় তবু এই বাহানায় শহরে বেড়িয়ে আসতে পারবে। বাড়িতে থেকেই বা এই অবসর দিনে কি এমন দৌলত রোজগার করত? ভালই, চলে যাক।'—এইভাবে বিড় বিড় করিতে করিতে ঘরের দিকে ফিরিলেন।

লজ্জা নিবারণ

পূর্ণিমার চাঁদের রাত। ভগতজী, হীরা ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে শেষ কথা বলিয়া কাণজী আজ অর্ধরাত্রে ঝুপড়িতে আসিল। খেতবাড়িতে কিছু ছিলই না। গমের রাশিও আজ বাড়িতে লইয়া গিয়াছিল। তবে আবার ঘরে না শুইয়া এই ঝুপড়িতে আসিল কেন? কিন্তু ইহার উত্তর তো কাণজী নিজেও জানিত না। বড ভাই তো ঝুপড়ি হইতে কাঁথা কাপড় আনিয়া বারান্দায় শুইয়া থাকিতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে মানা করিয়া দিল। কারণ এই আট মাস যে কাণজী খেতে শুইয়া কাটাইল তাহার পক্ষে ঘরের ভিতর শোওয়া কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হইতেছিল। কখনও চারদিকে দূরে দূরে পাহাড়ে প্রসারিত জ্যোৎস্না দেখা, কখনও অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশ নিরীক্ষণ করা, কখনও আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে একাকী দৃষ্টি ফিরাইয়া এক খেত হইতে অন্য খেতে তাকাইয়া মেঘের গর্জন ও গুঞ্জন, বর্ণবৈচিত্র্যে আনন্দ লাভ করা! এছাড়া পতনশীল তারা, আবার প্যাঁচার ঘু-ঘু, সম্মুখের পর্বতের অধিবাসী বনরাজের সভা, আর এই ধরনের বহু বৈচিত্র্যের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ কাণজীর ঘরের সম্মুখে নিদ্রা আসিবে কি প্রকারে? গ্রামে একে তো গানের মনই হয় না, আর যদি গায়ক হয়ও তবে গায়ক হয় অতি অল্প লোকেই। কাণজীকে কবি বলিতে না পার, কিন্তু তাহার হৃদয় তো কবির হৃদয় বলিতেই হইবে। শরীরের সঙ্গে রক্তের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ নির্জন বাতাবরণে স্পন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে কবি হৃদয়ের, ইহাতে আর আশ্চর্য কি আছে?

কিন্তু আজ কাণজীকে আকাশ শিখরের নীচে দাঁড়াইয়া চন্দ্র ডাকিতেছে না, জ্যোৎস্না হইতে হাসিয়া হাসিয়া খেতও ডাকিতেছে না। মহল হইতেও কিছু অধিক রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান কুটিরের মোহও আজ তাহার ছিল না। আজ তো এই সকলকে শেষ নমস্কার করিতে আসিয়াছিল—কিছুক্ষণ একা থাকার জন্য।

কুটিরে আসিয়া কাণজী তাহার পাগড়ী খুলিয়া একদিকে রাখিয়া দিল,

বিছানা দরজা পর্যন্ত টানিয়া লইল আর কাঁথা ঝাড়িয়া পাগড়ীটিকে তাকিয়ার মতো লাগাইয়া এক ছিলিম তামাক ভরিয়া শান্তিতে বসিল।

কাল তো যাইতেই হইবে।

এতদিন চাকরিকে অন্যের তাঁবেদারি বলিয়া তিরস্কার করিয়া আসিয়াছে, চাকুরি করা লোকদের অনেকবার বলিয়া আসিয়াছে—তোমরা শহরের লোক—গাঁয়ের কি জান? এখানে তো খোলা জায়গায় এই ফুর্তি করিয়া বেড়াইতে।

আজ তাহাকে 'এই ফুর্তি করিয়া বেড়ানো' ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই কারণে তাহার বিশেষ কষ্ট ছিল না। ইহার চেয়ে অনেক গুণ দুঃখ ছিল জীবীর জন্য। 'এই বেচারি শুধু আমারই মনের টানের জন্য এখানে আসিয়াছিল আর আমিই উহাকে ছাড়িয়া যাইতেছি।' 'ইহার আত্মা কি বলিবে?' এই চিন্তা মনে উঠিবামাত্র সে ছিলিম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মুখ দিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস লইল। নাক দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল—'এমন হবে, কে জানত!' ঝোপড়ির আগুনের পোড়া ঘুঁটের ধোঁয়ার একটা সরু রেখা আকাশের দিকে উঠিতেছিল। চন্দ্র যেন আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে'ছল। রোদনের পরে সে দুবলবোধ করিতেছিল। সে তামাকের ছিলিম উঠাইয়া লইয়া তামাক ভারতে ভরিতে নিজের মনে কথা বলিতে লাগিল—'সত্যি কথা, এ সব মায়া! কিন্তু গীতার মধ্যে যে মায়া শব্দ আছে তাহার অর্থ তো প্রেম?' ভালবাসার এই নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহার হাসি পাইল। তাহার পর মনে মনে বলিতে লাগিল—'ভালবাসা নিয়েই তো এই সব কাণ্ড।'

যান্ত্রিকভাবে তামাক খাইল। তথাপি তাহার হৃদয়ের চঞ্চলতা স্থির হইল না। যেন তাহার প্রতি অঙ্গে ব্যথা। শুইলে বা বসিলেও একই অবস্থা। তখনই কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়ে আর তাহার প্রিয় চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া দেখে। ইহাও মনে হইল কান্নার মতো লাগিবে। কাণজী কান্নার বদলে গান গাওয়া আরম্ভ করিল।

পাগল চন্দ্রমা, কাঁদিস কেন?
কেন দিগন্ত ভরেছে নয়ন?

ধরণীমাতা কেন শোকে আচ্ছন্ন—
হৃদয় তোমার কেন অচেতন ?

কিন্তু এই দোহার জবাব কাণজী নিজেই দিল—

নয়রে নয়, কেহ কাঁদে না চন্দ্রমা—
গভীর নিদ্রা সীমান্তে করে বিরাজ।
গভীর নিদ্রায় শুয়ে ধরণী মাতা,
(এ যে) তোরই বুক আঁকুপাঁকু করে।

ইহার পর কাণজী কিছুটা থামিল বটে, কিন্তু তখনই উহার হৃদয় মথিত করিয়া ভাব এমন বহিতে লাগিল যেন সোজা পথ ধরিতে পারিয়াছে। এরূপ দুর্বল হৃদয়ের জন্য ভগবানের লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও একটা ভুল খুঁজিয়া বাহির করিল—

উন্নত আকাশ খুব করেছ নির্মাণ।
প্রতিদিন নব চন্দ্র হইয়ে উদয়
সারা রাজ্যে গগনপ্রদীপ জ্বলে,
ধরিত্রীর জন্যে আমার গর্ব বোধ হয়।
মানুষকে সাজায়েছ করিয়া যতন
নিজের কলা দিয়া কলসী সমান,
(কিন্তু) কেন রে দিয়েছ তাকে এমন কোমলতা
ভুল করেছ ভুল করেছ ওহে ভগবান্।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে ও হস্তভঙ্গী করিতে করিতে কাণজী শেষ পঙ্‌ক্তি দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিল—

ভুল করেছ ভুল করেছ ওহে ভগবান।

আজ যদি ভগবান ও কাণজীর মধ্যে দেখা হইত তাহা হইলেও অনেকবার ভগতজীর সঙ্গে বিচার বিতর্ক হইত, এবং সে সর্বদাই প্রশ্ন করিত—'ওহে ভগবান্, আমি তো এত রৌদ্রে মজুরী করেও খিদেতে মরি আর এই ধনী ব্যক্তি ছায়ায় বসে বসে মজা করে! এর কি কোন মানে হয়!' কিন্তু ভগবানকে সে এরূপ প্রশ্ন করিত না। ভগবানের সহিত দেখা হইলে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত—

'জন্ম দিয়েছ প্রভু ভালই করেছ

ভালোই করেছ, অন্নজল দিয়েছ,
কিন্তু তবু বলি কি দরকার ছিল ভালবাসা দেবার
ওরে মূর্খ কাঁচা সুতায় বেঁধেছ পরাণ ॥

একটা দীর্ঘশ্বাস লইয়া কাণজী বলিল—'কোথাও প্রেম থেকে পৃথক রাখ, অন্যত্র ভালবাসার কষ্টকর জল পান করিয়ে হৃদয়কে চুড়ির মতো ভঙ্গুর করে ফেল!' আর একটু থামিয়া 'হবে তোর গোলমাল তুই-ই জানিস রাম!' বলিয়া হাসিল। কিন্তু সে হাসি একেবারেই কাষ্ঠ হাসি! অনেকক্ষণ ধরিয়া এমন করিয়া চাঁদের প্রতি তাকাইয়া রহিল যেন সে বিদায় লইতেছে। বিছানায় পড়িয়া লম্বা হইয়া যেন ভাবিতে লাগিল—'জানি না আবার কবে এই দেশে ফিরব।'

একাকী পথ পার হইতে হইতে চন্দ্রমা পশ্চিমের সীমাভূমিতে পৌঁছাইয়া গেল। ধরণী এমনই শান্ত ছিল যেন শেষ নিদ্রায় শয়ান। নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া মোরগ ডাকার এখনও দেরি আছে বলিয়া যেন আবার শুইয়া পড়িল। কাণজীর বন্ধ চক্ষু দেখিয়া মনে হইতেছিল, সেও বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহার তখন তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। কখনও সে নাগরদোলায় ঘুরিতে দেখিতেছিল, কখনও বা নিজেকে দেখিতেছিল আম গাছের নীচে বসিয়া আছে! কিন্তু যেখানেই যায় জীবীকেই দেখে। সে যেন তাহার আগে আগে চলিয়াছে।

হঠাৎ পূর্বদিকের গ্রাম হইতে এক চিৎকার শোনা গেল—'মেরে ফেলেছে রে! ঐ যে···চলে যাচ্ছে! চো—র, চোর, ধর, ধর!'

কাণজী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। ঝুপড়িতে লাগানো বাঁশ টানিয়া লইয়া যে দিক হইতে চিৎকার আসিতেছিল সেই দিকে—ধূলার ঘরের দিকে—চার দিকে চোখ কান খুলিয়া রাখিয়া তীর বেগে ছুটিল। ধূলার ঘরের কাছে যে তেঁতুল গাছ তাহার নীচে লুকাইয়া পাহারা দিয়া আর চার পাশের বাড়িগুলির দিকে নজর রাখিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে পিছন হইতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, মোড়ল ও আর একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইয়া আসিতেছিল কাণজীর উপর নজর পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিল—'কে রে?' আর, 'কোথাও যেন না পালায়'—বলিয়া সতর্ক হইয়া ভয়ে ভয়ে কাণজীর দিকে অগ্রসর হইল।

'মোড়ল! এ যে আমি। ভাবলাম, এখানেই দাঁড়াই। যদি কেউ আসে তো—'

'আচ্ছা,' বলিয়া মোড়ল সঙ্গীর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইল, পুনরায় যেন কোন কিছু চিন্তা না করিয়াই এই পাড়ার দিকে ফিরিয়া বলিল— 'কিন্তু এই চিৎকার করলে কে?'

পিছন পিছন চলিতে কাণজী বলিল—'শব্দ শুনে তো মনে হয়, রেশমাই হবে।'

ধুলার ঘরে শোরগোল হইতেছে শুনিয়াই কাণজীর মাথায় আগুন লাগিয়া গেল। মুহূর্তে কত চিন্তা মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়াই নানী বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল—'এসব কি, নানী কাকী?'

'দেখ তো ভাই! অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুজন বসে বসে কথা বলছিলাম তারপর মনে নেই—কে এল কোন্ জন্মের শত্রু...'

কাণজীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম। কথাব মাঝখানেই প্রশ্ন কবিল—'কিন্তু এ জায়গায় এসেই মরল, না...'

হায়! হায়! এখানেই। ওর খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ— রক্তগঙ্গা বইছে...

কাণজীর রাগের সীমা রহিল না।—'তবে তোমরা ওকে এই ঘরের মধ্যে আগলে কেন?' কাণজীর এই বাগত স্বরে গাঁয়ের দুচারজন এ কথায় মন দিল। একজন ইহাও বলিল—'আরে ভাই, ঘরে নিয়ে আসায় ক্ষতিটা কি হোল? বৈঠকে ভালোমন্দ কারও নজরে পড়ত, তাই আমরা একে ঘরে আনলাম। এ নিয়ে এত রাগ কেন?'

'তাড়াতাড়ি মারার জন্য কি? এখন যদি সরকার জিজ্ঞাসা করে তবে জবাব দিও। এখানে আনলে তো ওর ঘরেই...'

'কাছেই ছিল বলে ওকে তাড়াতাড়ি এই ওব ঘরেই।'

অন্য একজন বলিল—'আর যদি নানী কাকী মানা করে দিত তা হলে দরজা খুলিয়ে বুড়োর কাছে নিয়ে যেতাম।' আর ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু এতে এত বেশি গরম হচ্ছে কেন?'

কাণজীর জিভে আর কি কি কথা আসিতেছিল কে জানে, কিন্তু এই লোকটি পয়সাওয়ালা আর প্রতিষ্ঠাবানও ছিল এজন্য এইটুকুই বলিল—

'তবে এ সমস্ত কথা দারোগাকে জানাতে হবে।'

বুড়ি কান্নামিশ্রিত স্বরে বলিল—'হঁা ভাই, আমি কি জানতাম যে এমনটা হবে? দুঃখ তো এই যে ধূলিয়াও ঘরে নেই।' বলিতে বলিতে সে মোড়লের সন্ধানে এদিক হইতে ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মোড়ল দারোগার সন্ধানে বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া কাণজীর নিকট আসিল। ঘাবড়াইয়া বলিল—'কি কাণ, মরুকগে, যা কিছু হবার ছিল তা তো হোল, ওতো আমি কিছুটা ছাই ঢেলে চাপা দিয়ে দেব। কিন্তু একে এখন মনারের ঘরে নিয়ে যাও!'

'যা হবার ছিল হয়ে গেল, এখন আর কি' বলিতে বলিতে কাণজী বলিয়া ফেলিল 'এতে কিছু খারাপ নেই। এরা তো সব সাক্ষী আছে না? এখানেই থাকুক না!' রেশমা নীচে শোওয়া ছিল। কাণজী এখন তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

রেশমার নাক দিয়ে রক্ত বহিতেছিল। কাণজী বলিয়া উঠিল, 'ওহে তোমরা সকলে দেখ কি? একটু তুলো নিয়ে এস না, পুড়িয়ে ক্ষতে লাগিয়ে দাও।' দুই চারজন যেন কাণজীর কথা লইয়া আলোচনা করার ভাব দেখাইল। দুই চারজন কাণজীর কথা লইয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিল।' 'হঁা ভাই! কেউ তুলো নিয়ে এসো ত।' কিন্তু সত্যি কথা বলিতে কি কিছুই বোঝা যাইতেছিল না। কাণজী কাছে যে বুড়ি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিল— নানী কাকী। একটু তুলা নিয়ে এস না!'

অন্য দিকে মোড়ল থানায় খবর দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। সেখান হইতে ফিরিতেছিল এমন সময় তাহার খুড়তুত ভাই ভীমা আসিয়া তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। মোড়ল কিছু চমকিয়া উঠিল। ভাইয়ের পিছনে চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—'এ চৌকিদার কোথায় মরে আছে। থানায় খবর দিতে বলেছিলাম, কিন্তু এখন নিশ্চয় তামাক খেতে বসে গেছে।'

খেতবাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভগতজী দুই ভাইকে নিজের ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে আশঙ্কা হইতেই একবার ভাবিলেন ফিরিয়া যাই—লুকাইয়া শুনিবার লোভও হইল কিন্তু পরক্ষণেই যেন কিছু দেখেনই নাই, এরূপ ভাবে চোখ নীচু করিয়া চলিতে চলিতে কাশিলেন।

মোড়লকে তাড়াতাড়ি বলিতে শুনিলেন—'তুমি যাও না ভাই! এই দুই জনকেই থানায় পাঠিয়ে দাও! শালা, এটা কি অদ্ভুত কথা ভগতজী! এত বয়স হয়ে গেল কই এমন কখনও শুনিনি। তুমি একটু মলম দাও না! আমি ঐ চৌকিদারদের সঙ্গে দেখা করে আসি।' এই বলিয়া গাঁয়ের দিকে চলিতে চলিতে বলিল—'এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনো দেখিনি।'

মলম-লাগানো ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে বাহিরে আসিয়া ভগতজী কাণজীকে বলিল—'এই ঘরে যে নিয়ে এসেছ তা কোনও মতেই ঠিক হয় নি. কাণজী!'

ভগতজীর ঘরের দিকে চলিতে চলিতে কাণজীকে এই কাঁদুনিই গাহিল। দীর্ঘশ্বাস লইয়া বলিল—'সাক্ষী আছে বলে সেজন্য চিন্তা নেই, কিন্তু তা-ও যারা জানে না তাদের মনে তো সন্দেহ থেকেই যাবে!'

দারোগা'র পথ দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক নিজের নিজের রুচিমতো দলে দলে ভাগ হইয়া নানা প্রকার তর্ক করিতেছিল। ভগতজীর বারান্দায়ও ভিড় জমিয়াছিল। যদি ভগতজী, কাণজী ও হীরা এই তিনজনই থাকিত, তাহা হইলেও নিজেরা তর্ক চালাইত। এরা থাকা সত্ত্বেও এক কোণে গিয়া ফিস্ ফিস করা ঠিক হইবে না মনে করিয়া এরা এই সময়ে নিজের মস্তিষ্কেই নানাপ্রকার অনুমানে যোগ দিতেছিল।

ভোর হইতেই গাঁয়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। দারোগা, প্রধান আর দুই তিনজন সিপাহী দেখিয়াই গ্রামবাসীদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা তো বলিতেছিল—'যে নিস্‌পিটার এসেছে জানি না সে কতজনকে মেরে গুঁড়ো করবে।' প্রত্যেকবার তো এক এক জনকে জুলুম করিতে গিয়া চার পাঁচ জনকে জড়াইয়া ফেলে। অবশেষে একজন তো দূরের কেউই ধরা পড়িত না।

খাটিয়াতে রেশমা শুইয়া, তাহার বিবৃতি লওয়া হইল। রেশমাকে নানাপ্রকারে প্রশ্ন করা হইল, সবগুলির উত্তরের সারমর্ম হইল—'আমার পড়শী ধুলা অন্য গ্রামে তার যজমানদের ক্ষৌরকর্ম করতে গিয়েছিল। আমাকে বলেছিল যে রাত্রে সেখানেই থাকবে। বুড়ির ঘুমের তো কোনও সীমা নেই, তাই আমাকে তাগিদ করেছিল যে চালের উপর মকার ভুট্টা আছে, যেন একটু দেখা-শোনা করি। এইজন্য আমি দুটো বারান্দার মাঝে

আমার খাটিয়াটা রেখেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কে যেন আমার মাথায় আঘাত করল। কিসের আঘাত, বুঝি নি। যে আঘাত করল তাকে একটুও চিনতে পারি নি। তবে সে ছিল লম্বা, শরীরের গঠন ভাল। পরণে কি ছিল তাও ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু পুরো কাপড় পরণে ছিল, এ আমার কিছু কিছু মনে আছে। চালের দিকে নুইয়ে সে সোজা খেতের দিকে চলে গেল। সে পালিয়ে যাওয়ার পরে আমার চিৎকার করার হুঁশ হল। তারপর লোকজন এসে গেল।' ইত্যাদি।

এই বিবৃতি লওয়ার পর দারোগা রেশমাকে ভাল করিয়া তল্লাসি করিলেন। আরও কিছু প্রশ্ন উঠিল, কিন্তু ইহাতেই মোড়ল ক্ষত স্থানের অবস্থা খারাপ হইতেছে ভান করিয়া সেই অজুহাতে কিছু বলিল। দারোগা খাট তৈয়ার করাইলেন।

আটজন যুবকও বাছা হইল। তাহাদের মধ্যে কাণজী, হীরা, মনারে প্রভৃতিও ছিল। ইহাদের মধ্যে চারজন রেশমার খাট কাঁধে করিয়া পনের ক্রোশ দূরে সরকারি হাসপাতালে রওনা হইল।

মোড়লের বাড়িতে জলপান করার পর দারোগা পঞ্চায়েত বৈঠকে বসিলেন। সারা গাঁ—প্রতি ঘর হইতে একজন করিয়া লোক আসিয়া বসিয়াছিল। ইনস্পেক্টর খাটের উপর শুইয়া—হাতে নল লইয়া বলিলেন— 'ঘটনাটা গ্রামে হয়েছে এজন্য গ্রামের লোকই দোষীকে খুঁজে দিক!'

'তা তো নিশ্চয় সাহেব! গ্রামের ব্যাপার গ্রামই তো সন্ধান করে দেবে।' কাণজীর দাদা বলিল।

'কিন্তু স'াব! গাঁয়ের নোকর তো ঘরে আছে—বাইরের থেকেও এসে' বলিতে বলিতে মনারের বুড়োকে 'চুপ, শালা, শুয়োর! বাইরের থেকে আসবে কেন। ওর কাছে কি হীরা মতি ছিল? শুয়োর কোথাকার!' বলিয়া দারোগা চুপ করাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতীভাষা ও চেহারা সবটা মিলিয়া গ্রামটাকে বোবা করাইয়া দিল।

গ্রামে যখন তখন এমন তেমন ঘটনা তো হইতেই থাকিত, কিন্তু এমন ঘটনা কখনও হয় নাই। কে কাকে দোষী মনে করিবে? আর যদি দোষী ধরা পড়িত, তাহা হইলে শেষে দুই চারিজন মধ্যে পড়িয়া অমনি ইনস্পেক্টরকে কাকুতি-মিনতি করিয়া বিশ-পঁচিশ টাকা দিয়া দিলে হইত। এজন্য সারা

দিন ভাবনা চিন্তায় চলিয়া গেল।

শেষকালে মোড়ল গ্রামবাসীদের পক্ষ হইয়া প্রার্থনা করিল—'সা'ব, যা হবার তা তো হয়ে গেল। গ্রামে হয়েছে বলে গ্রামকেই দণ্ড ভুগতে হবে, কিন্তু এই ব্যাপারের এখানেই নিষ্পত্তি হোক।'

'তা হয় না মোড়ল। ও লোকটাকে হাসপাতালে না পাঠালে কথা ছিল। কিন্তু এখন তো ওর নাম সরকারি রেজিস্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তবু আমি দেখব। কিন্তু একবার আমাকে বুঝতে হবে যে ব্যাপারটা কি। বাঁচাবার জন্য কিছু করতে হয় তা করব।'

'তা হলে তো সা'ব, এ মামলা তো সরকারকেই নিজের হাতে নিতে হবে। আমাদের কারও তো কিছু পথ চোখে পড়ছে না। যাকে আপনি দোষী বলবেন, তাকেই হাজির করে দেব। আর আমরা কি করতে পারি?'

পরের দিন দারোগা মোকদ্দমা হাতে লইলেন। একটা কুঠুরীতে খাট বিছানো হইল। তদন্ত শুরু হইল। অন্যগ্রাম হইতে ধুলিয়াকে আনাইয়া তাহাকেই প্রথমে ডাকা হইল। 'বিয়ে কবে হ'ল, কেমন করে হোল?' এই প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত তার চাল-চলন, তার জন্য ঝগড়া প্রভৃতি বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল।

ইহার পূর্বে মোড়ল একটা কথাই বলিয়া দিয়াছিল—'ধুলিয়া সুযোগ পাওয়া গেছে—জীবনের মতো কাঁটা বেরিয়ে যাবে সেজন্য যা কিছু বলার বল্।'

মূর্খ ধুলিয়া প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল। তাহার পর রেশমাকে যাহারা ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাদের বিবৃতিও, মৌখিকই অবশ্য, লওয়া হইল।

আহত ব্যক্তিকে রাখিয়া খাবার খাইতে বসিবে এমন সময় কাণজীকে সিপাই উঠাইয়া লইল। সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে মোড়ল যখন কাণজীকে লুকাইতে দেখিয়াছিল তখন হইতে উহার আশা হইয়াছিল যে এ মামলা এদিকেই অর্থাৎ তাহার দিকে চলিয়া আসিবে। 'আচ্ছা, দেখা যাক, কি হয়। যেমন হবে দেখা যাবে।' ভাবিতে ভাবিতে কাণজী ইন্‌স্পেক্টরের কাছে গিয়া পৌঁছিল।

ইন্‌স্পেক্টরের চোখের সামনে ঘাবড়াইয়া না গিয়া বরং এই কথা ভাবিয়া

যে সত্য না বলিলে নিষ্কৃতি নাই, এজন্য যা ঘটিয়াছিল কাণজী সমস্ত—ধুলার স্ত্রী জোটানো ও নিজের ও জীবীর মধ্যে কথাবার্তা স্বীকার করিল। শেষে বলিল—'কিন্তু সাহেব, আমার আর তার মধ্যেও কোনও সম্বন্ধ নেই। বল তো গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলি।'

'গঙ্গাজল তো নিজের গ্রামের সামনে ছোঁবে। এখানে তো আইনের খপ্পরে এসে পড়েছ। এজন্য বাস্‌! সত্য কথা বল আর মিথ্যা কথাই বল, কিন্তু এখন আর রক্ষা নেই। তাই বুঝে সুঝে জবাব দিও। যা বলা হয়েছে তা তোমার বিরুদ্ধে!'

কে জানে কেন, কাণজীকে দেখিয়াই দারোগার মনে তাহার জন্য একটা অনুকূল ভাব সৃষ্টি হইল। এজন্য তাঁর কথার মধ্যে গালি ছিল না। ইংরেজিতে নামের আগে যেমন আর্টিকেল বসে। তেমনি পুলিশ বিভাগে, তাও দেশীয় রাজ্যে বিশেষ করিয়া, গালি দেওয়ার প্রথা। রাগ বেশি হইলে এক সঙ্গে চার পাঁচটা পর্যন্ত গালি দিয়া আরম্ভ করিতে হয়। মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে গালির অনুপাত, খিচুড়িতে চাল ও ডালের সমান পরিমাণের মতো বজায় থাকে।

তাহাতে আবার কাণজীর মতো সাধারণ লোক যদি বাঁচিয়া যায় তবে তাহা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে!

কাণজী সে রাত্রির সমস্ত কথা শুনাইয়া দিল। কিন্তু কেনই যে সে নিজে চীৎকার শুনিয়া এবং নিজে দৌড়িয়া আসিবার কথা বলিল। দারোগার চোখ বিস্ফারিত হইল। দারোগার তো ভরসা হইয়াছিল যে, যদি রেশমাকে আঘাত করা হইয়া থাকে তবে তাহা শুধু স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। এ ছাড়া কেহ নাকে আঘাত করিবে না। ধুলার ঘরে শোওয়ার জন্য রেশমাকে লইয়া গিয়াছে, একথা সে মানিতে পারিতেছিল না। এ বিষয়ে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হইয়াছে, আর তাহাতে সে কানের উপর হাত রাখিয়া বলিয়াছে—'ভগবান জানেন সা'ব, কিন্তু আমি যখন আসি তখন তো সে ঘরেই ছিল।' এ ছাড়া মোড়ল গাঁয়ে যে দেবতা আসিয়াছিলেন, তখন কাণজীর সঙ্গে অমিল, ধুলা ও কাণজীর গোলমাল, ধুলা ও রেশমার বন্ধুত্ব প্রভৃতি ছোটখাট বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিল।

দারোগা কাণজীকে বলিয়াছিল—'যদি তুই ধুলিয়ার বাড়িতে না ঢুকতিস

তবে অন্তত পাহারা দিতে গিয়েছিস। সত্যি কি হয়েছিল বল, এ ব্যাপারটা তো তুই, ধুলিয়া আর রেশমা, এই তিন জনের মধ্যে হয়েছিল। এদের মধ্যে ধুলিয়া তো অন্য একটা গ্রামে গিয়েছিল। সাক্ষী পেলে ও ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু তোর কি হবে? তুই খেতবাড়ি থেকে সোজা চলে আসছিলি, তার কোন সাক্ষী সাবুদ আছে?'

'হাঁ সাহেব, মোড়ল, ভগত বালাভাই দুজনেই আমাকে দেখেছিল।'

মোড়লকে ডাকা হইল। সে বলিল—'আমরা তো সাহেব, যা দেখেছি তাই বলব? কাণজী যে কথা বলেছে তা তো সত্যি, কিন্তু আমরা ওকে তেঁতুল গাছের আড়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে দেখেছিলাম?'

'খেতবাড়ি থেকে আসতে দেখ নি।'

'না সাহেব' বলিয়া মোড়ল কাণজীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—'যা দেখেছি তাই তো বলব আমার তো মিথ্যা'...

'কিন্তু তোমাকে মিথ্যা বলতে বলছে কে?' বলিয়া কাণজী হাসিল। বালাও মোড়লের মতোই বলিল, এখন ধুলিয়ার স্ত্রীকে ডাকিবার পালা। গ্রামবাসীরা ইন্স্পেক্টরের সামনে আপত্তি জানাইল—'সাহেব, মেয়েলোককে আনলে গাঁয়ের নাক কাটা যাবে।'

'আচ্ছা, দেখি এখন— 'বলিয়া ইন্স্পেক্টর কাণজীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—'একে পাহারায় রাখ।' এই সময়ে ইন্স্পেক্টরের মেজাজ খারাপ ছিল।

'পাহারায় রাখা আমি অস্বীকার করি না, সাহেব। কিন্তু আমার এক আরজি আছে।'

'বল্, কি।'

'সাহেব, আরও তদন্ত হওয়া চাই। যদি ধুলিয়ার ঘরের মামলাই বের হয়, তবে আমি সরকারের সব দণ্ড ভুগবার জন্য তৈয়ার আছি। কিন্তু তার আগে—'

'আচ্ছা, তবে তুই এখান থেকে চলে যা।' দারোগা তাহাকে রাগ করিয়া বলিলেন। আর প্রায় এক ঘন্টা তামাক খাওয়ার পর মোড়লকে ডাকাইলেন। রেশমার সঙ্গে আর কাহারও গত ছয় মাসের মধ্যে কোনও ঝগড়া ঝাঁটি হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোড়ল মনে করিতে করিতে বলিল—'মাস ছয়েক পূর্বে খেতে গোরু ঘোষ ঢুকেছে বলে হয়েছিল সাহেব। দানা কটারা তলোয়ার নিয়ে ওকে মারতে এসেছিল।'

'আচ্ছা, ডাকো দানা কটারাকে।'

পরে দানা কটারার তলোয়ারও চাহিয়া পাঠানো হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তলোয়ারের গায়েও রক্ত লাগা আছে দেখা গেল। দানা বলিল—'সাহেব, এদিয়ে গোসাপ মেরেছিলাম।' দানা সাক্ষ্যও জোগাড় করিয়াছিল। তথাপি দানাকে পাহারা দিয়া রাখা হইল।

রাত্রেও এই দুইজনকে পাহাবা দিয়াই রাখা হইত, কিন্তু গ্রামের লোকেরা, বিশেষত ভগতজী দারোগাকে বুঝাইল—'যদি পালায় তো আমরা—সমস্ত গাঁ তো আছি। এতে তো সাহেব, গ্রামের খারাপটাই ধরা পড়বে।'

সকাল হইতেই হাজির হওয়ার তাগিদ দিয়া দারোগা উহাদের ছাড়িয়া দিলেন।

ধুলার ঘরের দিকে কাণজী মোড় ফিরিতেছে দেখিয়া তাহার দাদা না বলিয়া পারিল না—'কি, এখনও পেট ভয়ে নি?'

কাণজী বাধা দিয়া বলিল—'তোমরা যাও না, আমার কিছু জানবার আছে, জিজ্ঞাসা করেই আসব।'

ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে কাণজী ধূলার ঘরের দিকে রওনা হইল। জীবীকে জানিত বলিয়া তাহার মনে হইল—'হতে পারে, রেশমা এখানেই ঢুকেছিল এবং জীবীই বিগড়ে গিয়ে একে মেরামত করে দিয়েছে।'

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল বুড়ি। জীবী উঠান লেপিতেছিল। বুড়িকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল। কাণজীকে দেখিয়াই জীবী উঠিল। একেবারে নিঃসঙ্কোচে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কাণজী মৃদুস্বরে বলিল—'যা হয়েছে, আমাকে সব সত্যি সত্যি বল। একটুও ঘাবড়িও না। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার গায়ে একটুও আঁচ লাগতে দেব না। কিন্তু যা হয়েছে, তা বল।'

'কিন্তু হয়েছে কি? আমাকে কিছু না বললে কি বা বলব আর তোমার কাছে তো কিছু লুকোবার নেই।' জীবীর স্বর কিছু নামিয়া আসিয়াছিল।

'আমি জিজ্ঞাসা করছি, এই কাণ্ডকারখানা তোর বাড়িতে হয় নি তো?'

অন্যসময় হইলে জীবীর হয়তো এই প্রশ্ন খারাপ লাগিত। কিন্তু আজকার প্রশ্নের গুরুত্ব সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেজন্য উল্টা সোজা প্রশ্ন না করিয়া জবাব দিল—'না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কিছুই হয় নি।'

'তখন কি তুই জেগে ছিলি?'

'যতক্ষণ তুমি গান গাইতেছিলে ততক্ষণ তো আমি জেগেইছিলাম। তার ঘন্টাখানেক পর চোখ লেগে এসেছিল এমন সময় চিৎকার শুনতে পেলাম।'

'বাইরে কোনও মারপিট শুনেছিলে?'

'না, এমন কিছু তো শুনি নি।'

'তাই?' কাণজী বলিল—'তবে কোনও চিন্তা নেই।'

এই পর্যন্ত চট্‌পট্‌ জবাব দিয়া জীবীর চোখ হইতে টপ্‌টপ করিয় জল পড়িতে লাগিল। বলিল—'তোমাকে···জেলে'

জীবীর পিঠে হাত বুলাইতে, তাহাকে বুকে টানিতে খুবই ইচ্ছা করিতেছিল; কিন্তু কাণজী মনকে বশ করিয়া আনিয়াছিলেন। বলিল—'কার ক্ষমতা আছে যে আমাকে বিনা দোষে জেলে···'

আনন্দ ও শোকে জীবী বলিয়া উঠিল···'আমার দিব্যি! তোমার হাত দিয়ে তো এমন কিছু হয় নি?'

'ওরে কী পাগল! আমার হাত দিয়ে হলে আমি কি সোজা দারোগার কাছে না গিয়ে···'

'কিন্তু আবার তোমাকে···'

'তুই দেখ না। সত্য যা তা উপরে ভেসে উঠবে, না হলে যাবে কোথায়? এই কাণজীকে তুই যেমন তেমন মনে করিস না! দু'দিনেই যারা মারে আর যারা মার খায় সকলের হাত ধরে ধরে···'কিন্তু চট্ করিয়া কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল—'তুই নিজেকে সামলিয়ে রাখিস, আমার জন্য কোনও

চিন্তা করবি না!' এই বলিয়া ঘরের দিকে পা বাড়াইল। কিছু মনে পড়িতেই আবার ফিরিয়া গিয়া চৌকাঠ ধরিয়া তখনই কৌতুক ভরে নানী-বুড়ি যে তাকাইয়া দেখিতেছিল, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল। যাইতে যাইতে তাহাকে বলিল—'নানী কাকী, তোমার ছেলে খুব ভাল কাজ করেছে। ভাল করেছে, তার এ ঋণ শোধ দেবে যে আমি স্বপ্নেও আশা করিনি!'

'না-না, কানা ভাই, একটু শুনে তো নাও। কথাটা খুলে বল…।' ধূলা যে কি বলিয়াছে, বুড়ির তাহা এপর্যন্ত জানা ছিল না!

'নিজের ছেলেকেই জিজ্ঞাসা কর!' বলিয়া কাণজী সোজা ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ভগতজী তাহাকে ডাকিল। কিন্তু 'খাবার খেয়ে আসছি' বলিয়া থামাইয়া দিল।

এ সময়ে তাহার মাথা অন্যদিকে কাজ করিতেছিল।

বুড়ি জীবীকে জিজ্ঞাসা করিল—'থিক রে বৌ? কানা কি বলছিল?' জীবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শাশুড়ির দিকে কড়া নজরে চাহিয়া বলিল, 'তোমার ছেলের পরাক্রমের কথা। আর কি? ওকে জেলে পাঠিয়ে সকলে খুশিতে আছ, না?' জীবী যে কি বলিতেছে তাহা সে নিজেই জানিত না। শাশুড়িরও এমনই মনে হইল—'কি বলছিস রে বৌ, কাকে জেলে পাঠালো, আর কি কথা…'

'জেলে যাওয়ার আর বাকি কি? দুনিয়া শুদ্ধু টি-টি পড়ে গেছে যে কাউকে পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে!'

বুড়ি আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না—'ওরে, এতে তোর বাপের কি এসে গেল? আর যদি তোর এতই প্রেম, তবে যা, ছাড়িয়ে নিয়ে আয় না! এতে বাধা কি আছে?' বলিয়া বিড়বিড় করিতে লাগল—'একটু লজ্জা কর্!…কথা টথা বলতে একটু শরম কর্!'

জীবী ভাবিতেছিল যে যদি বুড়ি এই কিটকিট করা না ছাড়ে তবে সে আরও কিছু কথা শুনাইয়া দিবে! কাছে বসিয়া বলিল, 'চুপচাপ ঘরে যাও! তোমাদের খুব লজ্জা, আমি জানি!'

বুড়ির রাগ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যদি কেউ টের পায় তো কি বলবে?

এই ভয়ে 'বল্ ময়না বল্, আজকাল তোরই দিন'—এই বলিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে ঘরে চলিয়া গেল!

সারা গ্রাম জানিয়াছিল যে ধূলা কাণজীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছে। প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় খাইতে বসিয়া গাঁয়ের প্রায় সকলেই একই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। 'সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু ধুলার এতদিনের জমানো রাগ সে কাণজীর উপর চালাইয়া দিল।' জীবীর রাগের আজ সীমা ছিল না, ঘরে যদি ছোট দেবর ও বুড়ি না থাকিত, তবে সন্দেহ নাই যে ধূলা খাইতে আসিলে তাহার মাথার উপর হাঁড়ি ভাঙিত। আজ তাহার মুখ দেখিতেও ভাল লাগিতেছিল না। সে মনে মনে বলিতেছিল—জানি না, এরূপ মূর্খ আমার ভাগ্যে কোথা হইতে জুটিল।

অন্যদিকে ভগতজীর বাড়িতে ভগতজী, কাণজী ও হীরা তিনজন মিলিয়া বিচার বিনিময় করিতেছিল। মামলা স্ত্রী ঘটিত, ইহাতে তো কাহারও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কাহাকে লইয়া, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। তিনজনই চিন্তামগ্ন। কাণজীও গাঁয়ের এক এক জন যুবতীর সঙ্গে রেশমার সম্পর্ক লইয়া ভাবিতেছিল। সেই অতীতের পাত্রে চাপা ঘটনাগুলি বারবার বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার চেহারায় প্রফুল্ল ভাব দেখা গেল। চোখ দুইটি যেন বলিতেছিল—'কাজ হইয়া গিয়াছে। একদম—এই-ই!'

কাণজী এদিক ওদিক একবার তাকাইয়া দেখিল। ধীরে ধীরে বলিল 'থাপ হারা মাথা কাটা যায় সে-ও স্বীকার, কিন্তু কথার নড়চড় না হয়, বুঝেছিস্?' বলিয়া ভগতজীর দিকে তাকাইযা ধীরে বলিল—'কি ভগতজী ভীমার বাড়ি এর সঙ্গে যুক্ত নয় তো?'

ভগতজী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করে জানলে?' কিন্তু তাঁহার ভঙ্গী বলিতেছিল, 'ঠিক কাণজী!'

ইহার পর ভগতজী দারোগার ভূমিকা লইল। কাণজী তাহার কথার পটাপট জবাব দিল।

এসব ব্যাপারে ঠিক ঠিক জবাব মিলিতে দেখিয়া হীরার আশ্চর্যের অবধি রহিল না। ভগতজী ও কাণজী দুই জনকেই তাহার খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইল।

পরের দিন দারোগা পঞ্চায়েতের সঙ্গে ধূলার বাড়িতে আসিল। বুড়ি

ও জীবীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল। জীবী 'আমি তো ঘরে ছিলাম। চিৎকার শুনে জাগলাম আর শাশুড়ি জাগলে দরজা খুললাম'—এই জবাব দিতে থাকিল। গালি দিলেও শেষে একই উত্তর। বেশি জিজ্ঞাসা করিলে জীবী কাঁদিয়া ফেলিল।

'মোড়ল!' 'দারোগা চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মোড়লকে ডাকিয়া বলিল।' 'তৈরি করলে, সাজালে, কিন্তু সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাণিয়া শালা তো খালাস পেয়ে গেল।'

'সে কথা তো আপনি জানেন সাহেব! কিন্তু আমি আপনাকে নিবেদন করি যে, যদি এই মেয়েকে টুকরো টুকরো করেও ফেলেন, তবু সে কাণজীর নাম করবে না।' এই বলিয়া মোড়লও মাটি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে একটু যেন চিন্তায় পড়িয়া গেল।

'কিন্তু আমাদের তো পাকা প্রমাণ চাই। এ ব্যাপারটা অন্য ধরনের মনে হচ্ছে।'—দারোগা যেন নিজের মনেই এই কথা বলিল।

'আর ব্যাপার কি হতে পারে সাহেব! যা আছে তা তো এইখানেই।' এই বলিয়া মোড়ল দারোগার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল। হাসিয়া যেন নিরুপায় হইয়া বলিয়া উঠিল—'হাঁ সাহেব, এই মোকদ্দমা চেপে দাও তো! এ লোকটা অন্য গ্রামের, তা বলেন তো ওকে হাসপাতাল থেকে সোজা বের করে দিই।' বলিয়া দারোগকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া প্রশ্ন করিল, 'গরিবের কথা যদি মানেন তবে এমনি করুন সাহেব! আপনার দয়া ভুলব না।'

'দয়া মনে রেখে করবে কি?' দারোগা হাসিয়া মোড়লের দিকে তাকাইলেন।

'ভেট-পূজা যা হতে পারে, সাহেব!' আর 'তা ও' বলিয়া দারোগা সাহেবের হাতের আঙুল টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—'এতো—আমাদের সামর্থ্য মতো, সাহেব!'

'এত শত কিছু নয়, মোড়ল! এর ডবল হয় তো কথা বল, নাহলে সারা গাঁ কে আমি কোর্টে হিচড়ে টেনে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, সাহেব! আপনি মালিক।' বলিয়া মোড়ল এই সুখবর শুনাইবার জন্য বাইরে আসিল।

গ্রামবাসীরা হিসাব করিল—'মরুক গে, ঘর পিছু একটা টাকা হবে না?

তার উপর যদি ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব আরো দু চার দিন থেকে যান তাহলে তার খরচাও চার-চার আনা তো দিতেই হবে।' কেহ কেহ তর্ক উঠাইল—'গাঁয়ের লোকেরা সমস্ত টাকা দেবে কেন? কাণজী অর্ধেক দিক।'

'কথাটাতো ঠিক। জিজ্ঞাসা কর ওর দাদাকে।' বলিয়া মোড়ল কাণজীর দাদাকে এক দিকে ডাকিয়া লইল। ভগতজী বুঝিলেন। সেখানে গিয়া তিনিও দাঁড়াইলেন। আর দাদাকে 'গাঁ বলছে, তবে তাই হোক। কি ভগতজী, নিজের থেকে কিছু…' ব'লতে শুনিয়াই ভগতজী বলিয়া উঠিলেন, 'কিছু হবে না, মোড়ল কাণজী এক কানা কড়িও দেবে না! একথা তোমাকে বলে দিচ্ছি।' দাদার দিকে চাহিয়া চড়াসুরে বলিল—'কোথা থেকে এনে দেবে?' ওর বিদেশ যাওয়ার জন্য পুরো ভাড়া পর্যন্ত জুটছে না! এজন্য বলি, কিছু না বলে চুপ করে থাকো না!' আর পিছন ফিরিবার পূর্বেই বিবর্ণ মোড়লকে আবার বলিল—'মামলা হোক গিয়ে! বিদেশে না গিয়ে যদি জেলের ভিতর থাকে তাও এই গরমের দিনে ক্ষতি কি? নাও, চল!' এই বলিয়া ভগতজী কাণজীর দাদাকে সামনে করিয়া আবার চত্বরে আসিয়া বসিল।

বেচারি দাদা তো ভগতজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাঁর শেষ কথাটি ভারি উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল ' 'ভগতজী বলে কি'? জেলে যাবে? কি রকম কথা বলে?'

মোড়ল তাহার বিরোধী লোকদের পুনরায় বুঝাইল—'ওরে ভাই কাণজীর ওপর থেকে কেস্ তো পরে গেছে! এক একটা সিকির জন্য কি গ্রামের অপমান করাতে বসেছ?'

শেষকালে সকলে রাজী হইয়া গেল। ঘর পিছু এক টাকা দিয়াও পাঁচ টাকা কম পড়িল। একজন বলিয়া উঠিল—'এই পাঁচ টাকা দিক ধূলিয়া আর মনোর দুইজন!

অমনি মনারের বুড়ো বাপ বলিয়া উঠিল—'হ্যাঁ মনোরই তো দেবে। মনোরের কটা ছেলের বিয়ে বাকি যে এসে হাতে তুলে দেবে?'

'আরে না, না, এ রকম অন্যায় কথা কি করে বলা যেতে পারে? একে তো মনোরের কিষান আহত হয়েছে, তার উপর আবার এ শাস্তি? কখনও এমন হতে পারে তবে ধূলিয়ার কথা যদি বলো, তো কোন কথা নেই।'

কিন্তু ওদিকে কাণজী ও ভগতজীর মধ্যে অন্য কি কথা হইতেছিল। কাণজী নিজে মুক্তি পাওয়ায় একটুও খুশি হয় নাই, বরং ঝগড়াই করিতেছিল —'না, ভগতজী, দারোগা সাহেবকে যা ঘুষ দিতে চাও তা ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটার তদন্ত তো হওয়াই চাই।'

'আরে ভালো মানুষের পো, কিন্তু তদন্ত করিয়ে তোর এখন লাভটা কি।'

'লাভ হবে না কেন?' বলিয়া ভগতজীর দিকে তাকাইয়া কাণজী বলিল, 'এর কলঙ্ক তো আমাদের ওপর থেকেই যাবে।'

অদ্ভুত লোক। ইন্‌সপেক্টর মোড়লকে তো বলিয়াই দিয়াছে যে কাণজী নির্দোষ। 'তবে আর কলঙ্ক তোর ওপর থাকবে কেন?'

'আমার ওপর না থাকলেও ঐ মেয়েটার ওপর থাকবে তো?' চিন্তামগ্ন ভগতজীকে কাণজী বলিয়া চলিল—'মোড়ল ইনসপেক্টর সাহেবকে যা কিছু বলছিল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সমস্তই শুনেছি। তার মত হোল, রেশমাকে যেন পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়, মোকদ্দমা যেন তুলে নেওয়া হয়। তা ঠিক কিন্তু তা হলেও মেয়েটার নামে কলঙ্ক তো থেকেই যাবে। লোকে কি করে জানবে যে ও মামলা ধুলিয়ার ঘরে নয়, তৃতীয় ব্যক্তির ঘরে। একে একবার পরিষ্কার হতে দাও। তারপর তোমাদের আর কিছু করণীয় না থাকে তো নাই বা করলে।'

ভগতজী কিছু বলিলেন না, মনে মনে স্বীকার করিলেন, কথাটা ঠিক জীবীর উপর যে কলঙ্ক আছে সে তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া।'

ইহার পর মোড়ল ও গ্রামের লোকদের গ্রাহ্য না করিয়া দারোগার সামনে ব্যাপারটার তদন্ত করিবার জন্য প্রার্থনায় কাণজীর সঙ্গে ভগতজীও সুর মিলাইল—'গ্রামের পঞ্চায়েত একবার নিজে গিয়ে তদন্ত করুন, তাতে সন্দেহ থাকলে আপনি নিজে গিয়ে তদন্ত করবেন।' এই সব পরামর্শ দিয়া তাহারা পঞ্চায়েতকে দাঁড় করাইয়া দিল।

মোড়ল ও গ্রামের অন্য নির্বুদ্ধি লোকেরা খুশি হইল না। কিন্তু আইনের অনুগামী ইন্‌সপেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে কাহার কি বলিবার আছে? পঞ্চায়েতের মধ্যে ভগতজী ও মোড়ল তো ছিলই, তা ছাড়া ঠাকুরডাদের মধ্য হইতে ধনা বুড়োকে লওয়া হইল, আর বাকি দুইজনের স্থানে গাঁয়ের লোকেরা কাণজী ও মনোরের বাপকে আগাইয়া দিল।

দুই ঘন্টায় পঞ্চায়েত ফিরিয়া আসিল। তিনটা বাড়ির উপর সন্দেহ ছিল। তাহার মধ্যে একটার দরজার উপর রক্তের দাগ দেখিয়া প্রশ্ন করিবার পর দারোগাকে জানানো হইল যে গোরুর গায়ে পোকা হইবার জন্য এই দাগ।

পঞ্চায়েতের সঙ্গে দারোগা ও অন্য সাত আটজন ভীমা প্যাটেলের বাড়ি আসিল। পঞ্চায়েতের তরফ হইতে কাণজী প্রদর্শিত পাথর, খুঁটা, চৌকাঠ ইত্যাদি দেখিবার পর প্রায় পঁচিশটি চোখ (একজন কানা ছিল) ঘরে একটা গর্ত ছিল তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সব চেয়ে উপরে ভীমা প্যাটেলের যুবতী কন্যার ছবি ভাসিয়া উঠিল।

'এ তো একেবারে গোরু মহিষের ঘর, তাই গর্ত তো হবেই!'

মোড়ল বলিয়া উঠিল—'ঘরে কেউ কাজ করবার লোক নেই, তাই…'

দারোগা ভগতজীকে জিজ্ঞাসা করিল—'এ বাড়িতে কয়জন লোক?'

'দুইজন, সাহেব। এক খোদ ভীমা পটেল, আর দ্বিতীয় ওর বিবাহ-যোগ্যা কন্যা।'

'আমার কাকার ছেলে—ভাই হয় সাহেব।' মোড়ল আগে আসিয়া এমন ভাবে কথা বলিল যেন ইন্‌সপেক্টর জানে না এবং ফিরিয়া আবার বলিল—'আর এমন গর্ত তো সাহেব গাঁয়ে সব বাড়িতেই আছে। আপনি আসেন তো দেখাই।'

'কোন জন্তুর পোকা-টোকা পড়েছে রে?'

'হাঁ হাঁ সাহেব, পড়েছিল আর আমরা…বা কি ভাই।'

ভীমের দিকে তাকাইয়া—'আমাদের চতুলা মোষ তো সত্য সেরে উঠেছে?'

দারোগা চারিদিকে দেখিয়া গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—'কিরে? একথা সত্যি?'

প্রায় সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

মোড়ল ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল—'বল না ভাই! যে কেউ তো 'হাঁ' 'হাঁ' করবে! সকলে মিলে আমার নাক কাটবার জন্য বসে আছ কেন?'

'হাঁ, হাঁ, সাহেব! মোষের পোকাই তো হয়েছিল।' কাণজীর দাদাই আরম্ভ করিয়া দিল। পরে আরও দুই চারজন ঘাড় নাড়িল।

কাণজীর বড় ভাইয়ের উপর এত রাগ হইল যে সেরূপ রাগ তাহার কখনও কোনও শত্রুর উপরও হয় নাই।

'ভাল, তবে এজাহার নেওয়ার কি দরকার?' বলিয়া দারোগা পিছন ফিরিতেই কাণজী বলিয়া উঠিল—'কিন্তু সাহেব। ঘোষেরই গর্ত কি করে স্বীকার করা যায়? হলেও তো জলের ধারে থাকবে, একেবারে উনুনের সামনে কি করে হবে?'

দারোগাকে নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইতেই হইল।

'হাঁ, সাহেব, এটা একটু ভেবে দেখতেই হবে'—গর্তের দিকে তাকাইয়া ভগতজী বলিল।

'আরে ভাই, জলের চৌবাচ্চা আছে বলে কি ঘোষ এখানে জল খেতে আসবে না. তুই ও কাণজী, এমন পাগলামির কথা বলিস্ না।' মোড়লের মুখে অস্বস্তির চিহ্ন স্পষ্ট।

'ভাই কাণজী! বেশি বেশি কথা বলা ছেড়ে দাও।' দুই চারজন বলিয়া উঠিল। আর দারোগার দিকে তাকাইয়া বলিল—'হাঁ সাহেব, আমাদের এখানে তো ঘোষকে অর্ধেক লোক ঘরেই জল খাওয়ায়। কেউ জলের চৌবাচ্চার সামনে নিয়ে যায়, কেউ বা…'

'ঠিক আছে।' দারোগা কাণজীর কাতর চক্ষুর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এবার ঠিক আছে তো?'

কাণজীর রাগ হইতেছিল। 'অন্য ঘরে কাঁথা ও বিছানাপত্র তো দেখা হয়েছিল। এখন এখানে ঠিক আছে, ঠিক আছে বলা হচ্চে কেন?'

অন্যদিকে ভগতজীও ভাবিতেছিল—'এ তো একেবারে তীরে এসে নৌকা ডোবাবার মতো', আর গাঁয়ের লোকদের দিকে কিছুটা চাহিতে চাহিতে বলিল—'তোমরাই বা কি। হাঁ, হাঁ করছ? গর্তের চেহারাটা দেখ না। এত বড় গর্ত যখন মাঠের জলে হয় না, তখন বাড়ির মধ্যে হবে কি করে?'

আর কেহ হইলে দারোগা তাহাকে ধমক দিয়া দিত। আবার গাঁয়ের লোকেরাও 'আমরা তো এখন সব বুঝে গেছি, ভগতজী কিন্তু গ্রামের কলঙ্কের উপর ছাই চাপা দেওয়াই ভালো। না ওটা আরও বেশি করে প্রকাশ করাই ভাল?' এই কথা বলিয়া অল্প বিস্তর ধুলা যাহা ছিল তাহাও সরাইয়া দিল। আর যেটুকুর এখনও কিছু অভাব ছিল তাহা

কাণজী যেন পূরা করিল—'আর সাহেব, একথা স্বীকার কর কি, ঘোষের খুরে গর্ত হয় বটে, কিন্তু তাতে গোড়ালিতে চালের মতো হয় না, পাতার মতো আকৃতি তার কিনারায় হয় ?'

অগত্যা, দারোগাকে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে হইল। অন্য কাহাকেও খানা-তল্লাসি করিবার প্রয়োজন বোধ না হইলেও চারদিক ঘুরিয়া তো আসিতেই হইল। কিন্তু গ্রামে রটনা হইয়া গেল যে ব্যাপারটা ধুলিয়ার বাড়িতে নয় ভীমা প্যাটেলের বাড়িতে। ইহার পর 'রহস্য মোচনের পর চোখের পর্দা খুলিয়া গেল'—এই যুক্তিতে বুঝিবার বাধা অপসৃত হইল।

সত্যি কথা, ভীমার মেয়ে দেওয়ালে ও রেশমার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল তো চলিতেছিল।

নানী বুড়ি এত খুশি হইল যে কাণজীকে দেখিতে পাইলে তাহার পা-ধোওয়া জল খাইত। তাহা না হইলেও খাওয়ার মতো তৎপরতা দেখাইত। একা একা সে বক্ বক্ করিতেছিল—'কাণা আমার ছেলেকে গেরস্থ করেছে, আজ মানও বাঁচিয়েছে।'

সমস্ত গ্রামে কাণজীর বুদ্ধি ও সাহস এবং সে ধুলার যে উপকার করিয়াছে তাহার প্রশংসা চলিতেছিল। কিন্তু কাণজীর প্রতি ধুলার একান্ত বিদ্বেষ। মনে মনে ভাবিতেছিল—'কে একে এত চালাকি করতে বলেছিল যে আমার আব্রু বাঁচাতে ছুটল। আগের জন্মের শত্রু, তাই যেখানেই দেখা, সেখানেই বাধা খাড়া করছে।'

এখন তো জীবীর আনন্দের সীমা রইল না আর, এই আনন্দ যতখানি তাহার নিজের কলঙ্ক হইতে বাঁচিবার জন্য তাহার চেয়ে অনেকগুণ বেশি এজন্য যে, কাণজী জেল হইতে বাঁচিয়া গেল। ইহার জন্য সে কতই না মানত করিয়াছিল, দুধ ঘি খাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। যদি পা উহার বশে থাকিত, তবে এই সংবাদ শুনিয়াই ছুটিয়া গিয়া কাণজীকে আলিঙ্গন করিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—কাণজী তো ভগতজীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল—শুধু বাহির হইতে দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে পারিল।

বিদায়

মানুষের মনের আর তার ভাবনা চিন্তার কোনই ঠিকানা নাই। এক মুহূর্ত পূর্বে যাহার উদ্দেশ্যে ঘৃণা বর্ষণ হইত পরে তাহার জন্য চোখের জল বহিতেছে। এক মুহূর্ত পূর্বে যাহা দুর্নীতি বলিয়া মনে হইত তাহাই মুহূর্ত পরে আদর্শ নীতি হইয়া দাঁড়ায়।

কাণজীর বিষয়েও এই কথা। গ্রামবাসীরা তাহার প্রশংসা করিতে জুটিয়া গল—'যদি কাণজী এতখানি সাহস না করিত তবে বেচারী ধুলিয়ার পাশে আসিয়া কে দাঁড়াইত? একলা কাণজী বাহির হইল। সে মোড়লের যাবজ্জীবন শত্রুভাব মূল্যে বাঘের মতো হাকিমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।'

লোকদের প্রশংসা শুনিয়া কাণজীর হাসি আসিল—'মারিয়া ফেলিবার পর ছায়া রাখিবার মতো এই সব কথা তো?' আর বিদেশ যাত্রার উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া বলিল, 'চল বাবা তোমাকে ত যেতেই হবে। এটাই ঠিক কথা'

যখন হইতে জীবী ভগতজীর বাড়িতে কাণজীর চলিয়া যাইবার কথা শুনিতেছিল তখন হইতে তাহার হৃদয়ে একটা অস্থিরতার ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল—'আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে যাবে?' আবার ইহাও মনে হইল—'কোথায় দেখা হইবে? কাহার সাহায্যে দেখা হইবে? তুই কেন ওর সঙ্গে দেখা করিতে চাস? দেখা হইলে কি বলিবি? বিদেশ যাওয়া বন্ধ করাইবি কি।' আর গদগদ হৃদয়ে মনকে বুঝাইল 'বেচারি দুঃখী প্রাণীকে অধিক দুঃখী করিবি কেন। যদি বিদেশ গিয়া সে সুখী হয় তবে উহার যাওয়াই ঠিক। তুই কিছু বলিবি না! কিছু অশুভ যেন না ঘটে।'

কিন্তু এই দেখার বিষয়ে কাণজীর মনে যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হইয়াছিল জীবী কি তাহা জানিত? এই অস্থিরতার ভয়ের জন্যই তো সে দুইদিন দেরি করিয়া দিল। 'তার সঙ্গে কেন দেখা হবে আর কোন মুখে দেখা

করব? আমি একবার বলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এই জীবী কেমন করে একটা হাওয়াই কেল্লা না তৈরি করেছিল? কিন্তু আমি এখানে আসার পর একদিনও তার সঙ্গে প্রাণ ভরে কথা বলতে পারিনি। তাকে এমন মারধোর করা হয় কিন্তু আমি একদিনও তাকে ডেকে কখনও সান্ত্বনার দুটো কথাও বলিনি। তবে এখন আমি কোন মুখে দেখা করবার জন্য তাকে ডাকব? এখানে থাকতেও আমি ওকে কি সাহায্য করতে পারলাম। বরং ও আমার জন্য মার খেয়েছে, স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া হয়েছে, সেও আলাদা কথা। এই কি কম যে ওকে ডেকে ওর আরও ক্ষতি করব?' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জীবীর সঙ্গে দেখা করিবার চিন্তাই সে ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু যাওয়ার সময় জীবীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। 'জানি না, আবার কবে ফিরে আসব? ততদিন কে বেঁচে থাকবে আর কে মরবে জানি না। যাওয়ার পূর্বে একবার ওকে দেখে তো যাব। সঙ্গে সঙ্গে ভগতজীর সঙ্গেও তার বাড়ি দেখা করে আসব ' এই কথা ভাবিয়া কাণজী, দাদাকে বুঝাইবার পরে ভগতজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল

কিছুক্ষণ পূর্বে জীবী ঘোল আনিবার ছলে গ্রাম ঘুরিয়া আসিল. কাণজী ঘন্টাখানেক পরে চলিয়া যাইবে, এই কথাও শুনিয়া আসিয়াছিল, আর ওকে ও বাড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে দেখিয়াও আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়াও তাহার চোখ দুটি ভগতজীর বাড়ির দিকে পড়িয়াই রহিল। উঠানে কখনও বা ধুলা-বালি উঠাইতে থাকিল, কখনও বা বাহিরের খুঁটায় দড়ি খুলিয়া পাকাইল। এইভাবে সে এদিক হইতে ওদিক ঘুরিতে আরম্ভ করিল। হাতমুখ ধুইয়া শেষ করিলেও জলের ঘটি ভরিয়া পুনরায় বারান্দায় আসিয়া বসিল। হাতমুখ ধোওয়ার পর তাহার দৃষ্টি পড়িল চালার নীচে গোবরের উপর। সে ঝুড়ি লইয়া দুই চারি স্তূপ গোবর ভরিয়া তাহা আস্তাকুঁড়ে ফেলিতে গেল। ভগতজীর উঠানে তাকাইয়া দেখিল, তিনি একলা বসিয়া তামাক খাইতেছেন। যাওয়ার সময় কিছু কথা হইল না। কিন্তু ফেরার সময় বলিয়া উঠিল 'তোমার ভাই-বন্ধু তো যাওয়ার সময় দেখা করতে এল না ভগতকাকা।' ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া ভগতজীর আঙিনায় যে গোবর-গাদা

পড়িয়াছিল তাহা উঠাইবার জন্য ঝুঁকিল।

'কাণজীর কথা জিজ্ঞেস করছ কি? আমার মনে হচ্ছে সে এখনও বেরিয়ে যায় নি। যতদূর সম্ভব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।' 'তাহলে ঠিক আছে,' বলিয়া জীবী ঘরে আসিল আর জলের ঘটি লইয়া হাত ও ঝুড়ি ধুইতে অনেক সময় লাগাইল, যেই সে উঠিযা ফিরিয়া মহল্লার একপ্রান্তে তাকাইল অমনি তাহার দুইচোখ যেন হাসিয়া উঠিল—কাণজীর মাথার লালকলগী হাওয়ায় উড়িতেছিল!

ভগতজীর সঙ্গে কথা বলিতেছে কাণজী আর ঘরে বুড়ির প্রশ্নের উত্তর দিতেছে জীবী—দুইজনের মনের অবস্থা বিচিত্র ছিল। কে কাকে প্রশ্ন করিতেছে আর স্বয়ং কি উত্তর দিতেছে দুইজনের মধ্যে একজনেরও সেই খেয়াল ছিল না। ভগতজী কাণজীকে প্রশ্ন করিতেছেন 'কবে ফিরবে?'

'মালিক যখন আনবেন' বলিয়া কাণজী জীবীর দিকে তাকাইল, পাগড়ী বাঁধিতে বাঁধিতে ভগতজী আবার প্রশ্ন করিলেন, 'চিঠিপত্র লিখবে না আমাদের ভুলে যাবে?'

কাণজী দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে বলিল—'যদি ভুলে যেতে পারতাম তবে আর কি চাইতাম ভগতজী?' আর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, 'আমি তোমাদের ভুলতে পারব না কিন্তু তুমি ভুলে যাবে!' বলিতে বলিতে জীবীর দিকে মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিল, 'তোমার মতো কি লোককে আকর্ষণে বেঁধে অনর্থক হয়রান করি?' এইসব কথা শুনিতে শুনিতে আর চুপচাপ অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়াইয়া জীবী কাণজীকে এমন একাগ্র-ভাবে দেখিতেছিল যেমন প্রথমবার দেখিল। আর সত্যি কথা বলিলে বলিতে হয় ঐ বেশে ত কাণজীর সঙ্গে এই দ্বিতীয়বারই দেখা। প্রথমবার যখন মেলায় দেখা হইয়াছিল আর এই দিন। ঐ দিনের মতো এইবারও সেইরূপ সে উহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে।

জীবী শুনিল ভগতজীর পিছনে চলিতে চলিতে কাণজী তাহার দিকে তাকাইয়া বলিতেছে—'যোগীপুরার পথে গেলে ত ঠিক হবে ভগতজী কি বল?'

বৈঠকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জীবী কাণজীর পৃষ্ঠদেশে তাকাইয়াছিল! প্রথমবার দেখার সময়ও উহার মনে হইয়াছিল, 'জানিনা ঐ গ্রাম কোনদিকে? জানিনা আবার কবে দেখা হবে? হয়ত এইজন্মে আবার দেখা নাও

হতে পারে। আবার বিদেশী লোকের প্রতি ভালোবাসা কিসের?' এইভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া সেদিন সে চলিয়া গিয়াছিল। এই ছয় মাসের উৎপীড়নের পর আজও জীবীর মনে হইতেছিল—'জানিনা কোন দেশে যাচ্ছে হয়ত আর নাও ফিরতে পারে।' আর সেদিনকার মতোই উহার চোখ ছল্‌ছল করিয়া জল পড়িতেছিল।

হঠাৎ জীবীর মনে পড়িল কাণজীর সেই শেষ কথাটি যোগীপুরার রাস্তা। সে সময় কাণজা তাহাকে চোখের ইশারা করিতেছিল এমন কথাও তাহার মনে হইল। মুখ ধুইয়া সে চট্ করিয়া ঘরে গেল আর বলিল—'যতক্ষণে রুটি তৈরি হচ্ছে আমি দুচারখানি কাপড় ধুয়ে নিয়ে আসি। তোমার ধুতি দাও নিয়ে নিই।' এই বলিয়া ও কাপড় আর ধোওয়ার কাঠ লইয়া নদীর দিকে চলিল।

এই সময় ঠাণ্ডার সময়ে যজমানদের ক্ষৌরকার্য করিবার জন্য ধূলা বাহির হইয়া গিয়াছিল! যদি সে ঘরে থাকিত তাহা হইলেও উহার শাশুড়ি তাহাকে অনুমতি দিতই কারণ আজকাল বধূর প্রতি সে সর্বপ্রকারে প্রসন্ন ছিল। কাণজীকে বিদায় দিবার জন্যে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তাহার বৌদিদি দাদা হীরা আর ভগতজী উহাকে একেবারে গ্রামের সীমা পর্যন্ত পার করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। রতন তো কাকার কাঁধ হইতে নামিতে রাজি ছিল না। দাদা এখনও এই কথাই বলিতেছিল, 'রাজী হও, বর্ষা হওয়ার তো এখন মাসখানেক বাকি আছে, কেন অনর্থক এই কদিনের জন্য···আর যদি বর্ষাকালে না ফিরে আস তবে আমি খুব অসহায় বোধ করব। আমার শরীর তো গিয়েছে অর্ধেক হয়ে। তাই নিয়ে তো আমি একলা···'

'আরে ভালো মানুষের ছেলে, আসবে না কেন! এই মাসখানেক ঘুরেই আসুক,' এই বলিয়া ভগতজী দাদাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল।

'তুমিত ঠিক বলেছ ভগতজী, কিন্তু ঐ বিদেশে কে ওর খোঁজ নেবে খাওয়া হল কি না হল। চাকুরি পেলে কি না, আর এতো শহরের কথা!' এই কথা বলিতে বলিতে দাদার গলা ধরিয়া আসিল। খুব কষ্ট করিয়া বলিতে পারিল, 'তুই বসে খা কিন্তু ভাই শরীরকে কষ্ট দিস্ না। সামনে গাড়ি আসছে শুভলক্ষণ কোন ক্ষতি হবে না। পাশ দিয়া গোরু যাইতেছিল হাত

দিয়া সেই গোরু ছুঁইয়া দাদা মাথায় ছোঁয়াইল।

বৌদিদির জিভ যতই লম্বা হউক তথাপি কাণজী তাহার নিকট রোজগারী ছেলের মতো সুতরাং তাহার চোখ দিয়া যদি জল পড়ে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

'আচ্ছা এখন তো দেখা হল এখন আবার রোদ বাড়বে' বলিয়া ভগতজী দাঁড়াইয়া পড়িল।

দাদা বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিবার সময় কাণজী এমন মাথা নামাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল যেন কোনো মেয়ে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে এই পর্যন্ত দেখিয়া ভগতজীও কাণজীর কাছে বিদায় নিবার সময় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাও এতখানি যে কাণজীকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে হইল, 'একি ভগতজী তুমিতো সাধুর মতো, তোমার চোখে জল কি শোভা পায়।'

'শরীরকে ভাল রেখো। চিঠি লিখো, শিগগিরি ফিরে এসো', এই কথা বলিয়া তিনজন কাণজীর কাছে বিদায় লইল।

দেখা করিবার সময় রতনকে নিচে কষ্ট করিয়া নামিতে হইল। সে কাণজীর হাত এত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল যে মা উহাকে মারিবার জন্য দৌড়াইলে তবে ছাড়িয়া দিল। কাণজী উহাকে এত আদর করিয়াছিল যে সে ঘাবড়াইয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিতে পারিল 'রতন আবার দেখা হবে' আর উচিত অনুচিত কিছু না ভাবিয়াও বলিয়া ফেলিল—'বৌদিদি একে নতুন কাকীর (জাবী) কাছে যেতে দিও সেখানে ওর মন খুব টিকবে।' রতনের কান্নার চোটে হেঁচকি উঠিতেছিল তাহাকে দুই তিনবার আদর করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিল। ততক্ষণ হীরা সঙ্গেই ছিল।

বৌদিদির সন্দেহ হইল 'হীরা ভাইও কোথায় যাচ্ছ নাকি?' 'না ত! ও ত ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে যাচ্ছে···। ও বেচারি তো গৃহস্থ লোক। ও কি করে যেতে পারে?' ভগতজী এই কথা বলিয়া তিনজনকে লইয়া ফিরিল।

কাণজী ও হীরা দুইজনে ফিরিতেছিল। হীরার হাতে তামাকের ছিলিম ছিল উহা যে কাণজীকে দিতে হইবে সেই হুঁস তাহার ছিল না। দুইজনের অনেক কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু ইহার পূর্বে বলা হইয়া গিয়াছিল তথাপি উহাদের যেন অনেক কথা এখনও বাকি আছে। শেষকালে গাঁয়ের নদীও কাছে আসিয়া পড়িল। কাণজী একটা বটগাছের নিচে আসিল। 'নে

তামাক সাজ। আমাকে দে'—এই কথা বলিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁধ হইতে পুঁটলি নামাইয়া ফেলিয়া রাখিল। হীরা তামাক সাজিতে বসিল।

কাণজী বলিতে লাগিল—'হীরা, তুই আমার ভাইয়ের মতো, তোকে আর কি বলব? আর যা কিছু হোক, দাদার কুশলসংবাদ নিতে থাকবি, বর্ষাকালে আসতে পারি, নাও আসতে পারি।'

'এ তুই কি বলছিস রে কাণজী? বর্ষাকালেও তুই আসবি না এ কি হতে পারে? হীরা যতই সাহায্য করতে চায়, সে নিজেরটা সামলাবে, না তোরটা। তোর দাদা একেই দুর্বল. এমনিতে হাড় ভেঙে গেছে, তাতে তার সাহস আরও কমে যাবে, আর মরে বেঁচে যে ঘর গ্রামের মধ্যে করেছে, সে সহস্র খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে।'

'না না। আমি আসব তো নিশ্চয়, তবুও…'

'এ তবু-টবু কিছু নয়! আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিস তো বলি তুই এভাবে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছিস তো দশ-পনেরো দিন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ঘুরে টুরে আয়। আমি তো এখন সত্যি সত্যি বলছি, এই চাকরি-বাকরির গোলমাল ছেড়ে দে।'

কাণজী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, 'ওহে ভাল মানুষের বেটা, কিন্তু আমি আর চাকরি করতে যাচ্ছি কোথায়? হাঁ, একথা নিশ্চয় যে একমাস দুমাস এভাবে কেটে যাবে। এই কান্নাকাটি থেকে যত দূরে থাকতে পারি ততই ভালো।' মুখ হইতে তামাকের কলকে লইয়া কাণজী এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। তাহার পর দুই জনই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে কাণজী উঠিল। বিদায়ের সময় দুই জনই কাঁদিয়া ফেলিল।

কাণজী কেন গ্রাম ছাড়িয়া যাইতেছে, হীরা তাহা ভাল করিয়াই জানিত, তাই আজ জীবীর উপর রাগ হইতেছিল। এখন কাণজী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—'হীরা, জীবীর দিকে একটু নজর রাখিস, ও বেচারির তো এখন তুই ছাড়া আর কেউ নেই।' আর চোখ হইতে অবিরাম যে জলধারা বহিতেছিল তাহা পাগড়ির প্রান্ত দিয়া মুছিতে লাগিল।

এই কথা বলিতে বলিতে হীরার আবার চোখে জল আসিয়া গেল—'কোনও চিন্তা নাই, তুই নিজে নিশ্চিন্ত থাকিস! আচ্ছা এখন যা, সূর্যদেব

মাথার উপর।'

দুইজন পৃথক হইয়া গেল। হীরা গাঁয়ের দিকে পা বাড়াইল, কাণজী নদীর দিকে। নদীর তীর দিয়া নামিতে নামিতে কাণজী বার দশেক পিছনে আর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চ'লল। একখানি লাল শাড়ি দেখিয়া কিছুক্ষণ থামিল। কিন্তু তাহা উল্‌টা দিকে যাইতে দেখিয়া হতাশ হইল। নিজে নিজে বলিতে লাগিল—'এখন ঐ বুদ্ধিহীনের সঙ্গে দেখা হইলেই বা কি না হইলেই বা কি।' এই বলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নদীর ঢালু দিয়া নামিতে লাগিল।

কিন্তু নদীতে পা দিতেই উহার দৃষ্টি পড়িল জীবীর দিকে। আনন্দে তাহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। মহিষদের জল খাওয়াইতে যে সব ছেলে আসিয়াছিল তাহাদের কথা না ভাবিয়াই সে তাহার দিকে পা বাড়াইল। জীবী কাপড় নিঙড়াইতেছিল, চট করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বলিল—'ঐ করঞ্জা গাছের নীচে—আমি আসছি।'

কাণজী সেখানে গিয়া করঞ্জার ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার ধারণা ছিল জীবী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিবে, তাহার চোখে বহিবে জলের ঝরণা। সে তাই সান্ত্বনার কি কথা বলিবে তাহা ভাবিতেছিল।

কিন্তু জীবী অন্যরূপ স্থির করিয়াছিল—'যাওয়ার সময় কান্নাকাটি করে অযাত্রা করব না।' যতখানি কাঁদিতে পারিত ততখানি আগেই কাঁদিয়া লইয়াছিল।

নিকটে আসিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া জীবী জিজ্ঞাসা করিল—'যাবেই যখন তখন একটু তাড়াতাড়ি বেরুলেই হত। মাথার রোদ্দুর বাড়িয়ে লাভ কি?'

কাণজী মনে মনে ভাবিতেছিল যে বলিয়া দিবে—'হৃদয়ের জ্বালার সঙ্গে সামনে মাথার রোদ্দুরের তাপের তুলনাই হয় না।' কিন্তু ইহা না বলিয়া ব্যবহারিক কথা বলিল—'তাড়াতাড়ি বের হব ভেবেছিলাম, কিন্তু সকলের কাছে বিদায় নিতে নিতে দেরি হয়ে গেল।'

জীবী এখনও হাসিতে'ছল। সেও করঞ্জার ডাল ধরিল। পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—'ফিরে আসবে কবে?'

'কি করে বলব?'

'তা বর্ষার আরম্ভেই তো ফিরে আসবে, না?'

'দেখব', বলিয়া জীবীর দিকে তাকাইয়া বলিল—'এ তো আমার হাতের মধ্যে নয়।' প্রিয়জনের হৃদয়ে আঘাত দিবার নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি লইয়া বলিল—'যদি এই কয় দিনে ফিরে আসবার কথা হত তবে ঘর আর গ্রাম ছাড়ব কেন?' এই বলিয়া জুতার অগ্রভাগ দিয়া বালুর মধ্যে পাথর টানিতে লাগিল।

'সত্যি?' তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল।

জীবার মুখ দেখিয়া কাণজী আবার কথা বদলাইল—'না, না! তাও কি কখনো হয়? মানুষ সব কিছু ছাড়তে পারে, কিন্তু নিজের দেশ কি করে ছাড়বে?'

'আর কেউ ছাড়তে পারুক আর নাই পারুক, তুমি তো এটাও ছেড়ে যেতে পার।' এই বলিয়া হৃদয় বিদারক জলভরা চোখে কাণজীর দিকে তাকাইয়া জীবী বলিল—'তোমার কি মানুষের হৃদয়?'

কাণজী পুনরায় এক দীর্ঘশ্বাস লইয়া চোখ নিচু করিয়াই বলিল—'সে কথা তো একা আমিই জানি, আর আমার মনই জানে। মানুষের প্রাণ না হলে কি আজ বাড়ি ঘর ছেড়ে যাওয়ার দরকার হত!' এই বলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে চোখের জল যেন মুখের মধ্য দিয়া বাহির হইতেছে।

দুই জনেই চুপ করিয়া থাকিল। এই দুইজনের চারিদিকের পরিবেশ এমন শান্ত ও ভয়ংকর মনে হইতেছিল যে উহার শান্তি সুদূর নদীতে স্নানে রত বালকদের শব্দ ও পাখির কুজন দ্বারা ব্যাহত হইতেছিল।

শেষে জীবী বলিল—'দেরি করছ কেন?'

কাণজী নিজের মনে বলিযা চলিতেছিল—'হাঁ, আমি যাই, এতে মঙ্গল হবে। এ না হলে তোর কি আমার কারোই মঙ্গল হবে না।'

জীবী মনে মনে ভাবিতেছিল, কি বলিতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই—'জানি না, এতে মঙ্গল না অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে!'

সহসা কাণজীর চৈতন্য হইল। তাহার চোখে যেন অন্য প্রকারের আলো জ্বলিয়া উঠিল। জীবীর দিকে এক পা আগাইয়া আসিয়া তাহাকে বলিল—'আমার একটা কথা রাখবে? চল, আমরা দুজনেই পালাই।

সাহস আছে ?'

মুহূর্তের জন্য জীবী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাণজীর দৃষ্টিতে উহার চক্ষু যেন বলিতেছিল—'স'ত্য বলছ ?' কাণজীর গলায় জড়াইয়া ধরিবার উন্মাদনা তাহার আসিল, পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়া গেল। চোখের পাতা নিচু হইয়া আসিল, কষ্টে বলিল—'না, না, তুমি একাই যাও। আমাকে' ···শাড়ির আঁচলে মুখ লুকাইয়া অমনি পিঠ ফিরাইল। পাথরে ঠোকর খাইয়া তাহার পায়ের এমন অবস্থা হইয়াছিল যেন কেহ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

জীবীর দিকে চাহিয়া যখন কাণজীর হুঁশ হইল, তখন সে পা বাড়াইল। জীবীকে একবার দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহারও একই দশা। আস্তাবল যাইবার জন্য উদ্যত ঘোড়াকে যেমন বাধ্য করা হয় তেমনি সে। নিজের প্রাণকে বিপথগামী হইতে নিবৃত্ত করিয়া সোজা রাস্তায় লইয়া যাইতেছিল।

নদীতীরে উঠিয়া সে দুই খেত পরিমাণ রাস্তাও পার হইয়া গেল, কিন্তু এখনও নদী যেন বিলাপ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া যাইতেছিল—'যদি এমনই করবে তবে আমাকে এখানে আনলে কেন ? কেন আমাকে মন্দ লোকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে ?'

কাণজীর চোখ হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছিল, দুই এক ফোঁটা জুতার ঠোকর খাইয়া থাকিলেও কিছুটা তো ধুলায় মিলাইয়া গেল। হুঁশ হইতেই সে চোখ মুছিল। শেষবারের মতো পিছনে তাকাইয়া অন্য তীরে খেত দিয়া লালশাড়ি পরনে একজনকে যাইতে দেখিল। নিঃশ্বাসের অঞ্জলি দিয়া সম্মুখের পথে ঘাড় ঘুরাইয়া মনে মনে বলিল—'এক মুঠো জীবনে কত অভিনয়ই না দেখিতে হয় !'

দারোগা ঘরপিছু এক টাকা করিয়া ভেট পূজারূপে লইল। বিনিময়ে কাজও অনেক করিয়া দিল। রেশমা প্রায় সুস্থ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে হাসপাতাল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়ায় মোড়লও পুরাপুরি সাহায্য করিয়াছিল এবং তাহার পর মোকদ্দমা আপনিই খারিজ হইয়া গেল।

কিন্তু এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা অবসরকালে আলাপ করিবার উপাদানও যথেষ্ট পাইয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, 'আমি রেশমাকে দেখেছি, তার চেহারা এমন বদলে গেছে যে, জঙ্গলে কেউ তাকে একা দেখতে পেলে ভয় পেত। নাকটা এমনি দেখাচ্ছিল যেন মাটির গারা[১] লাগানো হয়েছে, একটা চোখের তো মণিই বেরিয়ে গেছে।'

কিন্তু ধূলার তো রেশমার চোখ-নাক অপেক্ষা তাহার নিজের রূপার বালার চিন্তাই বেশি। একদিন সময় করিয়া পাঁচক্রোশ গিয়া যেখানে রেশমা থাকিত সেখানে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু রেশমা তাহাকে পাত্তাই দিল না।

—'ওরে পাগল নাকি? বালা তো চলে গেছে সেই ব্যাপারে।'

ইহা শুনিয়া ধূলার বিপদ আরো বাড়িয়া গেল। অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল—'বালা গেছে তো মরুক গে, রেশমা ভাই। সেই তুক যদি না করে থাক তো আর কোরো না। আর যদি করেই থাক তো ফিরিয়ে নাও ভাই।'

ধূলার মূর্খতা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রেশমা সংক্ষেপে বলিল, 'আচ্ছা।'

ধূলা যাওয়ার সময় উহার নিকট হইতে কথাও আদায় করিয়া লইল,

---

১ মাটির সঙ্গে হলদি মাখিয়া ঘরের দেওয়ালে লেপিলে জলকাদা একত্র হইয়া যে রূপ ধারণ করে তাহাকে গারা বলে। তাহার একটুখানি হাতে লইয়া তাহা লাগাইয়া দিলে নাম হয় গোদা। কোন জায়গায় লাগাইলে তাহা চ্যাপটা হইয়া থাকে। রেশমার নাকে চোট লাগিয়া চ্যাপটা আকার ধারণ করিয়াছে।

'ও তো এখন চলে গেছে, তাই ওটা ফেরত দে ভাই সাহেব! এই ষাঁড়কে তো আমি এখন সোজা করে দেব।'

জানি না বালা হারাইবার জন্যই হোক আর রেশমা ফিরাইয়া আনিলে অন্য বালাটা হাত হইতে চলিয়া যাইতে দেরি হইবে না মনে করিয়াই হোক—এই দুই কারণের যেটিই হোক—ধূলার মনে ক্রোধের সহিত অসহায়তা বোধও জাগিল।

এই সকলের মূলে ও জীবীর দোষই দেখিতে পাইল। উহার এমনও লাগিতে আরম্ভ করিল যে, ও আসিবার পরই মর্যাদা ও টাকা পয়সার দিক হইতে ক্রমেই সে দুর্বল হইতেছে। মনে মনে ভাবিতেছিল—যে দিন হইতে ষাঁড় আসিয়াছে সেইদিন হইতে সংকটও আসিয়াছে।

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে তাহার রাগ চরম সীমায় উঠিয়া গেল। জীবীর উপর যদি কখন প্রাণ ভরিয়া হাত উঠাইয়া থাকে তবে তাহা আজ। দোষ এই ছিল যে জীবী তাহার জন্য গরম জল করিয়া রাখে নাই।

জীবীকে ছাড়াইতে আসিয়া বুড়ি বলিয়াও ছিল—'কিন্তু কে জানত যে তুই এমনই আসবি? আবার মারছিস্ কেন ধূলিয়া? তুই তামাক খা! এতেই···'

কিন্তু ধূলা এক হুঙ্কার দিল, সঙ্গে সঙ্গে মারিতে থাকিল—'মারতে তো আমি কখন থেকেই চেয়েছিলাম।'

বুড়ির উপরও একটা লাঠির চোট লাগিল। সে চিৎকার করিয়া উঠিল—'তোর সর্বনাশ হোক্। একটু দেখে চলতে তো হয়।'

'তুমি এটাকে এ রকম করে করে বিগড়ে দিয়েছ।' এই বলিয়া পুনরায় জীবীর দিকে ফিরিয়া—'ঐ দিন তোর কোন স্বামী বিদেশ যাচ্ছিল, যে নদী পর্যন্ত পৌঁছতে গিয়েছিলি।'

এই কথা শুনিয়া বুড়িও 'তবে মর্ দুজনে একত্র হয়ে।' বলিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতেছিল,—'ঠিক হয়েছে, এমন করে মার যাতে মেয়েটা সোজা হয়। আমি তো মনে করেছিলাম যে সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু ওর চালচলন দেখে তো তা মনে হয় না।'

জীবীর চোখ এখন বদলাইয়া গিয়াছে, যেন জগদম্বার মতো। এক ঝটকায় ধূলার হাত হইতে লাঠি ছাড়াইয়া নিয়া ঘরের কোণে তাহা ফেলিতে

ফেলিতে বলিল—'দম তো নেই, নাক কাটা, এসেছে আমাকে মারতে।'

ধূলার এই ভয়ংকর সংকটে (ভয়ংকর এ জন্য যে জীবীর ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া ভয় লাগিতেছিল, অন্যদিকে জীবীকে শায়েস্তা না করার জন্য অক্ষমতা বশত) সম্মুখ হইতে ভগতজী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি তো ধূলাকে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন, বুড়িকে ভালমন্দ বলিলেন আর রাগের চোটে জীবীকেও বলিলেন, 'রোজ রোজ এমন কাণ্ড! বিষ কি জোটে না?'

কাণজী চলিয়া যাওয়ার পর ভগতজীর ভাগ্যে এই সব ঝঞ্ঝাট ছিল নাকি? অর্থাৎ ভাবনা তো হীরারও ছিল। কিন্তু জীবী ডাকিনী, কাণজীকে যাদু করিয়াছে এরূপ সন্দেহও তাহার ছিল। এ জন্য সে তো একপ্রকার এই আচরণকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিত। আর তার ঘরও কিছু দূরে ছিল বলিযা অর্ধেক ঝগড়া তো শোনাই যাইত না।

ভগতজী যে বলিলেন, 'বিষও কি জোটে না?' এই কথা জীবীর মাথায় অনেকদিন ধরিয়া ঘুরিতে থাকিল। উহার বাপের বাড়িতে একটি মেযে বিষ তার রুটিতে মাখাইয়া খাইযা ফেলিযাছিল। নিমেষে তাহার পাহাড়ের মতো দুঃখ ভস্ম হইয়া গেল। জীবীর এইসব মনে পড়িল। এমন নয় যে এরূপ করিতে দেরি হইবে। কিন্তু সে ভাবিল, একমাস অপেক্ষা করি না কেন? একবার ওকে (কাণজীকে) দেখে নিই—শেষবারের মতো দেখা, তারপর মরার সময় তো পড়ে আছে।

কাণজী মনের দুঃখে (হতে তো পারে উড়ো উড়ো খবর ওর কানে পৌঁছে গিয়ে ওর বুক জ্বলে যাচ্ছে সেই দুঃখে) গাঁয়ের এই মারপিটের কথায় বেশি মন দিচ্ছে না। সে জন্যও ওর এখন মরা চাই। কিন্তু কেবল তো একটি মাস বাকি কাণজীর আসার।

এদিকে গরম বাড়িয়া চলিতেছিল অপরদিকে জীবীর দিনগুলি তো ক্রমেই ভয়ংকর হইয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক ভোরবেলা মুরগীর ডাকের সঙ্গে উঠিয়া পড়িত, এক পালি দুই পালি মকাই পিষিত, তবু রাজ দরবার হইতে আসার ভঙ্গীতে যিনি ওঠেন, সেই সূর্যদেব মুখ দেখাইবার নাম করিতেন না। সহজে মাথায় বওয়া যায় এই পরিমাণ গোবর-পাঁশ মাথায় করিয়া ফেলিয়া আসিত। চার পাঁচ ঘড়া জল আনিত তাহাও আবার এত ধীর পদক্ষেপে যেন গুণিয়া গুণিয়া পা ফেলিতেছে, তবু যেন সূর্য মোটে দুই বাঁশ পর্যন্ত উঠিল। পেটের

খোরাক জুটাইবার পর কুটনো কুটিতে বসিল। সূর্য আড়ালে যাওয়ার আগেই তাহার কাজ শেষ হইয়া যাইত। রতনও কয়েকদিন আসা যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, নতুবা তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া সময়টা কাটিত। এখন কিন্তু এই গরমের সময় ফসল কাটা, বীজ বোনার কাজ নাই, তাই শেষ পর্যন্ত গম বাছিতে বসিত। তবু তো সূর্য পশ্চিমের মাঠে ধীরে ধীরে মিলাইবার আগে একটু করিয়া দেখা যাইত। ইহার পরে বলদগুলিকে জল দিয়া যেমন তেমন করিয়া দু কলসী জল আনিত।

বাছুর খোঁজার ছুতায় পাড়ায় দুই এক চক্কর ঘুরিয়াও আসিত। এইভাবে এটা ওটা করিয়া দিন তো কাটিয়া যাইত। কিন্তু হতভাগা রাত্রিও শত্রু হইয়াছে। দিনের বেলায় তো ছোটখাটো কত কাজে লাগিয়া থাকিত, কিন্তু রাত্রিতে কি করা যায়? স্বপ্নে সে দেখিত, সেই অষ্টমীর মেলায় দেখা কি সুন্দর সাজানো মূর্তি (কাণজী) নাড়া-চাড়ায় হাঁটু পর্যন্ত ভাঙিয়া নিরুপায় হইয়া পড়িয়া আছে। জীবী বলিত, 'আমি তোর এই দশা করেছি।' ও তখন এইসব পাগলের মতো প্রলাপ বকিতে থাকিত। মূর্তি যেন বলিত, 'পাগলী তুই আমাকে ভুলে যা, আমাকে ক্ষমা কর, আর এই…' আর বলিতে বলিতে এক কাঁধ ভাঙা তোবড়ানো মুখ মূর্তির দিকে হাত বাড়াইয়া বলিত, 'যে এর দিকে মন লাগাও, ও যা বলে তাই তোমার করা উচিত। ওর কৃপাতেই তোর জীবন চলবে। আমার কাছে তোর কিচ্ছু নেই। তোর মন থেকে আমাকে সরিয়ে ফেল।' এই ধরনের উদ্ভট কথা ভাবিতে ভাবিতে অর্ধেক রাত শেষ হইয়া যাইত। ঘন্টাখানেক চোখ বন্ধ করিতেই খেতের ধারে ঝুপড়ি হইতে মোরগের আওয়াজ গত জন্মের শত্রুর মতো জীবীর কানে পৌঁছাইত। তারপর তো জীবী আর চোখ বন্ধ করিতে পারিত না—চোখ লাগিতে না লাগিতে ভোর হইয়া যাইত। আবার আর এক চাকার আওয়াজ শুনিয়া আর একটি দিন শুরু হইত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেক কাটিয়া গিয়াছে। লোকের ঘরে ঘরে কাঠের স্তূপ জমা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবী দেখিতেছে কাণজীর আঙিনা খালি পড়িয়া আছে। গাঁয়ের আবর্জনা সব খেতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। বড় ভাইয়ের চেয়েও জীবীর ভাবনা বেশি হইল—'আচ্ছা ওকি আসবে না?'

তারপর একদিন এইরকম একটা চিঠি আসিল। সারা গাঁয়ে একমাত্র

ভগতজীই লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ। কাণজী তো বিদেশে। আর মহাজনের এ রকম বেকারের চিঠি পড়িবার সময় নাই। চিঠির কথা শুনিয়া গাঁয়ের এক চতুর্থাংশ লোক ভগতজীর বাড়িতে জমায়েত হইল। গাঁয়ের লোক-সংখ্যা বাড়ার পর যদি কেহ ভিন গাঁয়ে গিয়া থাকে তো সে কাণজী। হাঁ আর একজন ঠাকুরও গিয়াছে। তবে তার চিঠি তো কদাচিৎ আসে। আর যদি না আসে তবে তার বাবা কি জানি কখন গাঁয়ে আসে আর চিঠি পড়াইয়া নিয়া চলিয়া যায়। কাণজীর বড ভাই তো কেহ জিজ্ঞাসা না করিতেই 'কাণার চিঠি এসেছে, ভগতজীর কাছে পডাতে নিয়ে যাচ্ছি, কি লিখেছে, কি জানি,' এরকম বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সারা গাঁয়ের লোক শুনিলে উত্তম, কিন্তু জীবী যদি শুনিয়া থাকে তবে আরো ভাল। নিজের ঘরের ছাতের নীচে দাঁড়াইয়া ও দেখিতে লাগিল যে ভগতজীর ঘরে এত ভিড জমিয়াছে যেন (কাণজীর) চিঠির দর্শন এক দুর্লভ বস্তু। ওর কান তো ভগতজীর ছাত পর্যন্ত যেন খাডা হইযা রহিল। আর লোকের ভিড যদি এত বেশি না হইত তবে এই অত্যধিক নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রত্যেকটি কথা ও শুনিতে পাইত। ভগতজীর কি আর খেয়াল হইবে, না তাহাকে বলাই যায়, যে তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ুন।

বড় ভাইয়ের বক্‌বকানি হইতে ও এটুকু বুঝিল যে কাণজী আসিবে না।

গাঁয়ের লোক হয়তো কানুর নিন্দা করিতে লাগিল—নয়তো 'ভাল নোকরি (চাকুরি) মিলেছে তা এখানে খেতের কাজেই বা কি এমন লাভ হতো?' এই বলিয়া সব গুজব রটাইতে লাগিল।

দাদার হাঁক ডাক শুনিয়া জীবীরও হুঁশ হইল। ঘাবডাইয়া গিয়া দাদা বলিতেছিল—'ভগতজী আজই চিঠি লিখে দাও, আমার মজুর রাখার দরকার নাই, তার টাকাও চাই না। যেমন অবস্থায় আছে, তেমনি সোজা উঠে বাড়ি চলে আসুক।'

জীবী ভাবিল আমিও কি লিখে দেব যে 'জীবী মরতে বসেছে, যদি মুখ দেখতে চাও তো দেখে যাও' আর তাহার বুক ধডাস করিয়া উঠিল যেন সে কাণজীর পায়ের শব্দ শুনিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্তে তাহার জ্ঞান হইল যে সে কাহাকে দিয়া লিখাইতেও পারে না, আর সে আসিবেও না। তাহার চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে

চলিয়া গেল। তাহার হৃদয় যেন ক্রন্দনের ভারে বলিতেছিল—'এত নিষ্ঠুর!'

কিন্তু দাদার মতো জীবীরও তখন বিশ্বাস ছিল যে কাণজী আসিবে। ও দিকে সময়ও তাহার কাজ করিয়া যাইতেছিল।

যৌবনের নেশায় জল বহনকারী যুবতী মেয়েদের মতো আসে মদমত্ত মেঘ। পশ্চিম হইতে পূর্ব দিগবলয়ের ঢালু দেশে নামিয়া যায়। কখনও দুই চার ভাগ একত্র হইয়া যায়, কখন আকাশকে ঢাকিয়া ফেলার কথা বলিতে বলিতে দুই হইতে চার ভাগে ভাগ হইয়া যায়! কখনও সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রদেশে চলিয়া যায়। কখনও কখনও রাত ও দিন এমনি হইয়া থাকে যে আকাশ মণ্ডল দর্পণের মতো স্বচ্ছ হইয়া থাকে। যদি কোথাও কোথাও ছোট খাট পরিবর্তন হয় তবে আকাশ যাহারা দেখিতে পায় তাহারা ভগবান।

আকাশের ব্যাপারে জীবী মাথা ঘামাইতেছিল না। তাহার তো ঐ পথেই কাজ ছিল। তাহার বিবর্ণ দেহ ও কোটরগত চক্ষু দেখিয়া মনে হইত যেন উহার যৌবনের দীপ্তি ও কটাক্ষের আলো সব ঐ পথেই খরচ হইয়া গিয়াছে।

অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঈশান কোণ হইতে এক রুপালি মেঘ বাহির হইল। বাড়িতে বাড়িতে তাহা আকাশে পৌঁছিল। পার্শ্বে ফুলিতে লাগিল এবং মেঘ হইতে অন্য মেঘ বাহির হইল। দুই দিকই ঘিরিয়া লইল। লোকের উল্লাস বাড়িতে লাগিল। 'আজ উহারা অভিযানে বাহির হইয়াছে, অবশ্য বর্ষা হইবে'—এরূপ চীৎকার শোনা গেল। আর হইলও তাই। কোন মায়াবী রাক্ষস যেন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ভয় দেখাইতেছিল। এখন গম্ভীর গর্জনে আকাশ ঘিরিয়া ফেলিল। রুপালি মেঘ ধূসর রং হইয়া পরে দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ কালো রঙে রঙিন হইয়া গেল। অন্ধকার নামিয়া সমস্ত ধরণীকে ঢাকিয়া ফেলিল। গর্জন করিতে করিতে মেঘ হুঙ্কার করিল। আর এই অভিযানের ফলে ক্লান্ত ধরণীর উত্তাপ মানুষের ঘামের মতো তরতর করিয়া পড়িতে লাগিল।

লোকে নিদ্রার ক্রোড়ে রহিয়াছে এমন সময় আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পর মুহূর্তেই দিকসমূহ দীপ্ত করিয়া এক বিদ্যুৎ রেখা সোজা পৃথিবীর উপর আসিল এবং এমন জোরে উপর দিকে চলিয়া

গেল যেন আকাশ বিদীর্ণ হইল। মেঘ যেন ভাঙিয়া পড়িল আর তাহাও এতদূর যে বারান্দায় বসিয়া বসিয়া আনন্দবোধ করিতে করিতে কোনও কোনও কিষাণ পড়শিকে ডাকিয়া বলিল—'অমুক ভাই। প্রথম বর্ষণেই ধান বুনিয়া দিব।'

আর এই কথা সমগ্র গ্রামে আনন্দ বিতরণ করিল। কিন্তু কাণজীর দাদার নিকট ইহা শোক ও ক্লান্তিই আনিল। যে দিন হইতে কাণজী হাল জুতিতে আরম্ভ করিল সে দিন হইতে তো সে নিজে কোনদিনই লাঙল জোতে নাই। এই কারণে সে আজ ঘাবড়াইতেছিল। আর এইজন্যই কাণজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল—'কার ভাই, আর কারই বা কি? শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছেড়ে কাদায় নামতে কে আসবে?'

পরদিন রাত্রে বর্ষা বন্ধ হইয়া গেল। আকাশের ভয়ংকর মূর্তি দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল যে তারাগুলি তাহারা শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া —'পৃথিবীতে কি কি বিপদ ঘটিয়াছে, দেখি তো? চারিদিকে একটু চাহিয়া দেখি পৃথিবীর উপর কি কি বোনা হইতেছে?' এই বলিয়া ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতেছে। সকাল হইতে না হইতে মাথার উপরে আকাশের এই নাটক মিলাইয়া গেল।

পৃথিবীর রংও আজ বদল হইয়া গেল। পাখিরাও শীঘ্র উঠিয়া প্রভাতী গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। শান্তি ভঙ্গ হইবে ভয়ে বাতাসও থামিয়া গিয়াছিল।

তথাপি আজও প্রকৃতিকে দেখিয়া এমন মনে হইতেছিল যেন ঝটিতি স্নানের পর মুক্ত কেশ হইতে জল বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে এমন একটি ললনা ভক্তিভাবে নত হইবার ভঙ্গীতে নীরবে প্রার্থনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া আছে। পূর্বদিকের গবাক্ষে আসিয়া সূর্যও বুকভরা জলে আচমন করিতেছে, তখন কি আর পৃথিবীর হৃদয়ের কথা প্রশ্ন করিতে হয়? সমস্ত পরিবেশই যেন কি এক অদ্ভুত সুগন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল।

খুব সকাল হইতে গ্রামবাসীরা সকালে মোড়লের বাড়িতে একত্র হইয়াছিল। 'কুসুংবা' লইয়া নববর্ষের উদ্‌ঘাটন করার পর সকলে নিজের নিজের বাড়ি আসিয়া হল তৈরি করিল। কুমারীদের শুভ স্পর্শ লইয়া ঘাড়ে বড় বড় ঘন্টা লাগাইয়া মধুর ঝংকার করিতে করিতে বলদ আগে

আগে চলিয়াছে, পিছনে পিছনে কৃষক খেতের দিকে চলিয়াছে। পিছনে রহিয়া গিয়াছিল বড় ভাই, সেও, নরসিংহ মেহতার ছোট বলদ গাড়ির মতো বলদ তাগড়া হইলেও তাহার গলায় ঘন্টিতে আওয়াজ ছিল না, লাঙল তৈরি করিল। রতনের অপটু হস্তে তিলক পরাইয়া লাল সুতো বাঁধাইল। তাহার দ্বারা শুভ কর্ম করাইয়া পাথরে ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে ঘর্ র্‌-র্ আওয়াজ করিয়া খেতের দিকে চলিতে লাগিল। পাছে অমঙ্গল হয় সেই ভয়ে এতক্ষণের নিরুদ্ধ অশ্রু, হল যুতিবার সময় তাহা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রথম সূত্রপাত কূয়োর খেতেই হইয়াছিল, এ জন্য স্বভাবতই জল ভরিতে আসিয়া জীবীর নজর তাহারই উপর পড়িল। সে একবার ইহাও ভাবিল—'কোথায় তাহার (কাণজীর) হাতে ধরণীকে ঠেলিয়া দলিয়া চলিতে চলিতে বলদের গমন, আর কোথায় দাদার হাতে পায়ে গুণিতে গুণিতে বলদের চাল। দুদিনের মধ্যেও যদি এই জমিতে লাঙল দেওয়া হয় তবে যথেষ্ট।' অনেকক্ষণ তাকাইবার পর জীবীর হুঁশ্ হইল। এক ভারী শ্বাস লইয়া নিজের জলন্ত হৃদয়কে বলিতেছিল—'পুরুষ হলেও এক আধ দিন লাঙল নিয়ে সাহায্য করতে যেতাম। কিন্তু তুই তো মেয়ে! এখন প্রাণে জ্বলে পুড়ে কি হবে?' জল ভরিয়া চলিতে চলিতে আবার কাণজীর দাদার পানে চাহিয়া নিশ্বাস চাপিয়া বলিল—'মূর্খ আর কাহারও কথা নয়, কিন্তু নিজের দাদার খাতির তো করা উচিত ছিল।'

তথাপি এতদিন পরেও জীবী আশা ছাড়ে নাই। 'যদি ওখানেও বর্ষা হয়ে থাকে, তবে কাল তো অবশ্য আসবে।'

আর কাল আসিবার কিছু দেরি আছে কি? কিন্তু মানুষ তাহার আশাতন্তুকে আগামীকল্য দিয়া জুড়িতেও জানে। এইভাবেই তো সে বাঁচিয়া থাকে। এ ছাড়া জীবন কাটাইবার রাস্তাই বা কোথায়?

কিন্তু যখন বাস্তবিক চাষের সময় চলিয়া গেল আর ধান বোনাও শুরু হইল, তখন কাণজীর ফিরিবার আশাই জীবীকে ছাড়িতে হইল।

কখনও কখনও তাহার মনে হইত, 'যখন হৃদয়ের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে, তখনই প্রাণ বাহির হইবে।' ইহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া নিজের উপর রাগ করিয়া বলিত—'যদি তুই মরিয়াই যাস্ তবে তো সমস্ত ঝঞ্ঝাট

মিটে যায়।'

কিন্তু না মরিলেও ইহার পর তাহাকে তো মৃত্যুর পথেই চলিতে হইল। কাহারও সঙ্গে কথা বলা নয়, কারো সঙ্গে চলা নয়। যদি কখন হাসিত তবে তাহা বাধ্য হইয়াই।

ইহা দেখিয়া ধূলা তো মনে করিল যে উহার উপর সেই তুক্ কাজ করিতেছে। তজ্জন্য সেও অন্যমনস্ক হইয়া 'কি করিতে হইবে' এই প্রশ্নের ভাবনায় থাকিত।

দুইজনের আজকালের আচরণ দেখিয়া বুড়ির মনে অন্য চিন্তার উদয় হইল। তাহার মনে মনে এই চিন্তা উদয় হইল যে, এখন ইহাদের দুইজনের মন একপ্রকার পরস্পর হইতে সরিয়া গিয়াছে। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনাও হইত—'আরে যতই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হোক, কথাবার্তা তো হবে। কিন্তু এরা তো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

কোনও বুড়ি নিজের অভিজ্ঞতা মতো বলে—'কিন্তু তুই তো ঘরের কুকুরের মতো ঘরে ঢুকেই থাকিস। দু ঘণ্টা বাইরে থাকৃতিস তো অন্তত ওদের খাবার চাইতে হত। তখন না দিয়ে পারত না?'

বুড়ি এরূপ করিয়াও দেখিল। কিন্তু পরিবর্তন হইল না। ধূলাও খাবার চাহিল না, জীবীও না বলিলে খাবার দিতে আসিল না।

জীবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ধূলা নিজের হাতে লইয়াই খাইয়াছে। জীবীর উপর রাগ করিয়া বুড়ি বলিল, 'আমি বেঁচে আছি তাই, আমি যদি কোন কালে মরে যাই, তবে তোমার ঘর-দোর কে দেখবে? কি করে চলবে?'

গাল ফুলাইয়া জীবী জবাব দিল, 'চলবে, যদি চলতে হয়।'

'এমন কথা বলিস কেন রে? ঘর করতে এসেছিস্ না এইভাবে খালি ঝগড়া করতে এসেছিস্?' এই বলিয়া কোমরে হাত রাখিয়া বুড়ি জীবীর দিকে তেরছা চোখে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু জীবীর যেন আর ঝগড়া করিবারও সামর্থ্য ছিল না। নিরাসক্তভাবে বলিল—'মা ঠাকরুন, দয়া করে আমার পিছনে আর লেগো না।'

কিন্তু এরূপ করিয়া বলিলে শাশুড়ির রাগ আরও বাড়িয়া যায়।—'না

তো কি ? বেচারার এখানে কোঁদরা[১] রুটি খেতে হচ্ছে না ?'

জীবী উঠিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকিল —'নাও একা একা বকতে থাকো।'

'আমি দেখি কি করে তুই কিছু না করে থাকিস। একটু তিল বোনার ব্যবস্থা হোক। আমি দু'মাসের জন্য বাপের বাড়ি যাই। দেখবো কোন শাশুড়ি তোকে রান্না করে দিয়ে যায় ?'

বিড়বিড় করিতে করিতে তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে ব্যবস্থা এত বেঠিক ছিল যে তিনি ঝগড়ার জন্য কোনও উপলক্ষ খুঁজিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই বিড়বিড়্ শব্দ জীবীর কানে ঠক ঠক করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কানের দরজা বন্ধ ছিল—শরীরে প্রাণ যেন ছিলই না। আজ বুড়ির পুরা জ্ঞান হইল যে, যতক্ষণ বধূকে দা'য়িত্ব না দেওয়া যায় ততক্ষণ তাহার মন কাজকর্মে বা ঘরে কোথাও বসিবে না।

এতদিনে বুড়ির ঘর হইতে বাহিরে যাইবার অবসর মিলিল। জীবীর বুড়া বাপ মারা গিয়াছে, বুড়ি শোক প্রদর্শনের জন্য যাইবার আয়োজন করিল। পিতার মৃত্যুতে কাঁদিবার জন্য জীবীরও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শাশুড়ির ভয় ছিল—'এক তো সৎ-মার ইচ্ছা ছিল না, তাতে আবার ওর মনও চাইছে না। মেয়েদের মন ফুসলাইতে কি আর দেরি হয় ? তাদের জাতিতে মেয়েদের পুনর্বার বিবাহের কোনও বাধা ছিল না। আর আমরাই বা কোন্ পয়সা খরচ করে কিংবা মেয়ে বদল দিয়ে এনেছি যে জাতির মধ্যে নালিশ করতে যাব ?' এই জন্য শাশুড়ি সমস্ত কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে থামাইবার জন্য বলিল, 'না বাপু, তোর যাওয়ার কোন দরকার নেই। এই তো আমি যাচ্ছি, এতেই সব কিছু হয়ে যাবে'—এই বলিয়া জীবীকে শান্ত করিবার জন্য পরে বলিল—'একবার আমাকে সেখানে হয়ে আসতে দে, তোর মাকেও বলে কয়ে বুঝিয়ে আসব। তুই পরে যাবি। আর একমাস পনেরো দিন থেকে আসবি।'

জীবীকে স্বীকার করিতেই হইল। নিরুপায়, কারণ স্বীকার না করিলেও কে পা বাড়াইতে দিবে।

১ নিম্ন স্তরের শস্য, গো-মহিষের খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়

বুড়ির পক্ষে ইহা তো এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো হইল। তাহার ভাইয়ের ঘরও ঐ দিকে, কিছু দিন সেখানে কাটাইয়া আসা যাইবে। আর এই ভাবে বৌ বেটা একা থাকিলে ঝগড়া মারামারি করিয়া পরে কথা বলিবেই। এই ভাবিয়া বুড়ির ফোকলা দাঁতে হাসি ফুটিল। মনে মনে বলিল, বুড়িকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। এখন তো ধুলা মাকে ছাড়া খায় না। পরে কিন্তু মার হাতের রান্নাও পছন্দ হইবে না।

ছোট ছেলে সঙ্গে যাইতে চাহিল। বুড়ি ভাবিল, একে তো নেওয়াই ঠিক, এখানে এর কাজই বা কি। এই মনে করিয়া ওর যাওয়ায় আপত্তি তুলিল না। বৌ-বেটাকে আলাদা আলাদাভাবে সব বুঝাইয়া দিয়া দুই জনের মিল করিবার উদ্দেশ্যে একদিন বুড়ি রওনা দিল।

শাশুড়ির সঙ্গে আসিতে আসিতে রাস্তায় যে সব খেত পড়িল তাহারা জীবীর নিজের বন্ধু। সৎ-মায়ের হইলেও যিনি মা ছিলেন তাহার মতোই নিজের সৎমা, ভাইবোন ইত্যাদি সকলকে অনেক কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলা হইল না। খেতের নিকটে আসিয়া গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। শুধু এইটুকু বলিল—'আমার মা, আমার ভাইবোন সকলকে বলবেন যে, জীবী তোমাদের অনেক অনেক…' কান্না আসিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিল—'বার মনে করে' বলিতে পারিল না।

শাশুড়ি চলিয়া যাওয়ার পর জীবীর বাড়ি জঙ্গল হইতেও ভয়ংকর মনে হইতে লাগিতে লাগিল। এ কথা অবশ্য ভাল যে রতন আবার আসিতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু একদিন ধুলা তাহাও বন্ধ করিয়া দিল। রতনকে হাতে ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে ধাক্কা দিতে দিতে ভাঁটার মতো চোখ করিয়া বলিল—'খবরদার আবার যদি এই ঘরে আসিস্।'

জীবী না বলিয়া পারিল না, 'এই শিশুর ওপর শোধ নেবে নাকি?'

ধুলার এই কথা যতই খারাপ লাগুক, জানি না কেন এখন তাহার জীবীকে মারিবার সাহস হইল না। উদ্‌গত ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া সে এইটুকু বলিল—'এ পর্যন্ত শোধ নিলাম কই? এখন নেব।' আর জীবীকে দিন দিন শীর্ণ হইতে দেখিয়া এক তাক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিল—

'তোমার এত তাড়া কিসের?'

সে বুঝিয়াছিল যে জীবীর উপর ভূত ধরিয়াছে। জীবীর শরীরও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ধুলার কাছে উহার চাল চলন মৃত ব্যক্তির মতো মনে হইত। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, 'ঘরের জন্যে এই ষাঁড়ের আর কোনও টান নেই।' আর নানাভাবে তুকতাকের প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত—'শালা খেতে হয় তো খেয়ে যাও, যাতে নজরের সামনে না পড়ে।'

বিষময় জীবন

শ্রাবণ মাসের সজল মেঘ আসিয়াছে, ক্ষীণ ধারায় বৃষ্টি হইয়া চলিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণের জন্য সূর্য দেখা দিতেন আবার মেঘে লুকাইয়া যাইতেন। জলে গাঁয়ের গলিতে আবর্জনা স্তূপ জমা হইয়াছিল। অন্যদিকে সবুজে ভরা খেত বাতাসের বেগে একদিক হইতে অন্যদিকে ঢলিয়া পড়িতেছিল। যে দানা তৈরি হইতেছিল তাহার উপর ঝাপটা মারিবার ইচ্ছায় দূর দূর হইতে তোতা পাখি এবং কাক খেতের উপর আঘাত করিতেছিল।

এই মাস জীবীর জীবনে একদিন স্মরণীয় হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আজ ও গত বর্ষের ঐ দিনের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। গত বৎসর আজকার দিনে তাহার হৃদয়ে আশার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আজ যেন আশা ছাই হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া পাগলের মতো মাঝে মাঝে সে নাগরদোলার মিষ্ট গন্ধ ভরা হাওয়া খাইতেছে, আবার দিনভোর চোখ দিয়া জল ফেলিতেছে, আবার একঘণ্টা মনে মনে কাণজীর সঙ্গে কথা বলিতেছে, আবার একঘণ্টা বোবা হইয়া বসিয়া আছে—এই ভাবে সময় কাটাইতেছে। অনেক রাত হইলে মেলা হইতে ফিরিয়া যে সব যুবতীরা গীত গাহিতেছে তাহাও শুনিবার জন্য বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কাণজী আসিয়া থাকিলে ততক্ষণ তো দেখা দিবে। উহার সারা রাত কান্নাতেই কাটিল।

সকালে সে গোবর ফেলিতে যাইতেছিল এমন সময় একজন শহরের লোক সামনে দেখা গেল। তাহার মাথায় গোলাপী পাগড়ি বাঁধা ছিল। রঙিন কামিজের উপর শিকারী কোট আর এরূপ মিহি ধুতি যে ফুঁ দিলেই উড়িয়া যাইবে। আর সে ধুতি ছিল বকের পাখার মতো শাদা। হাতের ছাতায়ও বন্ধ করার কল ছিল। বর্ষাকালের সময়ে তাহার পরনে বুট। মুখে লাগা বিড়ি অথবা এক পয়সা দামের সিগারেট। যদি শরীরের গঠনে প্রভেদ

না থাকিত তবে জীবীর হৃদয় আনন্দের ভারে লাফাইয়া উঠিত। কিন্তু সে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

যুবক বুটের চডমড চডমড আওয়াজ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সে জীবীর দিকে এক নেশাভরা দৃষ্টি হানিল, তারপর খোলা রাস্তায় অগ্রসর হইল। যে কোনো ব্যক্তি তাহাকে দেখিলে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিল। জীবী কান লাগাইয়া শুনিতেছিল। 'নানা, এসে গেছ?' 'খুশিতে আছ তো?' 'কাণজী আর তুমি একই জায়গায় ছিলে, না আলাদা?' যুবক হাসিয়া জবাব দিতেছিল আর মাঝে মাঝে সিগারেট টানিয়া অন্য পাড়ার দিকে ঘুরিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু জীবীর মন অধীর হইয়া উঠিল—'ওর সঙ্গে কবে দেখা হবে, কোথায় দেখা হবে, আমার জন্য কোনো না কোন খবর নিশ্চয় নিয়ে এসে থাকবে। যদি না পাঠায় তা হলেও বিশেষ বলবার কিছু নেই। তার অবস্থা তো আমি বুঝতে পারব।'

বিচার তরঙ্গে হারাইয়া গিয়া জীবী কখন বাড়িতে ঢুকিল আর কতক্ষণে গোবরের ঝুড়ি ভরিয়া বাহিরে গেল ইহা যদি কেহ দেখিতে থাকিত তাহা হইলেও সে স্বয়ং না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিত না যে জীবী নিজের হাতেই গোবর ভরিয়া বাহির হইতেছে।

কিন্তু এরূপ নিপুণ দৃষ্টি লোকে কতক্ষণ দিতে পারিত। উনুনে ডাল চড়ান। জলের কলসীগুলি শূন্য।

উদ্বেগে পড়িয়া জীবী যখন ভাবিল তখন নিজেকেই মূর্খ মনে হইল। বিদেশ হইতে আসিয়া কেহ কি তখন তখনই চলিয়া যাইবে। মাসখানেক দিন পনের অবশ্যই থাকিবে। জল ভরিবার সময় সে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

পরের দিন তো নানা নিজে ভগতজীর বাড়িতে আসিয়া বসিল। সে কাণজীর বিশ টাকার চাকরি, নিজের পঁচিশ টাকার আর তাহা ছাড়া শহরের জীবনের কথা জোর গলায় বলিতেছিল। বেচারী জীবী! হৃদয়ের সম্বল নয়নের মণি—তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। একবার আঙিনায় বাছুর বাঁধিতে যাইতেছিল তখন নানাকে বলিতে শুনিল—'এই তো ধূলিয়ার নতুন স্ত্রী না? কি নাম? জীবী নাকি?' আর নিজের দৃষ্টি

পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিল—'কি জীবী বৌদিদি ধূলা কি বাড়িতে নেই ?'

জীবী একটু হাসিয়া বলিল—'না।'

ভগতজীকে বসা দেখিয়া সে সামলাইয়া লইল। আঁচল টানিয়া ঘোমটা দিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

চারদিনের দিন গিয়া নানার সঙ্গে দেখা করিবার অবসর পাওয়া গেল। তাহাকে ভগতজীর বাড়ি হইতে উঠিতে দেখিয়াই জীবীও তাহার পিছনে পিছনে খেতের দিকে চলিতে লাগিল। অর্ধেক রাস্তা পৌছাইতেই উহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু বাস্তবিক নানাই ধীরে ধীরে চলিতেছিল। জীবীই কথা শুরু করিল—'নানা ভাই, শহর থেকে এসেছ. সেখানকার কিছু খবর তো দাও !'

'তোমাকে বলব না তো কাকে বলব জীবী বৌদি' এজন্যই তো তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি !' এই বলিয়া জীবীর দিকে তাকাইয়া এমনভাবে হাসিল যেন অনেক দিনের জানাশুনা। আশ্চর্য হইয়া জীবী বলিয়া উঠিল—'আমার সঙ্গে, আমাদের তো জীবনে এই প্রথমবার দেখা।'

'ঠিক, ঠিক, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে পরিচয় তো এখানে আগেই একবার হয়ে গেছে।'

জীবী প্রশ্ন করিল, 'কি ভাবে ?'

উত্তর শুধু তাহারই কানে যায় এরূপ মৃদুস্বরে বলিল, 'জীবী বৌদি, কাণজী তোমার কথা খুব মনে করে। যেদিন এখানে রওনা হচ্ছিলাম তার আগের রাত্রিতেই সে আমাকে তোমার কথা বলছিল।'

'কি বলছ ?' জিজ্ঞাসা করিতে জীবীর দম যেন আটকাইয়া গেল। বিস্ফারিত চোখে ও হৃদয়ে জিজ্ঞাসা যেন উথলাইয়া উঠিতেছিল।

'আগাগোড়া কাণজীর মতো লোকের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল. একথা বললে সে স্বীকার করবে না কিন্তু সে রাতে সে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল' এই বলিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিয়া একটা মোড়ক বাহির করিয়া জীবীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—'তোমার জন্য এই দুটি চুড়ি পাঠিয়েছে—প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ।'

নেব কি নেব না ভাবিতে ভাবিতে জীবী হাত বাড়াইল। জিজ্ঞাসা

করিল, 'আর কিছু বলেছিল কি? ফুর্তিতে আছে তো? কত দিনে আসবে তা কিছু বলেছে কি?' দুই রাস্তার মোড়ে আসিয়াই জীবী একসঙ্গে এই প্রশ্ন করিল।

কিন্তু নানা ঐ শেষ প্রশ্নেরই জবাব দিল—'আসবার কোনো পাকাপাকি কথা তো হয় নি, কিন্তু দেওয়ালির সময় এসে পড়বে। তার ছুটি পাওয়ার উপর সব নির্ভর করে।'

জীবীর নানা প্রকারের অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গেল ধূলা রাস্তা দিয়া যাইতেছে। 'এখন তো কিছুদিন আছ। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও', বলিয়া যাইবার জন্য সে পা বাড়াইল।

ধূলার চোখ তো টাটাইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই নানা বলিয়া উঠিল—'কি ধূলা ভাই, তুমি আর এখন কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলবে? এখুনি তো জীবী বৌদিদিকে বলছিলাম, ধূলা ভাই বুঝি এখন আর এটা ওটা খাওয়ায় না?'

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ধূলা বলিল, 'হ্যাঁ ভাই খাবার তো বাসিও খেতে হয়'—আর কবে আসিয়াছে, কি খবর এইসব ভাসা-ভাসা প্রশ্ন করিয়া ঘরের দিকে চলিল। নানার ঘরও নিকটেই—ঐ রাস্তার পরেই। ঘরের দিকে মোড় ফিরিবার আগে, প্রথম তো জীবী যে পথে গিয়াছে সেই দিকে চাহিল, কিন্তু সে ততক্ষণে রাস্তার মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। ধূলা ঘরে আসিয়া দেখে জলের কলসী খালি পড়িয়া আছে। উনুনে আগুনের চিহ্ন নাই। হুঁকা হাতে করিয়া আগুনের জন্য প্রতিবেশীর ঘরে গেল। কল্কিতে আগুন সাজাইতে সাজাইতে বলিল, 'এ ঘরের হালচাল দেখতে হয়। কলসীতে একফোঁটা জল নেই, আর এ সময় বেরিয়েছে ঘাস আনতে। ও কি মনে করে গেল?' বিড়বিড় করিতে করিতে বারান্দার উপর আসিয়া বসিল। ওর মনে বিশ্বাস হইল যে ঘাস আনিবার বাহানা করিয়া কাণজীর খবরাখবর নিতেই ও নানার পিছনে ছুটিয়াছে। ওর হাত সুড়সুড় করিতে লাগিল আর চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিল।

কিন্তু আজ জীবীও খেত হইতে ফিরিবার সময় পিঠ ও মন দুই-ই শক্ত করিয়া আসিয়াছিল। 'কি, ঘাস, আনতে গিয়েছিলি' প্রশ্ন করা হইল আর

পিঠে লাথি পড়িল। জীবী ঐখানেই বসিয়া পড়িল। ধূলা লাঠি সামলাইয়া লইল। কিন্তু আজ এত জোরে মারিয়াছিল যে, যে জীবী কোনোদিন টুঁ শব্দটি করে না, সে-ও আজ চীৎকার করিয়া কাঁদিল। ভগতজী ঘরে ছিলেন না। আর অন্য পড়শিদের কি গরজ যে তাহারা ছুটিয়া আসিবে? হীরা ঘরে থাকিলে আজ না আসিয়া পারিত না। আর আসিয়া পড়িলে ছাড়াইবার ছুতায় ধূলার পিঠে দুই এক ঘা বসাইয়া দিত। শেষ পর্যন্ত মনোরের বুড়ো বাবা আসিল। হীরার বোন নাথী আর কংকুও আসিয়া পড়িল। অনেক কষ্টে ধূলার হাত হইতে চ্যালাকাঠ কাড়িয়া লইল। আর ধাক্কা দিয়া উহাকে বারান্দায় সরাইয়া দিল।

যদি গোবরের গাদায় পড়িয়া যাইত, খাট হইতে যদি উঠিতে পারিত তবে জীবী ঘণ্টা খানেকের জন্য হইলেও একবার উঠিত, রান্নার যোগাড়ও করিত। কিন্তু আজ ওর হাড়ে হাড়ে ব্যথা। তবু সন্ধ্যার সময় সে একবার উঠিয়া বসিল, জল না থাকা সত্ত্বেও জলের ঘড়া নিয়া গেল না, ঘাস আনিবার জন্য খেতে কিন্তু গেল।

সত্য কথা বলিতে কি, ও ঘাস আনিতে যায় নাই। ও আর কিছু আনিতে গিয়াছিল। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিল, সামনে একটা ছুতো দেখাইবার জন্য ঘাসের পোঁটলা বাঁধিয়া রাখিল। নীচু দিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে ঘরের মধ্য হইতে নানার কথা বলার শব্দ জীবীর কানে পৌঁছিল। কিছু একটা মনে পড়িতে সে কাপড়ের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দেখিল। পুরিয়া বাহির করিল, আর নানার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া বলিল, 'নানা ভাই ঘরে আছ?'

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নানা বলিল, 'কে রে?' সে জীবীকে দেখিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল। মুখ নীচু করিয়া বলিল, 'আমার জন্যই তোমার এই মার।'

'না ভাই তোমার জন্য কিছু নয়'—এই বলিয়া জীবী চোখের জল চাপিয়া রাখিল। 'এই মোড়ক তোমার বন্ধুকে দিও' বলিয়া নানার হাতে উহা দিল। আর বহু কষ্টে মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল. 'আর বোলো, যে যখন বৌ আসবে, আমার নাম করে তাকে এটা যেন পরতে দেয়।'

'কিন্তু এতো সেই জিনিস, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম।'

'তুমি বোলো, আমি নিজে থেকেই এই কথা বলে এটা ফেরত দিচ্ছি', আর জীবীর চোখ এত তাড়াতাড়ি একবার খুলিতেছে একবার বন্ধ হইতেছিল, জীবীর দিকে চাহিয়া নানা বুঝিতে পারিল না জীবী হাসিতেছে না কাঁদিতেছে। জীবী আবার গলা সাফ করিয়া নিল। বলিল, 'আর বোলো যে, জীবী তোমার কথা মনে করতে করতেই'…কিন্তু এ আমি কি বলিতেছি খেয়াল হওয়ায় 'আমি গেলাম' এই কথাটা শেষ করিল না আর কথাটা ঘুরাইয়া নিয়া বলিল, 'আমাদের কখনও দেখা হয়, কি না হয়। একথা তো সেজন্য ওকে অবশ্য বলে দিও…আর অন্য কারণে' পাশ হইতে দুইজন লোককে আসিতে দেখিয়াই হউক, বা অন্য কোনও কারণেই হউক সে পিছন ফিরিল। উছলিয়া পড়া জলে চোখ ঝাপসা হওয়ায় বার দুই সে হোঁচটও খাইল। নানা ওর পিঠের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যে লোকেরা পিছনে আসিতেছিল তাহারা জীবীকে নানার সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়া, 'হায় হায়, বোন, এ কেমন মেয়ে? ঘন্টাখানেক আগে মারের চোটে হাড়গোড় ভেঙে গেল, তবু এরি মধ্যে এসে নানার সঙ্গে কথা বলছে। মারমুখো ধূলিয়া বোধহয় চলে গেছে। নইলে যদি ঠিকমতো আদর করে দিত, তবে জন্মের মতো সব ভুলে যেত। বেচারিকে লোকে তো অমনি দোষ দেয়!' —এই সব বলতে লাগিল।

সকালে মারপিটের পর ধূলা কোথায় গেল, কোথায় খাইল ঠিকানা নাই। কিন্তু জীবী যখন রুটি বানাইতেছিল তখন কোথা হইতে আসিয়া রাগের বশে ওকে ধমকাইতে লাগিল! কেহ নিশ্চয় উহাকে কিছু বলিয়া থাকিবে—তাই সোজা রান্নাঘরে আসিল। জীবী একখানা রুটি সেঁকিয়া উনানের আগুনে ফেলিয়া অন্য দুইখানি রুটির আটা বেলিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় ধূলা উহার বেণী ধরিয়া টান মারিল। আটার থালা যে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। 'দূর হ বেটী, আমার বাড়িতে তুই এক মুহূর্তও আর থাকতে পারবি না—আমি তোর মুখ দেখতে চ'ই না' বলিয়া বারান্দায় টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দিল। যেমন করিয়া গাড়োয়ান বলদের পিঠে চাবুক মারিতে মারিতে চালায় সে রকম করিয়া জীবীর কোমরে লাথি মারিতে মারিতে বলিল, 'দূর হয়ে যা, নাতো আজ রাতেই তোর গলা কেটে তোকে মেরে রাখব। বুঝেছিস্!'

বিদ্যুৎ চমকের মতো জীবীর চোখ দুটি জলিয়া উঠিল। বলিল, 'আয় না; তার আগে আমিই তোকে মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।' ধূলার মুখের গর্জন এবং হাত দুই-ই চলিতেছিল—'আজ তোর জান বার করে দেব। তুই বুঝবি কেমন লোকের হাতে পড়েছিস্।'

পিছনের পাড়া হইতে লোক দৌড়াইয়া আসিল। ভগতজী ধূলাকে মারিতে লাগিলেন—'এর হাতের গরম গরম রুটি খাবি। তোর একলাই বুঝি স্ত্রী আছে? এত মেরেছিস ওকে? যদি ওর কিছু হয়ে যায় তো কাল তোর কি দুর্দশা করি দেখবি! তোকে যদি জেলে না পুরি তো আমার নাম ভগত নয়।'

'নে, মেয়ে, উঠে পড়,' বলিয়া জীবীকে উঠাইয়া নিজের বাড়িতে নিয়া গেল।

অপর কেহ হইলে তো মুখভাঙা জবাব দিয়া বলিত, 'থাম্, থাম্, আমার ঘরের ব্যাপারে তুই মাথা গলাতে আসিস্ কেন?' কিন্তু ভগতজীকে সে ভয় করিত। ওর ধারণা ভগতজী যদি চায় তো সামনের লোককে চোখের আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে—সেজন্য ধূলা চুপ করিয়া গেল।

কোন কোন গাঁয়ের মেয়েরাও ধূলাকে খুব ভর্ৎসনা করিল। অনেকক্ষণ বাদে একজন দুইজন করিয়া তাহারা বাড়ি গেল, আবার জনকয়েক তো ভগতজীর বারান্দায় বসিয়া জীবী যে কাঁদিতেছিল তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

লোকের ভিড় কমিয়া আসিলে হীরার বৌ ধূলাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া শান্ত করিতে করিতে বলিল, 'নাও ভাই ওঠ। সকালেও উনুন জলেনি কোথায় না জানি খেয়েছ? ওঠ আমার ঘরে চল। আমি খেতে দেব। খেয়ে তারপর শোবার জন্য খেতবাড়িতে চলে যাও, মিছিমিছি'···বলিয়া ধূলার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বলিল, 'আরে ওঠ না।'

'না, না, কংকু বৌদি! কেন জোর জবরদস্তি করছ? খাবার তো এখানেও তৈরি করেছে। তুমি যাও আমি খেয়ে নেব।'

কিন্তু কংকুর আজ ধূলাকে বিশ্বাস নাই। কি জানি ঘরে থাকিলে যদি রাত্রিবেলা রাগের মাথায় এদিক্ ওদিক্ কিছু করিয়া বসে। এজন্য ওকে খাওয়াইয়া খেতবাড়িতে পাঠাইয়া দিবার জন্য ও চেষ্টা করিতেছিল। কংকু

ঘরে গিয়া দেখিল একখানা মোটে রুটি তৈরি। সব হাঁড়ি খুঁজিয়া দেখিল। কিন্তু সবই খালি।

বাহিরে আসিয়া দেখিল থামের পাশে তাহার ননদ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলিল, 'নাথী বোন যাও তো, আমাদের বাড়ি থেকে এক বাটি ডাল নিয়ে এস। যাও ভাই, একে খাইয়ে তবে আমি যাব।' বলিয়া আবার ধূলার কাছে গিয়া বলিল, 'নাও ওঠ নইলে আবার টানাটানি করতে হবে।'

ধূলা উঠিয়া দাঁড়াইল। নাক ঝাড়িল, বলিল, 'কিন্তু আমার খিদে এক-বিন্দুও নেই কংকু বৌদি। মিছিমিছি কেন পেছনে লেগেছ?'

'এ এমন বেশি কথা কি? এখানে একখানাই রুটি আছে। ঐ দেখ ডালও এসে গেছে! ভিজিয়ে খেয়ে নাও, আর ওখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। তোমাদের ঝগড়া মারামারিতে সমস্ত পাড়ার লোকের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে।'

বিবশ হইয়া ধূলা খাইতে বসিল। বাটির ডাল থালায় ঢালিয়া তার সঙ্গে রুটি মাখিল। খাইতে না খাইতে চার ভাগের তিন ভাগ গলা দিয়া বাহির হইয়া গেল। হাত ধুইতে ধুইতে বিড়বিড় করিতে লাগিল—'ছাই, আটার মধ্যে বিড়ালে পেচ্ছাব করেছে নাকি? আটা কি কখনও ঢেকে রাখে? সাধে কি আর মারি?'

'হয়েছে হয়েছে! তোমার তো সবই খারাপ লাগবে। এখন বিছানা তামাক যা কিছু নেবার নাও আর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়।'

'কংকু বৌদি, ঘর খোলা আছে?' বলিয়া ধূলা খেতের দিকে চলিল এদিকে ভগতজীর ঘরে এক মজার ব্যাপার হইতেছিল। জীবী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল! ধূলাকে খাওয়াইবার জন্য কংকুর গলা জীবীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ ওর কান্না বন্ধ হইয়া গেল। ওর চোখের চাহনি এমন হইল যেন ধূলার থালায় ও নিজেই রুটি বাড়িয়া দিতেছে। এজন্য হাত বাড়াইতে যাইবে এমন সময় দেখিল ভগতজী সামনে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে দেখিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিবার জন্য হুঁশও নাই। ভগতজীর দিকে চাহিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিয়া উঠিল, 'ভগত কাকা।' তারপরে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভগতজীর কাছে যে যুবকেরা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ভারি আশ্চর্য লাগিল। ভগতজীকে প্রশ্ন করিল, 'এ কি ব্যাপার!' তবু চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিল, 'কাঁদতে হয় নিজের মা-বাপের কাছে গিয়ে কাঁদো। ভগতকাকা কি করবে?' জীবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার ঘরের দিকে চাহিল, আবার মুখ ঢাকিল। কান্না চাপিতে গিয়াই হউক বা অন্তরের আলোড়নের জন্যই হউক, ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আরেক বার উপরের দিকে চাহিতে উহার চোখ দুটি এপাশ ওপাশ ঘুরিতে লাগিল। আর চিলের মতো চেঁচাইয়া সে বলিয়া উঠিল, 'ভগতকাকা। রুটির মধ্যে তো সাংঘাতিক গজ' (এক ধরণের বিষ) কিন্তু 'ব' কথাটা উচ্চারণ করিবার আগেই জীবী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ভগতজী মুহূর্তের জন্য ভাবনায় ডুবিয়া গেলেন, কিন্তু তখনই মনে হইল, এখন চিন্তার সময় নয়, এখন মূর্ছিত জীবীর দেখাশোনা করা বেশী জরুরি। 'দেখ্ তো কি হলো! ও কি অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? ঘরে নিয়ে চল, আমি খাট আনছি।'

ঘণ্টা খানিকের মধ্যে সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। একজন শিয়রে বসিয়া কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি দিতে লাগিল, দুইজন পাখার হাওয়া করিতে লাগিল। ভগতজী নাড়ী ধরিয়া রহিল। পাখার সরসর শব্দ আর এই চারজনের বুকের ধকধকানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই।

কংকু জীবীকে ঘরে আনিয়া শুইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তো এসব দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া গেল। 'হায় হায় ভগতকাকা, ওকে ডেকে আনব, ও তো নানার সঙ্গে কথা বলতে গেছে! ডাকলেই…'

কথার মাঝেই ভগতজী বলিয়া উঠিল, 'এখানে এসেই বা কি করবে।'

কংকু ভিতরে গিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাছুরের মতো ওর পিছন পিছন ঘোরে যে নাথী তাহাকে বলিল—'যা না বোন। ঘরে কেউ ঢুকে পড়বে। আমি এলাম বলে। ঐ বাচ্চা না উঠে পড়ে।'

নাথী তো এমন ভয় পাইয়াছিল যেন বাহির হইলেই কেহ উহার গলা টিপিয়া ধরিবে। বৌদির কোলে মুখ লুকাইয়া আব্দারের সঙ্গে বলিল— 'না, আমি যাব না, আমার ভয় করছে!'

প্রায় অর্ধেক রাত কাটিয়া গেল। তখন জীবী চোখ খুলিল। 'এ কোথায় ও এসে পড়েছে, এরা সব কে,' এই সব খবর লইবার পর, হঠাৎ ওর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। ঝটপট খাটের উপর উঠিয়া বসিতে গেল। হীরার মনে হইল, জীবী ভগতজীর মান রাখার জন্য উঠিয়া বসিতেছে— 'না তুমি শুয়ে থাক ভগতকাকা বাইরে যাচ্ছেন, কিছু হবে না' বলিয়া সে হাত ধরিয়া জীবীকে শোওয়াইয়া দিতে চাহিল।

'না, আমাকে নিজের ঘরে যেতে দাও। আমাকে বাঁধা দিও না' —ভয়ার্ত স্বরে এই কথা বলিয়া জীবী উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপড় জামা ঠিক ঠাক না করিয়াই ও ঘরের দিকে চলিল। ভগতজী না বলিয়া পারিল না—'কিন্তু ঘরে তুই কি এমন লুকিয়ে রেখেছিস্ যার জন্য এত তাড়া? চুপচাপ...'

'আমি তো এখন ভাল হয়ে গিয়েছি। ঘরেই যাব।' বলিয়া জীবী এমনভাবে ঘরের দিকে চলিল যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

'আর কথা কি? তবে ভগতকাকা আমিও এবার ছুটি নিই, খেতে শুয়োরগুলি না জানি কি করছে' বলিয়া হীরা ছুটি নিল।

কিন্তু ভগতজীর তখনও কিছু সন্দেহ ছিল। 'আচ্ছা' বলিয়া হীরাকে যাইতে বলিয়া দিল। কিন্তু ও চলিয়া গেলে ভাবিলেন, হীরাকে বলা হইল না, কিন্তু ওর বৌ যদি আজ জীবীর সঙ্গে শোয় তবে খুব ভাল হয়।

যে কারণেই হউক ভগতজী নিজের খেতে শুইতে যাইতে পারিলেন না। বারান্দায় বসিয়া বসিয়া স্বল্প আলোর ধূলার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিলেন কোনও কিছুতে কখনও যে ভয় পায় না, আজ তাহার মন দমিয়া গেল।

এদিকে ঘরে ফিরিয়া চুলার মধ্যে হাত দিয়া তো জীবীর প্রাণ উড়িয়া গেল। একবার দরজার কাছে যায় আবার ঘুরিয়া আসে। রুটি সেঁকা তাওয়ার দিকে চোখ পড়িল। প্রাণ যেন চোখে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চায়। আবার দরজার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ঝটপট বারান্দার বাহিরে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পিছনে ফিরিতে যাইবে এমন সময় ভগতজীর কাশির শব্দ কানে গেল। ছুটিয়া ঐ দিকে চলিল, কিন্তু ভগতজীর বারান্দার হাতায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে উহার পা যেন ভাঙিয়া পড়িল।

'কি হয়েছে রে জীবী বৌ। এরকম করছিস্ কেন'—ভগতজীর এই প্রশ্ন কানে আসিতে ওর সাহস ফিরিয়া আসিল। বারান্দার উপর উঠিয়া ভগতজীর কাছে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, 'ভগতকাকা, তাড়াতাড়ি কর। আর তো আমি ওর জীবনের আশা করতে পারছি না। একটু তাড়াতাড়ি কর।'

ভগতজীর চোখের সম্মুখ হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'তুই নিজের ঘরে যা। আমি যাচ্ছি। মহুয়ার খেতে তো গিয়েছে না?'

বারান্দা হইতে নামিতে নামিতে বলিল, 'ওর আয়ু থাকে তো, বেঁচে যাবে। তুই চুপচাপ ঘরে যা।'

আর খুঁটি হইতে লাঠি লইতে লইতে বলিল, 'তোর ভয় নেই, ঘাবড়াস না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্।' বাড়ির দরজা খুলিল তখনও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। ঘিয়ের বাটি হইতে ঘটিতে ঘি ঢালিয়া ঘটি হাতে লইয়া বাহিরে চলিল।

কিন্তু মাচানে পৌঁছিয়া ভগতজী ধূলার যে অবস্থা দেখিলেন, তাতে ঘি খাওয়াইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। আঁধার রাত্রির ভীষণতা অপেক্ষা, মাচানের আবহাওয়া অনেক গুণ ভীষণতর ছিল। ধৈর্য ধরিয়া ঐখানে বসিবার সাহস তো ভগতজীরই ছিল। যাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সে-ও বসিতে পারিত।

ভগতজী ধূলার হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। নাড়ীতো বগলের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেখান হইতেও মিলাইয়া গেল। শেষে এক হিক্কা তুলিয়া ধূলার শরীর কাঠের মতো শক্ত হইয়া গেল।

জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগতজী দাঁড়াইয়া রহিল। ঘটি লইয়া মাচান হইতে নামিলেন আর ঘরের দিকে চলিলেন। মাথার উপর কালো মেঘ ছাইয়া ছিল। দুই একটি ঝলকে যেটুকু দেখা যাইতেছিল মনে হইল যেন কোন একটি নিঃসঙ্গ তারা মেঘের ফাঁকে দূরে দাঁড়ানো দেখা যাইতেছে। চারিদিক অন্ধকারের আবরণে ঢাকা। আধ বুড়োর মতো ঠোক্কর খাইতে খাইতে ভগতজী গাঁয়ের দিকে চলিয়াছে। চারিদিকের দৃশ্যগুলি যেন

আঁধারের চাদর গায়ে জড়াইয়া লইয়া আছে।

গাঁয়ের কুকুরের ডাকে তাঁহার ভাবনার শৃঙ্খল ভাঙিয়া গেল। চিন্তার গাঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে নিজের মনে বলিলেন, এত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মানুষ অক্ষম হইয়া পড়ে।

সোজা দরজার দিকে যাইতে কাছেই কিছু শব্দ শুনিয়া ভগতজী বলিয়া উঠিলেন, 'কে রে?' আর জীবীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন 'বাইরে কেন বসে আছ? ঘরে এস'

জীবী ঘোমটা টানিল না, বলিল, 'কি হল ভগতকাকা?' 'যা হবার তাই...' —বলিয়া জীবীকে বলিলেন, 'ওর এক জোড়া কাপড় তো আমাকে এনে দে।'

'কিন্তু আমাকে বল না?' 'দরজা খুলিতে খুলিতে জীবী প্রশ্ন করিয়াই ভগতজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

'আচ্ছা তুই আগে আমাকে কাপড় তো দে! যা হবার তা হয়ে গেছে। জেনেই বা তুই কি করবি? আচ্ছা চল দেরী হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটিটা ঘরে রেখে দে'—বলিয়া ভগতজী দরজার পাশে ঘটিটা রাখিলেন। যাইতে উদ্যত জীবীকে বলিলেন—'দেখ যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তো মন শক্ত করার দরকার। যেন কিচ্ছু জানিস না। তুই এটুকু কর, তবে বাকি আমি সামলে নেব।'

সমগ্র পাড়া চুপচাপ। অন্য সবাইকে দেখিয়া যে কুকুর চীৎকার করিয়া পাড়া জাগায় সে-ও 'এ ভগতকাকা' মনে করিয়া এমনভাবে বারান্দার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল যেন দেখিতে চায় এখানে ব্যাপারটা কি? আর কাপড় বগলে করিয়া খেতের দিকে ভগতজী যে পথে যাইতেছিলেন সে পথে কুকুরটি পিছু পিছু চলিল।

মাচান হইতে যখন নামিলেন, তখন ভগতজীর হাতে ময়লা কাপড় আর কাঁথা কাপড়ের এক পোঁটলা। নীচে রাখা দেহটি লইয়া ঝর্ণার দিকে চলিলেন। কুকুরটা এতক্ষণ মকাই খেতে বসিয়াছিল, এখন আবার পিছু লইল।

অন্ধকারের মধ্যে ঝর্ণার জল বহিয়া যাইতেছিল। জলের গতি অপেক্ষা ভগতজীর চিন্তার গতি দ্রুততর। ভাবিতে ভাবিতে স্নানের কাজ শেষ

হইয়া গেল। জল চিপিয়া সে কাপড়খানা কাঁধে ফেলিল। চলিতে চলিতে আগুনের মধ্যে যে কাপড়খানি জলিতেছিল তাহার দিকে অনেকবার তাকাইলেন। তার কিছু পরে ফিরিয়া চলিলেন। পাশ হইতে একটা বাঁশ লইয়া আধ-পোড়া কাপড়গুলি নদীর জলে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন

ভুরিয়া কুকুর তো এতক্ষণ নদীর ধারে বসিয়াছিল, এখন সেও সঙ্গেই চলিল। ভগতজী পিছন ফিরিয়া কুকুরকে দেখিয়া একবার আদর করিলেন আর আপন মনে হাসিতে লাগিলেন। 'ভুরিয়া দেখ মজা।' আর যেন ভুরিয়াকে জবাব দিতেছেন এমনভাবে বলিলেন—'আমাদের মানুষদের তো ভাই মাঝে মাঝে এ কাজ করতে হয়।'

তিনি ভিজা ধুতি দরজার খুঁটিতে টানাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িতেছিলেন এমন সময় সূর্যকে স্বাগত জানাইবার জন্য মোরগ ডাকিয়া উঠিল। যাঁতা ঘুরানোর শব্দ শুরু হইয়াছে—'উ আঁই হর-এ' শব্দে শৃগালেরা গ্রামের সীমা পার হইয়া যাইতেছিল।

মাচানের নীচে রাখা ধুলার শবের কাছে উপবিষ্ট সব লোকের মুখেই ভগতজীর এই কথা—'হাঁ ভাই, হাঁ কোনো জন্তু জানোয়ারই নিশ্চয় খেয়ে গিয়েছে।' কিন্তু ও'দের মুখ চোখের ভাবে যেন মনে হয়, 'যেন শেষে যাবার সময় বেচারার প্রাণ নিয়ে রাড় জীবী স্বস্তি পেল।'

এই দৃষ্টিতে যাহারা দেখিতেছে সেইসব স্ত্রীদের মাঝে বসিয়া জীবীর মনের অবস্থা কিরূপ হইল, বলা কঠিন। হাতের চুড়ি ভাঙিতে এক স্ত্রীলোক তো বলিয়াই ফেলিলেন—'মূর্খ, এই যদি করার ছিল, তো এগুলি পরেছই বা কেন?'

জীবীর কিন্তু তখন এ সব শুনিবার বা বুঝিবার অবস্থা ছিল না। আর শুনিলে বুঝিলেই বা উহার মধ্যে নূতন কথা কি ছিল? ধুলাকে ও বিষ দিয়াছে একথা তো ও নিজেই মানিয়া লইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা এত কথা বলা সত্ত্বেও ও কিন্তু বুক চাপড়াইয়া কাঁদিল না। যাহারা বলিতেছিল তাহাদের দিকে কুটুর-কুটুর করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

এক হিসাবে ভালই হইল, নয়তো সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া বুড়িরা যা গালাগালি করিত তা শোনা বড়ই কঠিন হইত। বুড়িদের শান্ত করিবার

জন্য আসিয়া মেয়েরা অভাগা মেয়ে জাতের জন্য বিলাপ করিয়া যে সব কথা বলিবে তাহা শুনিবার ওর বিন্দুমাত্র বাসনা নাই। ও তো উঠানের এক খুঁটির ধারে বসিয়া একদৃষ্টে দূর চক্রবালের দিকে চাহিয়া ছিল। ওর চোখে চিন্তার একটু রেখাও নাই।

ঘেঁষ (যব আর আটা মেশানো এক প্রকার খাদ্য) খাওয়াইবার জন্য মেয়েরা যখন ওকে উঠাইতে আসিল তখনও কেন উঠিতেছে তাহা ওর মাথায় আসিল না। মাটির অন্নপাত্রের সম্মুখে বসাইয়া যখন উহারা নিকটে ওর থালা রাখিল, তখনও থালার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। জীবীকে বুঝাইতে বুঝাইতে মেয়েরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ওর কি বুঝিবার মতো অবস্থা যে বুঝিবে?

পরদিন তো ও খাবার সে খাইল, ঘরের কাজকর্মও করিল। কিন্তু সব কিছু করিল যন্ত্র চালিতের মতো, পুতুলের মতো। না বলিল কোনো কথা, না করিল কিছু আলাপ। মাথা নাড়িয়া যতক্ষণ হাঁ না বুঝান যায় ততক্ষণ ও মুখই খুলিল না।

উহার সৎ মা কাঁদিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তার সঙ্গে জীবী কোন কথা বলিল না। ভাই-বোনের কথাও জানিতে চাহিল না। ওর মা ছয় মাস পর্যন্ত শোক করার পর ওকে নিয়া যাওয়ার কথা বলিল, তাহাতেও ও কিছু বলিল না।

ও যেমন তেমন করিয়া কাপড় পরে। মাথার আলু-থালু কেশ হাওয়ায় ওড়ে।

কিন্তু জীবীর অবস্থা তো ভগতজী বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, আগেই হউক আর পরেই হউক মৃত্যুবিষ তো সবাইকেই পান করিতে হয়—কিন্তু এই বিষ আত্মস্থ করা কঠিন।

কাহারও কাহারও উহার প্রতি মায়া হইত, তাহারা বলিত, 'বেচারির দশা দেখ! মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

তবে অধিকাংশের মধ্যে—'কিছু মাথা খারাপ হয় নি। ও এমন যে তোমার আমার মাথা খারাপ করে দেবে। ও তো বানানো পাগলামি।' এই ধরনের কথাই হয়! এক একবার টুকরা টুকরা কথা জীবীর কানেও আসে, ও ছুটিয়া চলিয়া যায়। দিনভর গালি দিলেও শাশুড়ি দেবরের কথায়

ও টুঁ শব্দটি করে না।

এত সবের পরেও যখন ঘাটে জল আনিতে যাইত, এমন ভাবে ওপরের মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিত যেন ঐ সুদূর মাঠ হইতে কেহ আসিবে—তাহারই প্রতীক্ষায় সে আছে।

অর্ধ সমাপ্ত গীত

বিজয় দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে ভাদ্রের মেঘ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। লক্কা পায়রার মতো টলমল করিয়া চলমান ছোট ছোট মেঘের দল ছাড়া আকাশের অন্যত্র প্রায় স্বচ্ছ ছিল। আগন্তুক শরৎ ঋতুর অভ্যর্থনায় আবির উড়াইতে উড়াইতে সন্ধ্যাও অস্ত গিয়াছে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ দিগ্‌বলয়ের পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু মন্দ মন্দ হাসিতেছে।

পৃথিবীতেও শরতের আগমনী গীত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। উঘরিয়া গ্রামের লোকেরা প্রতি বৎসরের মতো গ্রামের কেন্দ্রস্থলে 'গরবা'র আয়োজন করিয়াছিল। বালিকারা ভাঙা ভাঙা গান দিয়া আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পরও গ্রামের যুবকেরা গানের জন্য একত্র হয় নাই। যুবতীরাও আসে নাই।

প্রথম প্রথম দুই একদিন তো এইরূপ হইয়াই থাকে। দুই একজন তাহাদের মতো অন্য ছেলেদের কাহাকেও না পাইয়া ফিরিয়াও যায়, কিন্তু আজ এখানে তিন চারজন আসে, কিন্তু ছোটদের দেখিয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়। অবশ্য যদি কেহ জানিতে যাইত, আগ্রহ করিয়া বসাইত, তবে প্রথম দিন হইতেই দেরিতে হইলেও আরম্ভ তো হইয়াই যাইত। আর একবার আরম্ভ হইলে কাহারও কাহারও ডাকিবার বা আগ্রহ করিবারও দরকার হইত না। প্রত্যেক গ্রামে একজন না একজন কেহ থাকিত, যে এপ্রকার প্রত্যেক নিজের ব্যাপারে বাড়ির বিবাহের মতো সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভটা করাইয়া দিত।

উঘরিয়ায় যদি কেহ এরূপ ব্যাপারে অধিকারী থাকিত—বিশেষ করিয়া গানের ব্যাপারে—যদি কেহ মাথা গলাইতে আসিত তবে সে ছিল কাণজী। তাহাকে বাদ দিয়া এই তিন দিন সব ফাঁকা ফাঁকাই ঠেকিতেছিল। একজন মহিলা তো বলিয়াই ফেলিলেন—'আজ কাণা ভাই থাকলে কি আর গানের আসর জমত না?'

নিকটেই চৌকির উপর দুই চারি জনের সঙ্গে ভগতজী বসিয়াছিলেন। কথাটি তাঁহার কানে আসিল। তিনি বলিলেন—'তাই তো, যারা বলতে জানে তারা বলে যে দুটো বাঁদর চাই ষাঁড় চাই, দুজন চতুর ব্যক্তি চাই, দুজন পাগল চাই, তবে একটা গ্রামের পত্তন হয়।' আর গোঁফে তা দিতে দিতে বিড়বিড় করিয়া বলিলেন—'আঃ কি রকম সময় এসেছে!'

আর ভগতজীরই বলা গল্প মনে পড়িয়া গেল মনোরের। সে অমনি বলিয়া উঠিল—'সময় এমন নয়, ভগতকাকা, এ তো যুগেরই ধারা!' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'গাইয়ে না আসে তো মরুক গে। তুমি সেই সময় আর যুগের কাহিনী বল। এরা সকলে শুনুক।'

ইহার পর স্ত্রীলোকেরাও ভগতজীর নিকটে হল্লা আরম্ভ করিল—'বল বল ভগত কাকা! আমাদেরও কখনও কখনও কাহিনী শোনাও। প্রথম প্রথম কিছুদিন তো বলতেও, কিন্তু এখন তো সময়ের মতো তুমিও হয়ে গিয়েছ।'

ছেলেরাও ভগতজীর চার পাশে ঘেষিয়া বসিয়াছিল। দূরে একটা চৌকির উপর দুই চারিটি যুবক বসিয়াছিল, তাহারা ভগতজীর কাছে আসিয়া বসিল। যুবতীরাও সরিয়া আসিল।

এখন আর ভগতজীর পালাইবার পথ রহিল না। একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তিনি কাহিনী আরম্ভ করিলেন :

সময় নামে একজন পুরুষ ছিল। একদিন পাশের বড় গাঁয়ে সে সওদা করতে গেল। তেল আছে, মরিচ আছে, আটা আছে, ছাতু আছে, এই সব নিতে দেরি হয়ে গেল। সময়ের তাড়াতাড়ি ছিল। নুন-মরিচের পুঁটলিটা পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রাখল। তেলের বোতল হাতে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলতে আরম্ভ করল।

পথ চলতে চলতে সময় মনে মনে বিড়বিড় করছিল—'আজ বাড়ি গিয়ে বিনা জলে এমন বাটি চচ্চড়ি বাঁধবো যে বাস্। সর্ষে তো নিয়েছি। কড়াইতে দু পলা তেল, ওপর থেকে রাই আর মেথি ছেড়ে দিয়ে এমন জোরে নাড়ব!' কিন্তু সময় কি নিজের মাথায় ঢালবে? তার বাড়িতে এসব কিছু ছিলই না যাতে বিনা জলে চচ্চড়ি হয়। অনেকদিন বাদে আজ সরষের তেল পেয়েছে তা অনেকখানি দেওয়ার কথা ভেবেছিল। গরম

উনুনের ধোঁয়া নাকে গেলে যেমন হয় তেমনি তেল দেওয়ার সময় কাশিও এসে গেল। যতই হোক বাড়িতে গিয়ে রোজকার মতো কড়াই খট্ খট্ করতে থাকবে।'

এত কথা হইতে হইতে দূরে যে সব মেয়েরা ছিল তাহারা তখন যেন পাশে সরিয়া আসিয়াছিল। যে সমস্ত মেয়ে গরবা গাহিত তাহারা সুবিধামতো বসিয়া পড়িয়াছিল। গল্পের গন্ধ পাইয়া পাড়ার বৃদ্ধেরাও চুপচাপ আসিয়া চৌকির কিনারায় বসিয়া পড়িল। গরবার প্রদীপও এমন শান্ত হইয়া স্থির-ভাবে জ্বলিতেছিল যে তাহাও যেন তন্ময় হইয়া কাহিনী শুনিতেছিল। সকলের চোখ ভগতজীর উপর। এক বুড়ির নজর না থাকিলে গরবার প্রদীপের ঘি না জানি কখন কুকুরের পেটে চলিয়া যাইত।

হুঁকায় দুইটা টান দিয়া ভগতজী আবার প্রস্তুত হইলেন। এইবার টীকা ধরাইবার জন্য হীরার মতো লোকও আসিয়া জুটিল। আর কি থামা যায়?

'এর পর তো সময়-ভাই গমের রুটি করব, কংকু বৌদিদির বাড়ি থেকে অল্প স্বল্প ঘিও আনব।'···এমনি ভাবে সে খুব মেজাজের সঙ্গে ভাবতে লাগল যে অনেকগুলো খাবার তৈরি হয়ে গেছে। এর পরে যখন খেতে দেবে তখন ওর কানে বেজে উঠল একজন স্ত্রীলোকের আওয়াজ! সময় মনে মনে বলল—বাড়িতে তো স্ত্রী নেই, এ আবার কথা বলে কে? এদিক ওদিক নজর দিয়ে দেখে যে, নিজে তো রাস্তায় প্রাণপণ চলছে, অন্যদিকে একজন স্ত্রীলোকও হেঁটে চলেছে। সময় মনে করল—একটু ধীরে চলে, মেয়েটিও গতিবেগ কমিয়ে দিল। সময়ের গতি জোর কদমে হলে মেয়েটিও তাড়াতাড়ি তাল রেখে চলল।

স্ত্রীলোকটি দুবার জিজ্ঞাসা করল!—কোন গ্রামে বাড়ি?

'উথরিয়া'—বলে সময়-ভাই অগ্রসর হল।

লোকেরা নিজেদের গ্রামের নাম শুনিয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'হয়তো হীরা ভাইয়ের মতো কেউ হবে। তখন আর একজন অন্য কাহারও নাম করিল।

ভগতজী বলিয়া চলিলেন—'ঐ স্ত্রীলোকটি ছিল আমাদের এই কালীর মতোই মুখফোঁড়। জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু নিজের নাম তো বলবে।'

'আমার নাম হল সময়।' বলে মনের গতি শ্লথ হতে দেখে সময় মনের

লাগাম টানল। আবার জোরে চলতে লাগল। ঈষৎ হাবভাবের সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বলিল—'ওহো, এমন গজগমনে না চলে, একটু সঙ্গ দাও না।'

সময়-ভাইয়ের পায়ে কেহ যেন লাঠি বসিয়ে দিল। মনে মনে ভাবল—এক থেকে দুই ভাল। একটু ঢিমা তালে চলে বলল—'কিন্তু তোমার নাম তো আমাকে বললেই না।' 'আমার নাম যুগধারা'—বলে সে সময়ের উপর তারার মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সময়-ভাই একটু রোমাঞ্চিত হল।

'নাম তো ভাল রেখেছেন।'

কিন্তু যুগধারাও যোগ্য উত্তর দিল। অধরে হাসি এনে বলল, 'তোমারই বা নাম এমন কি খারাপ? সময় তো সুন্দর নাম।' বলে সময়-ভাইএর দিকে মোহন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।'

কাহিনী বলিতে বলিতে ভগতভাই অভিনয় করিতেছিলেন। দেখিয়া মেয়েদের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিতেছিল।

ভগতজী বলিয়া চলিলেন—'এইভাবে দুজনে চলতে চলতে উধরিয়ায় এসে পৌঁছল। সময় মনে মনে ভাবল—'বেটা, তুই মেয়েটিকে সঙ্গ দিয়েছিস, ভালই করেছিস, কিন্তু এখন ও যাবে কোথায়?' মহল্লার ঠিক সামনেই থেমে সে যুগধারাকে জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু এখন তুমি যাবে কোথায়?'

স্ত্রীলোকটির আশ্চর্যবোধ হল। সময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'তোমার ঘর আছে তো? তুমি তো বলেছিলে আমি উধরিয়ায় থাকি।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সময় ভাই বলিল, 'ঘর তো আছে! কি-ন্-তু···আমি একাই আছি।'

'কিন্তু আমিও তো একলাই আছি।'—বলতে বলতে যুগধারা আগে আগে চলিল। বেচারী সময়-ভাই তো ভয়ে ভয়ে এবং কোথাও যেন কেহ দেখতে না পায় তা লক্ষ্য করতে করতে পিছনে পিছনে চলল।

সময় কোমরবন্ধে লাগানো চাবি দিয়ে দরজা খুলতে চাইবে এমন সময় যুগধারা চাবি কেড়ে নিয়ে ঘর খুলে ঢুকল যেন সে বাড়িরই গিন্নী। সময়-ভাই সৌখীন লোক ছিল। পকেটে দেশলাই ছিল, আর শহর থেকে এক পয়সার পান বিড়িও এনেছিল। যুগধারা দেশলাই দিয়ে দীপ

জ্বালাল। সময় মুখ হাঁ করে রইল, তার হাত থেকে তেলের বোতল নিয়ে 'বস খাটের উপর'—বলে ও জলের কলসীর কাছে দেওয়ালে লাগানো পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। এতক্ষণ সময় তার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল।—'বেটা! পেরেক থাকতেও তুই বোতলটা উনুনের ওপর রাখতিস কেন? এতটুকু জ্ঞান ছিল না।' সে নিজেকে বলল।

এরপর যুগধারা পুটলিগুলি নিয়ে আরামে ঘরে বসল। 'এটাতে কি আছে?' 'ওটাতে কি আছে?' বলতে বলতে একের পর এক পুটলি খুলতে লাগল। চৌকির উপর বসে সময় মনে মনে বলল—

'যা ইচ্ছে কর, ঘর তো মেয়েদেরই।'

হীরা সমর্থন করিল—'হাঁ ভাই!' উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাইয়া বলিল—'একে তো ষণ্ডামার্কা লোক, তাতে আবার জুটে গেছে সরু কাঠির মতো স্ত্রী—হবে না কেন?'

ভগতভাই বলিযা চলিলেন—'এর পরে তো সময়-ভাইয়ের জন্য যুগধারা স্নানের জল গরম করে দিল, আর বিনা জলে মুগ বেঁধে তিনখানা রুটিও করে দিল। খেতে বসে সময়ের মনে হল—'মান কি না মান সময়, এতো তোমার জন্মান্তরের আত্মীয়।'—

'তোমাদের তো লাগবেই'—কালী আস্তে আস্তে বিড়বিড় করিয়া বলিল।

ভগতজী বলিয়া চলিলেন—যুগধারা বসে দেখছিল, কখন থালার রুটি ফুরিয়ে যায়। আর কখন রুটি আবার দিতে হবে। কিন্তু সব রুটি আর শেষই হয় না। খানেওয়ালার খেয়াল খুশির আর শেষ নেই। এক এক গ্রাস মুখে রাখে আর ঝুঁকে ঝুঁকে যুগধারার মুখের দিকে তাকায়। যুগধারা না বলে পারল না—'কি দেখছ, শেষ কর না!'

সময় হেসে বলল—এরকম যুগধারা খাবার এ জন্মে কবে…? কিন্তু 'আমার' বলার পূর্বেই যুগধারা বলে উঠল—'যুগধারা তো এসেই গেছে না? প্রাণ ঠাণ্ডা করে চুপচাপ খেয়ে নাও।'

হীরা বলিয়া উঠিল, 'শোনো বেটা বদমাইসের কথা। কেমন চালাক মেয়ে মানুষ!'

'চালাক তো বটেই' বলিয়া গাঁয়ের লোকেরা হাসিতে লাগিল।

'তারপর ভগতকাকা !' মনোর জিজ্ঞাসা করিল।

'একটু তামাক খেতে দাও', বলিয়া দুচারটা টান দিয়া আবার হুঁকাটা আগাইয়া দিল। 'আবার কি? খাওয়া দাওয়া করে দুজনে শুয়ে পড়ল!'

ভগতজীর নিকটে যে চৌকি ছিল তাহাতে বসিয়া কোন যুবক প্রশ্ন করিল—'এক সঙ্গে, না আলাদা' এই প্রশ্নে যাহারা গল্প শুনিতেছিল শুধু তাহারাই নয়, ভগতজী নিজেও হাসিয়া উঠিলেন।

ভগতজীর জবাবও তেমনই—'এসব তো বুঝে নিতে হবে রে ভাই!'

সময়ের মতো যণ্ডামার্কা লোকের কাছে কে এমন আত্মীয় কুটুম আসবে, যে দুচার খানা চৌকি রাখবে?' একথা শুনিয়া লোকে আরও বেশি জোরে হাসিতে লাগিল।

—'দিন শেষ হতেই লোকেরা যুগধারার আসবার খবর পেল। কিছুদিন পর্যন্ত লোকের মনে হয়েছিল বুঝি কোন আত্মীয় স্বজন হবে, দুই চারদিনই তো থাকবে। এইভাবে দশ পনেরো দিন থাকবে না।

এখন তো সময়ভাইয়ের জীবনের নকশা একেবারে বদলিয়ে গেল। না হয় জল তুলতে, না হয় বাটনা বাটতে, না হয় কুটনো কুটতে। স্নানের জলও যুগধারাই তুলে আনে।

জলওয়ালী ভিস্তী মেয়েরা জিজ্ঞাসা না করেও পারে না, 'ও, যুগধারা সময় তোর কে হয় রে?'

যুগধারা তো ওদের গুরু ছিল। বলল, 'ওকথা তো সময়কেই জিজ্ঞাসা করতে হয়।'

লোকেরা আবার সময়কে জিজ্ঞাসা করে—'ও সময়, তোমার ঘরে কে এসেছে?'

চৌকিতে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে হুঁকা টানতে টানতে সময় জবাব দেয়—'ও তো যুগধারা আর কে আসবে!'

আরে, সে কথা তো আমরাও জানি যে তার নাম যুগধারা। কিন্তু তোর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?'—হীরার মতো একজন লোক আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল।

সময়ও একই জবাব দিল—'সে কথা যুগধারাকেই জিজ্ঞাসা কর।' ভগতজীর যাহা বলিবার ছিল, তাহা ঐ গাঁয়ের মেয়েরাই বলিয়া দিল—

'আরে, সময়ও তো খুব ওস্তাদ ছিল !'

জিভের আগায় প্রশ্ন লইয়া মনোর প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল, সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'এখানে বেচারা সময় কি করবে ? এখানে তো দেখছি, ষাঁড় যুগধারারই অমনি ধারা ছিল।'

তখন পাশ হইতে মোড়ল বলিয়া উঠিল—'কাউকে দোষ দেওয়ার নেই, সময় আর যুগধারা দুই-ই একরকম।'

ভগতজী কাহিনী শেষ করিয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন, 'সেদিন হতে সময় আর যুগধারা এক হয়ে গেল।'

যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, এই ভাবে লোকে বলিল—'হ্যাঁ, ভাই, হা ! সময় বল আর যুগধারা দুই-ই এক !' আর, 'ওরে, বাপরে। আমার তো ভাই পা ধরে গেছে' বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেই ভগতজী বলিতে লাগিলেন—'এমনি এমনি কেউ পালাতে পারবে না। একত্র হয়েছ তো গান গেয়ে চলে যাও। কাহিনী আমি শুধু শুধু বলিনি, বুঝেছ ?'

অন্য কোনও দিন ভগতজীকে চটাইবার সাহস কাহারও হইত না। এখন আজ হইবে কি করিয়া ? তাহার উপর আজ আবার গান গাইবার ফূর্তিও সকলের মনে ছিল। দেখিতে দেখিতে সকলে বৃত্তাকারে দাঁড়াইল।

কাৎ হইয়া শুইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে ভগতজী এইসব যুবক যুবতীকে গরবা-নাচে বৃত্তাকারে ঘুরিতে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন 'আর কি ! যৌবনের এই পাঁচ বছরই তো নাচ-গানের জন্য।' এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—'পরে তো আর কেউ বলবে না ওঠ আর গান কর।'

দুর্গামায়ের ছোট ছোট পাঁচটা গীত গাওয়ার পর যুবকদের আর আটকায় কে ? পা আপনা আপনি খুলিয়া গেল। আওয়াজও উপরে চড়িতে লাগিল। চারটি যুবক গান ধরিল। বাকি যুবক যুবতীরা দূরে দূরে রহিল—

ভেমা, এই সগোড়ার গলি খুব সংকীর্ণ
বলদ নিয়ে আসার সময়, ভেমা, বেচারি একলা !
ভেমা, যে বলদ চালায় সে গিয়েছে দূর দেশে
ভেমা, আমার অর্ধ যৌবন তো কেটেই গেল।

জানি না কেন ভগতজীর হঠাৎ কাণজীর কথা মনে পড়িল। এই ভাবিয়া যেই তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতে যাইবে, অমনি একটি ছেলে খবর আনিল—'কাণা ভাই এসেছে।' যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের কানে এই কথাটি গিয়া পৌঁছিল। হীরাও গান গাহিতে গাহিতে একথা শুনিল। ছুটিয়া বাহির হইবে, ভগতজী তাহাকে থামাইলেন—'তুই গান গা, আমি ওকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি।' যখন ভগতজী বলিতেছিলেন, তিনটি ছেলেও তখন জুটিয়া গেল।

গ্রামের মেয়েদের পিছনে একজন মুড়িশুড়ি দিয়া বসিয়াছিল, যেন পৌষের ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কাণজীর খবর শুনিয়াই সে মাথা উঁচু করিল। উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। ততক্ষণে কাণজীকে দেখা গেল। সকলের আগে সে-ই হয়তো দেখিতে পাইল। সেই লাল পাগড়ী, সেই কামিজ-কোট। চলনও পূর্বের মতোই জোর পদক্ষেপে। মুখখানা অবশ্য কিছু শুক্না। এসব কিন্তু সে এক নজরেই দেখিয়া ফেলিয়াছিল। আর এক নজর পড়িতেই সে উঠিল এবং বগলে হাত দিয়া হেঁট মাথায় নিঃশব্দ চরণে চলিয়া গেল!

একজন স্ত্রীলোক তো বলিয়াই ফেলিল—'কর্তা মরে যাওয়ার পর তো পুরো এক মাসও হয় নাই, তবু গান শুনতে আসার জন্যে বাঁড়ের লজ্জা নেই!'

তখন জীবীর পাড়ার একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—'তুমি তো বলছ, কিন্তু বেচারি করে কি? রাতদিন কানের ময়লা ফেলা গালাগালি কি করে শোনে, বল? এর চাইতে এখানে এসে খানিকক্ষণ বসে থাকে, গায়ে বাতাস লাগে। সে তো গান গাইছে না, তার লজ্জা হবে কেন? বুড়ির ক্যান্ ক্যানানিতে সারা পাড়া অস্থির!'

ওদিকে ভগতজী কাণজীকে দেখিয়াই বলিতেছিলেন—'ওহো, এতখানি রাত কোথায় ছিলে ভাই?' ভগতজীকে 'রাম-রাম' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া কাণজী বলিল—'দিন শেষ হলে মোটরে করে মনোগদ্ গ্রামে এলাম, তা দেরি তো হবেই।'

সকলের সঙ্গে দেখা করিবার পর কাণজী আসিয়া ভগতজীর কাছে বসিল। কিন্তু মনোর প্রভৃতি অন্য যুবকেরা আসিয়া তাহাকে গান গাওয়ার

জন্য ধরিল।—'ক্লান্ত তো হয়েছ কাণা ভাই, কিন্তু তুই একটা গান তোমাকে গাইতেই হবে, আমরাও আজ শুরু করেছি।'

ভগতজীরও কথাটা ভাল লাগিল। কাণজীকে তুই এক ছিলিম তামাক খাইতে দিয়া উহাকে উঠাইলেন। 'তোকে ছাড়া সব ফাঁকা ছিল। এদের সকলকে দেখিয়ে দে, গান কেমন করে গাইতে হয়, ওঠ।'

কাণজী উঠিল, হীরার গলায় হাত রাখিল। হীরা মনোরের গলায়, মনোর আর এক জনের। এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে 'গরবা'র আশে পাশে চার পাঁচ চক্কর লাগাইল। কাণজী হীরার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল কি গান গাহিবে। তুই তিনটি গানের নাম করা হইল। কিন্তু এসব গাওয়া হইয়াছে বলিয়া হীরা মানা করিয়া দিল। শেষে কাণজী নতুন গান ধরিল। হীরাকে তার কলি গাহিয়া শোনাইল। রাগ রাগিণী আর কলির বিষয় বলিল। মনোর ও অন্য যুবকটি সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গের লোকেরা যখন দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করতেছে, তখন কাণজী হীরাকে অন্য এক কলি বুঝাইয়া দিতে লাগিল—

'রানী, একটি চোখের পাতা থেকে ছুঁড়ে দিয়ে
অন্য চোখের পাতায় তুমি ধরে নিয়েছ।'

কাণজীর এই এক কলি লোকের হৃদয়কে মাতাল করিয়া তুলিল। দ্বিতীয়বার ঐ কলি আবৃত্তি করিয়া পরিবেশকে যেন আয়ত্ত করিয়া হাত তুলাইয়া দ্বিতীয় ছত্র গাহিতে লাগিল।—

তুধ ভরিয়া চোখকে স্নান করাইয়াছ,
পরে চোখের তারাতে কালি ঢালিয়া দিয়াছ।

তৃতীয় কলি বলিতে তাহার হাতের ভঙ্গী ও মুখের ভাবে এমন সমন্বয় হইল যেন ও লোকেদের ভুলিয়া গিয়াছে—

আমাকে হৃদয়ে রেখে তুমি লীলা করেছ
এখন আমাকে তোমার বুক থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ।
রানী! ইশারা করছ কেন তর্জনী দিয়ে,
আর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঠেলছ দূরে?'

শেষ কলি গাহিতে গাহিতে মনে হইল যেন সে কাহাকেও অনুনয় করিতেছে। মৃদু কম্পনের সঙ্গে তাহার শব্দ বাহির হইতেছে, তাহাতে

এতই দরদ ভরা যে উহার আত্মাই যেন মথিত হইয়া শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কোথায় যেন আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা গেল—

রানী। তোমাকে ছেড়ে আমি দূরে যাই চলে
রানী, দিনের বেলায় হাসি আর রাত্রিতে কাঁদি।
কেন তোমার সাথে দেখা হল পথে
কত সংকটে ফেললে মোরে!
আমার অনুনয়—তোমার চোখে অঞ্চল দিও না।

আর ঐ ঘন ভ্রূভঙ্গীর কটাক্ষে আমার সঙ্গে খেলা কোরো না।

গীত সম্পূর্ণ হইলে মুহূর্তের জন্য এত গম্ভীর শান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে পাশের দেওয়ালের নিকট হইতে একটা লঘু শ্বাসের মতো যেন একটা কিছু শোনা গেল! তখনই একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'ওরে, ওখানে ঐ ঘরে কার ছেলে কাঁদছে রে?'

'হবে কারও', বলিয়া আর একটি স্ত্রীলোক উঠিয়া দাঁড়াইল।

'নাও এখন তো মোরগ ডাকার সময় হয়ে এল, ওঠ।' বলিয়া দুইজন স্ত্রীলোক উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই চার পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে কালীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গেল। সে নাথীর সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল আর হাসিতে হাসিতে গরবার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক বলিয়াই ফেলিল—'কি রে, এখনও তোর মন ভরে নি বুঝি?'

'না, কাণা ভাইয়ের সুরের মতো জবাব না দিয়ে কি ও থাকতে পারে?'

কালীকে গাঁয়ে 'গানের ভাণ্ডার' বলিত। কাজেই কাণজীর গানের—তাও আবার এই ধরনের গানের—জবাব না দিয়া সে কি করিয়া থাকিতে পারে? লোকদের কথানুসারে কাণজী যদি গান বাঁধিত তবে কালীও যেখান সেখান হইতে জবাব শিখিয়া আসিত। কালীর গান বাঁধিবার প্রয়াস সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে কালীও সেইরূপ এক কলি গাহিল—

অপূর্ণ রেখো না গান, ও মোর প্রিয়,
অপূর্ণ রেখো না।

তিন তালির পরে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে—কালীর ভঙ্গী ছিল অপূর্ব।

তাহার দেহলতা প্রাণবন্ত, সরল, পায়ের পাতার সঙ্গে ঘাঘরার ঘূর্ণন, সকলের উপরে তাহার কণ্ঠস্বর এমন চমৎকার ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল যে, এক কালীই সে ভাবে গাহিতে পারিত।

কাণজী হুঁকা ছাড়িয়া গীতে কান দিল—

'হৃদয়ে এসেছ যদি, ঠেল না প্রিয়

কাছে যা পেয়েছ তাকে ঠেলো না।

গানে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা যথেষ্ট হইল না মনে করিয়া কাণজীর দিকে ঘাড় ঈষৎ ফিরাইয়া তৃতীয় কলি গাহিল—

হৃদয়ে চরণ দিয়ে খেল না প্রিয়,

নির্দোষ আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোরো না।

কাণজী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পরে শ্বাস লইতেও ভুলিয়া গেল।

পাশে যদি ডাকিলে তবে ঠেলো না প্রিয়,

বুক হতে দূরে ঠেলো না॥

শেষ কলি শুনিয়া কাণজীর মুখের ভাব এমন হইয়া গেল যে তাহাকে দেখিয়া সে হাসিতেছে না কাঁদিতেছে তাহা বলা কঠিন হইল।

বুক হতে দূরে ঠেলো না প্রিয়,

হৃদয়ের সঙ্গে বঞ্চনা কোরো না।

ইহার পর কালীর সঙ্গে কাণজীর হৃদয়ও গাহিতেছিল—কাঁদিতেছিল—

অপূর্ণ রেখো না গীত হে মোর প্রিয়

কাছে যা পেয়েছ তাকে ঠেলো না।

কাণজীর চোখে জল, কালীর দিকে যে চোখে চাহিয়াছিল তাহাতে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই ছিল। মেয়েরা তো দাতে জিভ চাপিয়া থাকিল। কেহ কেহ বলিতেছিল—'জানি না এ মাগী কোথা থেকে শিখে আসে! একটার পর একটা বের করছে।' কেহ কেহ তো কাণজীকেই বড় মনে করিয়া বলে—'কাণা ভাই-ই কি কম? দূর, জানি না, নিজে নিজে তৈরি করে, না কোন বই থেকে পেয়েছে?'

এই সব কথা বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকেরা উঠিতে লাগিল।

ভগতজীও হীরার সঙ্গে উঠিয়া কাণজীর বাড়ির দিকে চলিল। কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সুরটি বাজিতেছিল—'অপূর্ণ রেখো না গীত।'

কাণজী অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া শুইয়া ছিল, কাণজীর তো ইহাও মনে হইতেছিল—'এমন নয় তো যে এটা জীবীই বলিয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—'গীত অপূর্ণ রাখলে যা হওয়ার তাই-ই হয়েছে।'

এসেছিলে কেন ?

দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ভগতজীর বারান্দার এক দিকে দুই পাথর ও একটা জলন্ত কাঠ—এই তিনটি জিনিসের উপর গামলা রাখা ছিল। গামলায় গুড়, জল, চা তিনটি বস্তুই একত্র হইয়া সিদ্ধ হইতেছিল।

ঘরের উনানের উপর হাঁড়িতে ডাল ফেলিয়া ভগতজী বাহিরে আসিল। ছাঁচের উপর তাকাইয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া ডাক দিল—'ওরে হীরা, কত দেরি রে ?'

'আসছি ভগতজী !' বলিয়া দুধের ঘট লইয়া হীরা আসিয়া পৌঁছিল। ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে ভগতজী দেখিল রতনের হাত ধরিয়া কাণজী আসিতেছে। সামনে হইতে না ডাকিতেই মনোহর আসিয়া পড়িল। আর চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে ভগতজী একটু ডাকিতেই খেতের পথে তিনজন আসিয়া জড় হইল।

পিতলের দেরাজেও রেকাবি দুই সেট্ ছিল, কিন্তু পেয়ালা ও রেকাবির সেট্ না থাকিলেই কি চা খাওয়া যায় না। কাণজী তো বাইরের লোক, তাই তাহাকে রেকাবি ও পেয়ালা দিতেই হইবে, কিন্তু অন্যের জন্য পেয়ালা ও রেকাবি দুইয়ের একটিই যথেষ্ট। তিনজনকে দেওয়ার পর হীরার মনে হইল, যদিও খালি হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে তবে নিজের ও গিন্নীর জন্য কি আর কিছু বাকি থাকিবে ? দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ি হইতে সে একটি বড় ও দুটি ছোট বাটি লইয়া আসিল। ছোট বাটি দুইটি ভগতজী ও আর একজনকে দিল। মনোরকে দিল বড় বাটিটি। উহারা যখন মুখে উঠাইতে যাইতেছে দুইটি পেয়ালা ও রেকাবি খালি হইল। কিন্তু এসব ধোওয়া-ধুয়ির ব্যবস্থা করার চেয়ে ইহাই ঠিক। ইহা ভাবিয়া হীরা যেন ভাঙ্ খাইতেছে এই ভাবে ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে চা খাইতে লাগিল। কাণজী তো বলিয়াই ফেলিল—'এখন এই রেকাবিটা নিয়ে নে, মুখ পুড়ে যাবে।'

হীরা মুখের গর্তে দুই কাপ চা গলায় দিয়া গিলিতে গিলিতে বলিল— ‘তুমি কি জান? অর্ধেক পেট গরম হয় এরকম চা না খেয়ে ঘোল খাওয়া উচিত।’

আর বাকি চা-টা মুখে ঠাণ্ডা করিতে করিতে বলিতে লাগিল— ‘এইটুকু চায়ের জন্য রেকাবি ও পেয়ালার অপেক্ষা কেন?’ এই বলিয়া আবার ঘটির চা মুখে ঢালিয়া তাহা খালি করিয়া এক পাশে সরাইয়া দিল। মুখের চা গলার মধ্যে নামাইতে নামাইতে হীরাকে দেখিয়া কাণজী না বলিয়া থাকিতে পারিল না—‘যদি সত্যি বলতে হয় হীরা, তোকে বলি, তোর মুখ পেয়ালার চেয়ে ছোট নয়। তোর মনে হয়েছিল যে পেয়ালায় খেলে বেশি দেখাবে, তার চেয়ে ঘটিতে ভাল।’

ভগতজী বললেন, ‘তাও কিছু মন্দ নয়, কাণজী। দুই দিন বেচারা কিনা চায়ে আছে! ওর অবস্থা দেখলে তো এটা বেশি বলা হয় না!’ এই বলিয়া ভগতজী দুই দিন আগের কথা বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বাড়ি হইতে খেতে যাওয়ার জন্য বাহির হওয়া এই লোকগুলির পক্ষে আর বেশিক্ষণ বসা সম্ভব ছিল না। একজন তো তামাকের ছিলিমে এক টুকরা কয়লা রাখিয়া নিল। বাকি দুই জনের মধ্যে একজন বলিল— ‘আচ্ছা ভগতজী, আমরা চললাম, না হলে তোমারি কথা মতো থেকে গেলে সেই যে কথায় বলে ‘সকাল সকাল উঠেছি কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছি’— তাই হবে।’

এই বলিয়া কাস্তে হাতে নিয়া তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল।

‘আমাকেও খেতে হবে’ বলিয়া ভগতজী তামাক খাইতে ঝুঁকিলেন!

হীরা পেয়ালা প্রভৃতি মনোরের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, ‘এগুলো যেন ভগত কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না’—এই বলিয়া মনোরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। ভগতজীর হাত হইতে হুঁকা লইতে লইতে বলিল, ‘দাও না ভগতজী, দুটো টান দিই,’ বলিয়া বড় বড় দুই টান দিয়া উঠিয়া পড়িল।

কাণজী হীরার দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘তোমরা সকলে নিজেদের নিয়ে আছ, কিন্তু ভগত কাকার খোঁজখবর নাও কি?’

‘এখন তো ভগতজীর একটাই খেত। কাল নয়, পরশু কিন্তু ভগতজীর খেতের দিকে যেতে হবে।’ এই বলিয়া হীরা চলিতে লাগিল।

একথা ঠিক যে ভগতজীর দুইটি বলদ ছিল, কিন্তু খেতের কাজ বেশির ভাগ গ্রামবাসীরাই চালাইত।

কাণজীর কিছু তাড়াতাড়ি ছিল, কিন্তু ভগতজীর সঙ্গে কথাও বলিবার ছিল। কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'ডালটা দেখে আসি' বলিয়া ভগতজীকে উঠিতে দেখিল। কাণজী 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

দুই পা চৌকির উপর উঠাইয়া হাঁটুর উপর হাত দুইটি জড়ো করিয়া কাণজী বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি সম্মুখের ঘরের দিকে—জীবী উহাকে দুই তিনবার দেখিয়াছিল, কিন্তু পুরা মুখটা এখনও দেখে নাই, চোখাচোখি হওয়া তো দূরের কথা।

ইহার পূর্বে অনেক লোকে কাণজী ও জীবীর সম্পর্কে নূতন পুরাতন কত কথা বলিতেছিল যাহা কিনা গ্রামে বরাবর চালু ছিল। কিন্তু সে সব কথায় ভর্ৎসনা ছিল না, ক্রোধ ছিল না, গালি না, বরঞ্চ এই ভাবনাই ছিল—'যাঁড যা করার ছিল, তা করে বসেছে। কিন্তু এখন নিজের পাপে হৃদয় তার বিদার্ণ হচ্ছে।'—'কত শুকিয়ে গেছে, দেখতে পাও না? কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই, ফুর্তি করে কাজও করে না। কখনও হাসলে ডাইনির মতো ভয় লাগে।'

এসমস্ত কথা শুনিবার পরেও জীবী যে বিষ দিতে পারে, এ কথা কাণজীর মাথায় ঢুকিল না।

ভগতজীর এখন সময় লাগিবে ও কথা বলিতে বলিতে দেরি হইবে মনে করিয়া পাশে রতন খেলিতেছিল তাহাকে ডাকিয়া কাণজী বলিল—'মাকে গিয়ে বল যে কাকার জন্য যেন অপেক্ষা না করে। আমি সোজা খেতে যাব।' এই কথা ভাল করিয়া শিখাইয়া তাহাকে বাড়ি রওনা করিয়া দিল। কাকার আনা 'ঘাঘরা-উড়নি' উঠাইয়া সামলাইতে সামলাইতে রতন ভগতজীর আঙিনা পার হইয়া গেল কিন্তু তখনই তাহার চোখ পড়িল জীবীর উপর, সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। এই শুভসংবাদ না শুনাইয়া সে আর কি থাকিতে পারে? ভগতজীর সঙ্গে কথা কহিতে কাকা ব্যস্ত; তাহার দিকে তাকাইয়া জীবীর দিকে দুই পা বাড়াইয়া বলিল, 'কাকি, ও কাকি, দেখ! দেখ, ঐ কাকা।'

কাণজীর কানে এই শব্দ আসা মাত্র সে ধমকাইয়া উঠিল, বলিল,

'তুই যাবি, না আমি আসব ?' রতনের চেয়ে জীবী বেশি ভয় পাইয়াছিল। তেরছা চোখে একবার চাহিল। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল না। কাণজী আরও রাগচোখে রতনের পিঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। কর্মব্যস্ত জীবীর মুখ হইতে এক ভারি দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কাণজী ভগতজীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কেন জানি না করিল না। বরং উল্টা জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে ধুলার বাড়ি একবার দুঃখ প্রকাশ করতে যেতে হবে। ওর ভাই কি সেখানে থাকবে, নইলে তুমি…'

'ও ছেলের কোনও স্থির নেই। চল, আমিই যাব।' বলিয়া ভগতজী উঠিলেন। জীবী ও নানী বুড়িকে খবর পাঠাইয়া নিজেও শোক প্রকাশের জন্য কাঁদিতে বসিয়া গেলেন। এদিক হইতে কাণজীও আসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বিলাপের পর দুইজনে উঠিয়া ধূলার বারান্দায় বসিল। কিন্তু বুড়ির বিলাপ শুনিতে শুনিতে ভগতজীর মনে হইল, না বসিলেই বোধহয় ভাল হইত। 'উনুনটা একবার দেখে আসি' বলিয়া সে উঠিয়া গেল। কিন্তু কাণজী, 'আমিও উঠি, না বুড়ির বিলাপ শেষ হলে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই।' স্থির করিতে না পারিয়া উঠিতে পারিল না। জোয়ান ছেলে, যার রোজগারে সংসার চলে তার হঠাৎ মৃত্যুতে যে কোনও মায়েরই শোক অসহনীয় হয়। আর এ বুড়ি তো নিজেই মরণের মুখে, তার যে অসহ্য কষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? তারপর দুঃখের কথা শুনিবার উপযুক্ত পাত্র মিলিয়াছে! তখন আর উহার জিহ্বা বা হৃদয় কোনওটাই তাহার বশে রহিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ি বলিতে লাগিল—'হায় বেটা। তোর দুর্লভ বন্ধু…হাসি খুশি সুন্দর মেয়ে দেখে সে তোর বৌ এনে দিল…! অর্ধেক রাত্রে বিপদ মাথায় করেও তোমাকে বৌ দেখিয়ে দিল…। বেটা, আজ তোমার বন্ধু বিদেশ থেকে ঘরে এসেছে…! বেটা! আজ কে তাকে 'এসো' বলবে ?'

ইহার পরে বুড়ি রাগে অভিভূত হইয়া গালি দিতে শুরু করিল—'তুমি ওর বিয়ে দিইয়েছ, তোমার ভাল হোক! ওর জুটল ঐ অভাগিনী…আর ও আমার মরণের শান্তি নষ্ট করল।'

ধূলার মৃত্যুর পর আজ প্রথম জীবী এত বেশি কাঁদিল। উহার কান্নায়

বিলাপ ছিল না, একঘেয়ে বিলাপের সুরও ছিল না। ও ছোট শিশুর মতো ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

এই দুইজনের কাছে বসিয়া কাণজীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। বুড়ির বিলাপ শুনিতে শুনিতে জীবীর উপর একটু রাগও হইতেছিল, কিন্তু উহার এই নীরব কান্নার বেগে তাহা ভাসিয়া গেল। বুড়ির বিলাপ আর জীবীর এই বুকফাটা নীরব রোদনের মূলে নিজে এই মনে করিয়া নিজের উপরেই যেন তাহার ধিক্কার আসিল। ওখানে আর বেশিক্ষণ বসা কঠিন হইল। বৃথা ভাবনায় গম্ভীর এক নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভগতজীর ঘরের দিকে না গিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল। মনোরের বাপ তো বলিল —'বুড়ি শান্ত হওয়া পর্যন্ত তো বসে যাওয়া উচিত ছিল।'

একজন মেয়ে গোবর লেপিতেছিল, কাণজীর বদলে সে-ই উত্তর দিল —'কি করেই বা বসে? দুঘণ্টা বসে কথা যে বলত, সে-ই যখন নেই, কার কাছে আর বসবে?'

'ঠিক কথা' বলিয়া কাণজী ঘরে না গিয়া সোজা খেতের দিকে পা বাড়াইল। কেন জানি না, চাকুরিস্থল হইতে আসার জন্য উহার খুব অনুতাপ হইল। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করিল—'আমি কেনই বা এলাম?'

ধান কাটিবার সময় বুড়ির জন্য করুণাও হইতেছিল, 'সত্যি বেচারির দুর্দশার অন্ত নেই'—আর মনে করিল একবার জীবীর সঙ্গে দেখা হইলে জীবীকে খুব ভর্ৎসনা করিবে।

আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল, মনে মনে সে বলিল, 'ওরে খুনে, আমার নিয়ে আসার মুখ তো রাখবি! আমি তোকে কি বলব, একথা জানার পর আমার মনে কি রকম লাগবে এসব কথা তুই ভেবে দেখলি না!'

কিন্তু অন্য দিকে জীবীর এই হৃদয় বিদারক রোদন। ওর অস্থি-পঞ্জর-সার দেহ ইত্যাদি মনে পড়ায় ও ভাবিল, 'পাগল, তুই যতই কাঁদবি ততই পস্তাবি, কি হবে তাতে? আমি জানি তুই বেশ শক্ত হয়েই একাজে পা বাড়িয়েছিস, তাহলে এখন তোর দুঃখে আমি কি করব? যা করেছিস, এখন তার ফল ভোগ কর।'

কাজে আজ কাণজীর মন লাগিল না—কোন মতে দিন কাটাইয়া দিল। কাজের মধ্যে মন ঠিক করিয়া ফেলিল—'কাল না হয় পরশু, ঠিক

চলে যাব।'

রাত্রিবেলা হীরার ওখানে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে হুঁকা লইয়া বসিল। হীরা ওর চাকরির হাল-চাল জানিতে চাহিল—'কি রকম কাজ, কিছু বল না শুনি।'

'এখন তো একটা কলে কাজ পেয়েছি। কিন্তু এর আগেকার কাজের কথা যদি বলি, তোব বিশ্বাস হবে না।'

'বলই না, কি কাজ করতে হত।'

'কি কাজ জানিস—মেয়েদের ঘাগরা কাচতে হত,' বলিয়া কাণজী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'থাম্, থাম্, চালাকি করিস না। আর কেউ ভাল ধোপার কাজ করুক তুই কখনো…।'

'আরে আমি তো এর আগে পুরো ছমাস কাপড কাচার কাজ করেছি সাবান দিয়ে কাপড কাচা'—বলিয়া কাণজী পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

একটু দূরে বসিয়া কংকু ছেলেকে খাওযাইতেছিল, সে আর না বলিয়া পারিল না, 'আচ্ছা, এখন থামতো! কাণজীভাই, এত বানিয়ে বলো না। তুমি শহর ঘুরে এসেছ, কিন্তু স্বভাব তোমার যেমনকার তেমনই আছে।'

'মিছে কথা নয় বৌদি। বলতো আমি শপথ করে বলি।'

'থাক্, থাক্ মিছিমিছি অত শপথ করতে হবে না! ওখানে যা খুশি কর, কিন্তু এখানে এর নামও করো না।'

'তাই না?' কংকু চুপ করিয়া আছে দেখিয়া কাণজী আরও বলিল, 'কেউ তো আর আমাকে মেয়ে দেবে না, আর কি কথাই বা বলি?'

'তোমার জন্য কার ঘরে কোন্ আইবুড়ো মেয়ে বসে আছে যে আসবে? আর যদি বিধবা কেউ থাকে সেও আসবে না?'

অন্নপাত্রের নিকটে বসিয়া নাথী সব শুনিতেছিল, তাহার মন এসব কথা মানিয়া নিতে চাহিল না। কথার মোড় ফিরাইবার জন্য হীরা বলিল—'তা। তুই এখন কোন্ কলে কাজ করছিস? মাইনে কত, ছুটির মেয়াদ কদিন?' এসব জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিল—'আচ্ছা, এসেছিস যদি তবে দেওয়ালি পর্যন্ত থেকে যাবি তো?'

'নারে! আমি ভাবলাম, একবার তোদের সবাইকে দেখে আসি, আর সেজন্য ছুটি না নিয়েই চলে এসেছি।'

'তা, পাঁচ সাত দিন তো…' হীরার কথা শেষ করিতে না দিয়া কাণজী বলিল, 'আমার তো ইচ্ছা, কালকের দিনটা কাটিয়েই চলে যাই।'

'তবে তুই হঠাৎ এলিই বা কেন। আর এরি মধ্যে ফিরেই বা যাবি কেন? মিছিমিছি গাড়িভাড়ার পয়সা নষ্ট করলি!'

কাণজী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'এলাম এমনি! চল্, ভগতজীর কাছ থেকে হয়ে আসি, ওখান থেকে গরবাতে যাব।'

কিন্তু আসল কথা, কাণজীর হীরার সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলার ছিল। ভগতজীর ঘরের দিকে না গিয়া, 'তোর সঙ্গে একা একটু কথা আছে' বলিয়া ছাইগাদার দিকে মোড় ঘুরিল। দুই জনে একটা পাথরের উপর বসিল। কথা পাড়িবার জন্য হীরাই প্রথমে বলিল, 'এমন কি কথা রে, যার জন্য এতদূর ছাইগাদায় নিয়ে এসেছিস্?' হীরা যা ভয় করিতেছিল, কাণজী ঐ কথাই প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা হীরা তুই কি বিশ্বাস করিস্ যে জীবী ধূলাকে বিষ দিয়েছিল?'

'ধূলা বিষে মরেছে, এ তো ঠিক কাণজী। এখন তুই-ই ভেবে দেখ! ওদের ঘরের ঝগড়াঝাঁটির কথা তোর অজানা নয়। তাইতে আমায় ত একথা মেনে নিতে হয়।' একটু থামিয়া বলিল, 'তা, যা চুকে বুকে গেছে, তাকে খুঁচিয়ে লাভ কি হবে? যা হবার ছিল, হয়ে গেছে।'

'না, না, আমি তো শুধু জানতে চাইছি। আমার সঙ্গে আর এখন কি? মরবে তো ঐ ছুঁড়ি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমিও তো দোষের ভাগী। মুখের উপর বলুক, কি পিছনে বলুক, সবাই তো বলবে হীরা আর কাণজী মিলে বিয়ে তো করালে, কিন্তু উল্টে বেচারার ধূলিয়া প্রাণ হারাল!'

'বলাই সম্ভব, কাণজী। কিন্তু তার কি করা? বড় জোর, আমরা এতদিন যেমন সব লোকের কাজে গিয়ে দাঁড়াতাম, তা আর এখন থেকে হবে না।' আর বুড়ির কান্না কানে আসিতে বা অন্য কোন কারণে বলিল, 'এই বুড়ির জন্য আমার দুঃখ হয়। যে ছেলে রোজগার করে খাওয়াত সে চলে গেল। ছোট ছেলেটি পড়ে রইল। এই ছেলে বড় হয়ে বুড়িকে

ভাতজল দেবে কি?'

কাণজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল, 'তা ঐ মেয়েই বা এখন কোন সুখটা পাবে? একদিকে বুড়ি শাশুড়ির গালিগালাজ আর অন্যদিকে সৎ-মা! যেখানেই থাক না কেন, ও তো দুঃখের ভারে পীড়িত হয়ে পড়বে। ওর জীবনে তো চিরকালের মতো কলঙ্কের দাগ রয়ে গেল।' বলিয়া কাণজী নিজের দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল।

'শালীর কর্মফল! যেমন করবে, তেমন ভুগবে! আমরা তার কি করতে পারি? চল্, চল্, গানের জায়গায় যাই।' হীরা উঠিয়া পড়িল, কাণজীর উপর তাহার যেন একটু রাগই হইল।

'তুই যা, আমি ভগতজীর কাছে একবার হয়ে আসি। এখুনি এসে পড়ব।' বলিয়া কাণজী ভগতজীর ঘরের দিকে চলিল। ওর মনে হইতেছিল, বুড়ির কান্না যেন আর কানে না আসে কিন্তু কানে তো তুলা দেয় নাই যে আওয়াজ কানে আসিবে না?

'হে ভগবান। এই ছুঁড়ি তো আমাকে শেষ করবে। আর ছুঁড়ি অন্য কোথাও গিয়ে যদি মরে গো আমার ঘরের গ্রহ শান্তি হয়। মা বেটি তো ডাকেও না। আর ছুঁড়িটা যেখানে বসে সেখানে গোসাপের মতো লেপটে থাকে। কি করে এসব চোখে দেখা যায়? বেটি খাবে তো এক গামলা কিন্তু কাজের নামে গায়ে জ্বর আসে।'

আর ইহাতেও যেন যথেষ্ট হইল না, জীবার দেওরের গলা শোনা গেল—'ওঠ, ওখানে খাবার রাখা আছে। খেতে হয় খাও, না তো কুকুরে খেয়ে গেলে কালকের মতো না খেয়ে কাটাতে হবে। দেখ না, কেমন গুম হয়ে বসে রইল। রানীজি উঠে বসতেও পারল না।'

কাণজী ভগতজীর ঘর পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল, নতুবা কাণজী বোধহয় ফিরিয়াই যাইত। শেষে ভগতজীকে সঙ্গে লইয়া না গেলে তাহার মুক্তি নাই। কিছুদূর গিয়া ও ভগতজীকে প্রশ্ন করিল—'আচ্ছা, ভগতজী। নিত্যি কি এদের এরকম ঝগড়া চলে?'

'আর ভাই, এ তো তুমি আজ কমই দেখছ. কোন কোন দিন তো বেচারিকে ধরে মারে পর্যন্ত।' বলিয়া ভগতজী আশ্চর্য হইয়া কাণজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করে ছুটি পেলে?'

'ছুটি পাই নি, এমনি চলে এলাম,' বলিয়া কাণজী কোন বিষয়ে ডুবিয়া গেল, তারপর বলিল, 'এইসব শোকতাপের দীর্ঘশ্বাসের মূলে তো আমি—না?

'কার দীর্ঘশ্বাস?'

'এই মেয়ের—না বুঝে আমি তো করে বসলাম, কিন্তু ওর জীবনের আর রইল কি? ওর তো—'

ভগতজী বলিল—'এ দুনিয়াতে বেশি গভীরে যাওয়া অর্থহীন। এরকম দুঃখী তো দুনিয়ায় কতই পড়ে রয়েছে।'

তাঁর কথার মাঝখানেই কাণজী বলিল, 'তা ঠিক ভগতজী কিন্তু তাদের জন্য তো আমি দায়ী নই, কিন্তু এর জন্য…।'

'সব মিছে কথা। যদি চিন্তা না কর তবে কারো জন্যই তোমার দায় নেই। আর যদি মনে কর তবে সব মানুষেরই মানুষ মাত্রের জন্য দায়িত্ব আছে। কাজেই এ ধান্ধায় ঘুরে মরে লাভ কি?'

কাণজী একটু যেন মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'হায়! ভগতজী! তুমি লেখাপড়া জানা পাণ্ডত হয়েও একথা বলছ?'

ভগতজীকে থামিতে হইল। কাণজী বলিয়া চলিল। 'আচ্ছা, ভগতজী তুমি কি জান জীবী কি জন্য এখানে এসেছিল? কার জন্য?'

'আমি একলা নই, সারা গাঁ জানে। আমি তোকে বলতে চাই যে কি আর করা যাবে? আর আমার এটুকু মায়াদয়া আছে যে যেদিন ওর শাশুড়ি ওকে খাবার না দেবে সেদিন উপবাসী থেকে খিদেয় ও যাতে না মরে তা আমি দেখব। সে ও ঠিক হয়ে যাবে। তুই কেন মিছে এই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরছিস্?'

কাণজীর ইচ্ছা ছিল এই সময় ভগতজীকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া নেয়। কিন্তু ভগতজী ওকে টানিয়া নিয়া চলিলেন, বলিলেন, 'যখন সময় মতো এসে পড়েছিস্ তখন দু এক খানা নতুন গান শুনিয়ে যা।'

কাণজী গেল ঠিকই, কিন্তু গান একটিও গাহিতে পারিল না। ওর যেন বসিতেও কষ্ট হইতেছিল। সে ভগতজীর পিছনে একটা চৌকির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। যাহারা আদর করিয়া গানের জন্য ডাকিতে গিয়াছিল তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কাণজী বলিল—'গাইতে হয় গাও, নয়তো

গরবাকে চুলোয় ফেলে দাও।'

একটু হাসিয়া ভগতজী বলিলেন, 'তা গরবাকে কেন চুলোয় পাঠাব?' ভগতজী ইশারা করিয়া ঐ ছেলেদের দূরে সরাইয়া দিলেন। ভগতজী মনে করিলেন, জীবীর মাথা তো অর্ধেক খারাপ হইয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ইহারও। তাহার পর ভগতজী কাণজীর চাকুরির কথা এটা ওটা পাঁচ কথা বলিয়া কথার মোড অন্যদিকে ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন। 'কতদিন থাকা হবে কাণজী? এখন তো দেওয়ালি...'

'না, মনে তো করছি কালই চলে যাব।' কাণজীর বিশ্বাস ছিল ভগতজী হয়তো আশ্চর্য হইবেন, হয়তো উহাকে যাইতে মানা করিবেন। কিন্তু দেখিতেছি উল্টা সুরে তিনি খুশি হইয়া বলিতেছেন, 'তা ছুটি যদি না থাকে তবে তো যাওয়াই চাই। তবে, দেওয়ালির পরই না হয় দুদিনের ছুটি নিয়ে এস।'

কাণজী কথার মধ্যে বলিল, তা এখানে দেওয়ালির জন্যে আমার কি এসে যায়?' উহাকে সমর্থন করিয়া ভগতজী বলিলেন, 'বুঝদার লোকের মতোই এই কথা। বার বার খরচ খরচা করে কে আসে, আর ওদিকে মাইনেও তো কাটা যায়!'

কাণজীর কিন্তু ভগতজীর উপর একটু রাগই হইল। পাছে কিছু কড়া কথা বলিয়া ফেলে এই ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল। 'আমার মাথা ব্যথা করছে, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি' বলিয়া কাণজী চলিতে শুরু করিল।

ঘরে ফিরিয়া সে বারান্দার খাটের উপর শুইয়া পড়িল। কিন্তু কাণজী সোয়াস্তি পাইল না! খাটটা উঠানে নামাইয়া আনিয়া আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু পুরানো বন্ধু তারকারাজি আজ উহাকে আনন্দ দিতে পারিল না। ভগতজীর উপর রাগ তখনও পড়ে নাই বরং বাড়িতেছিল। তাহার মনে হইল ভগতজীর ব্যবহারিক জ্ঞান একেবারে নাই। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—'উনি তো জন্মাবধি নিঃসঙ্গ বৈরাগী, ওঁর কাছে কেই বা আপন, কেই বা পর! যার কোন মায়া মোহ নেই তার পক্ষে গীতার উপদেশ মেনে নিয়ে মোহবন্ধ থেকে সরে থাকা আর আশ্চর্য কি?'—শুধু ইহাই নয়, উহার ফিরিয়া যাওয়া যে ভগতজী সমর্থন করিলেন, তাহাতে যেন তাঁহারও কিছু স্বার্থ রহিয়াছে মনে হইল—এই কাণজীর যদি কিছু পয়সা হয় তবে

কি ভগতজীর কোনও কাজে লাগিবে?

মাঝখানে যে বাড়িগুলি আছে তাহার অপর পার হইতে আনন্দের মহাসাগর হিল্লোলিত হইতেছে আর এদিকে কাণজী শোকে দগ্ধ হইতেছে। হঠাৎ যেন কিছু স্থির করিল, এইভাবে বসিয়া সে বিড়বিড় করিতে লাগিল—'কাল চলে যেতেই হবে।' অপর দিকে কিন্তু তার মন প্রশ্ন করিতেছিল, 'তুই এলিই বা কেন আর যাচ্ছিস্ বা কেন?'

নিমেষের জন্য এমনও মনে হইল, 'থাক, একে নিয়েই পালিয়ে যাই।' পর মুহূর্তেই ওর হাসি পাইল—'এতই যদি সাহস থাকত তবে আর কথা কি ছিল? যা কিছু করার সবই তো সহজ ছিল। তখন কিছু করলি না। এখন আর কি করার আছে? দেখ তো বেচারির কি দশা হয়েছে।' ওর চোখে ভাসিয়া উঠিল জীবার সেই মেলায় দেখা চেহারা। সেই সুন্দর চোখের কাজল, চোখের তারায় স্বপ্নালু আবেশ, কাণে সোনার কর্ণফুল, রহিয়া রহিয়া নতুন ইশারায় বেজে ওঠা নূপুরের ধ্বনি, গর্বিত চলন, সেই গোলাপের গাল দুটি যাহা অল্পেই রক্ত রাঙা হইয়া উঠিত।

সে সময় নবীন যুবতীর কি রূপ! উদ্ধত যৌবন যে সাটিনের কাঁচুলির বন্ধনে ঢাকিয়া রাখা যাইত না।

আর আজিকার জীবা! অস্থিচর্মসার দেহ, পাঁজরগুলি গোনা যায়, গাল দুইটি বসিয়া গিয়াছে। নিষ্প্রভ চোখ, মরুভূমির শুষ্ক হাওয়ার মতো উদাস চাহনি আর যখন সে চলে মনে হয় যেন কেহ তাহাকে চালাইতেছে বলিয়াই চলে—এই জীবার কথা মনে করিয়া কাণজী বলিল—'ওর আজ আর কি আছে?'

'আমার জন্যই এসব হল'—মনে হইতেই ও ভাবিল এখনই গাঁ ছাড়িয়া যায়, পা অবশ না হইলে তাহাই করিত।

শেষ পর্যন্ত কখন রাত ভোর হইবে, আর এইসব ঝঞ্ঝাট হইতে বিদায় লইবে—মনে এই কথা তোলপাড় করিতে করিতে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু ঘুম কি আসে? মনে কত কথা উঠিল, একবার মনে হইল, 'একবারটি দেখাও করব না?' আবার ভাবিল, 'কোন্ মুখেই বা যাই? আর, দেখা হলেই বা ওকে কি বলব? কি বা প্রশ্ন করব? না, দেখা করা ঠিক হবে না।' শেষ পর্যন্ত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াই সে স্থির করিল।

সত্য বলিতে কি ও তো জীবীর মুখের দিকে চাহিতেই পারিতেছিল না— কথা বলা তো অসম্ভব!

পরদিন দাদা-বৌদির কাছে বিদায় নিল। হীরাকেও ডাকিয়া পাঠাইল। ভগতজীকেও ডাকিয়া পাঠাইতেছিল, কিন্তু তখনই আবার মনে করিল, দরকার কি, আমি নিজেই দুই পা হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাই বলিয়া ভগতজীর কাছে গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া আসার সময় দেখিল জীবী ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছে! দুইজনের চোখে চোখ পড়িতেই ও সরিয়া গেল।

আরও কিছু শুনিবার আশায় জীবী কান পাতিয়া রহিল কিন্তু সে কি জানিত যে কাণজী দুইদিন পরেই চলিয়া যাইবে? কিন্তু কাণজী এখন একেবারেই চুপ।

ফিরিয়া যাইতে কাণজীর আর বিলম্ব হইল না।

এবার কিন্তু মুখের ভাব আগের বারের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাকে ভারাক্রান্ত বলা যায়। দাদা-বৌদির উপর যদি ভালবাসা না থাকে, হীরা আর ভগতজীর কাছ হইতে বিদায় লইতে তাহার কষ্ট হইল না। কিন্তু আজ যেন সকলের উপর তাহার একটা বিরক্তির ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহারা সবাই বেশ আছে, জাত আছে, জ্ঞাতি কুটুম আছে, ঘর বাড়ি আছে, জমি জায়গা আছে—কিন্তু কাণজীর কি আছে, তাহার আপন বলিতে তো একজনও নাই। অন্যের কথা দূরে থাক, ভগতজীর মতো লোকেও উহাকে ফেলিয়া ঐসব লোকের জমায়েতে মিলিয়া গেলেন। সারা পৃথিবী কাণজীর কাছে স্বার্থপর মনে হইল। এই স্বার্থপর পরিবেশ হইতে যত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়া যায়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি চিন্তা উহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল 'আমি তো ছুটে পালিয়ে যাব! কিন্তু ও বেচারি কোথায় যাবে?' আর রাগও হইতেছিল? ভগবান যদি উহাকে মারিয়া ফেলিতেন তাহাও ভাল হইত!

দাদা-বৌদি, ভগতজী ইহাদের কাছে বিদায় নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হীরা সঙ্গ ছাড়ে নাই। কিছুদূর পিছন পিছন আসিবার পর কাণজী বলিল, 'হীরা, তুই কেন আর আসছিস? যা ফিরে যা!'

'কিন্তু আমি ভাবছি, এমনটা হলো কেন? এই তুই চাকরিতে গেলি।

আবার এরি মধ্যে ঘরে ফিরে এলি। তুই খ্যাপা কুকুরের মতো এমন করে ফিরছিস কেন?'

কাণজীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। একটু যেন কষ্টে বলিল, 'হীরা তুই এসময়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিস না।' চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, 'তুই তো সব জানিস হীরা, তুই কেন অষ্ট প্রহর আমাকে প্রশ্ন করছিস? সত্যি কথা বলতে কি তোরা আমার গত জন্মের শত্রু।' কি যে বলিতেছে কাণজীর যেন কোনও হুঁশই নাই!

হীরা স্তব্ধ হইয়া গেল। 'এ তুই কি বলছিস্ কাণজী! আমরা তোর কি করেছি যে এসব বলছিস্' বলিয়া চোখ বড বড করিয়া কাণজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

তখনও বিহ্বলভাবে কাণজী বলিল—'না, না। আমি তোকে দোষী করছি না। দোষ তো আমার নিজের। আর যদি কারো দোষ থাকে, সে বিধাতার।'

হীরার একটা সন্দেহ ছিলই, তবু নিশ্চয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল, 'তা, বিধাতা তোর কি বাদ সাধলেন?'

'কিছু না, যা বিগড়বার ছিল, হয়ে গেছে। এখন বললেই কি, আর না বললেই বা কি?' কাণজীর গভীর একটা শ্বাস পড়িল। তাহার কান্নার বেগ তখন কমিয়া গিয়াছে!

'তাহলে বল—বিলাপ করতে করতে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিস্ কেন? নে, নে, তামাক খা!' এই বলিয়া হীরা উঠিয়া দাঁড়াইল। কল্কের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'যা হবার তা হয়ে গেল, এখন দুঃখ করে আর লাভ কি?'

কাণজীর মুখে আসিল—'এখন পর্যন্ত তো কিছু বিগডায় নি। কিন্তু হীরা তোমরা মানছ কোথায়? তোমাদের মতো লোকে যা বলে বলুক, কিন্তু ভগতজীর মতো বাস্তব লোকেরও যখন লোক চরিত্রের জ্ঞান এমন কম, তখন আর বলার কি আছে?' দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

'তুই কি বলতে চাস। খুলে বল্ তো!'

'মরুক গে, চল্! দে একটু টান দিয়ে নিই।' ছিলিম টানিতে টানিতে

কাণজী বলিল, 'আচ্ছা চলি এবার।'

বিদায় আলিঙ্গনের পর চোখ মুছিতে মুছিতে হীরা বলিল, 'এসব বাজে কথা ছেড়ে দে, এই নিয়ে আর দুঃখ করিস না। চিঠি লিখিস্, দেখ ভুলে যাস না।'

জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে কাণজী বলিল, 'মানুষের কি কিছু ঠিক আছে হীরা? একদিন তো সবই ভুলতে হয়। তোর সেই দোহাটা মনে আছে তো?—

'একদিন তো ভুলব আমার মা-বাপকে
সঙ্গী-সাথীদের ভুলব
স্ত্রীকে ভুলব—উপকার ভুলব
হয়তো নিজেকে ভুলব—ভুলব সারা সংসারকে!
দুঃখীর দুঃখ ভুলব, ভুলব অভাগাদের,
মাদকতা মাখা মধুর প্রেমের বিষয়ও ভুলব
একটা জিনিস কোনও দিন ভুলব না যে
তোমাকে কোনও একদিন ভালবেসেছিলাম।'

'এই বেশ, হীরা।' চোখের জল পাছে গড়াইয়া পড়ে তাই সে পথের দিকে পা বাড়াইয়া দিল। বলিল, 'হীরা, মাঝে মাঝে মনে করিস। আর কি? আর, ভগতজীর সঙ্গে যখন কথা হবে, তখন বলিস তাঁকে মনে করতে করতেই চললাম।' রাস্তার বাঁকে গিয়া আবার পিছন ফিরিয়া চাহিল—কিছু বলিবে না ভাবিয়াছিল কিন্তু না বলিয়া পারিল না—'হীরা, ঐ অভাগিনীর মাঝে মাঝে খবর করিস'—ইহার বেশি আর কিছু বলিতে পারিল না, পিছন ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

নদীর ধারে আসিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল আর জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিতেছিল। নদীর ধারে কাণজী সেই গাছটার দিকে একবার তাকাইল। হঠাৎ দেখিল ভগতজী যেন নামিতেছেন। কাঁধের উপর তাঁর কাপড় দেখিয়া মনে হইল, কাপড় কাচিতে আসিয়াছেন। দাঁড়াইয়া পড়িতে মন চায়। নিজেকে যেন ধাক্কা দিয়া বলিল, 'এই তো দেখা করে এসেছ, বার বার কত দেখা করবে?' কিন্তু তখনই ভগতজীর গলা শোনা গেল, 'কাণজী একটু অপেক্ষা কর।'

কাণজী থামিল।

কাণজীর কাছে আসিয়া ভগতজীই কথা শুরু করিলেন, 'ভালই হল। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমার কাছে বিদায় নিয়ে ঘরে তো গেলাম কিন্তু মন আমার সুস্থির হল না।' একটু থামিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'কাণজী আমি তোর মনের কথা, তোর দুঃখ সবই জানি। কিন্তু এ সবই বিচিত্র ব্যাপার এসব কথা ভুলে যা। কিন্তু আমার একটা কথা তোকে বলার আছে—বিষে ধূলিয়ার মৃত্যু হয়েছে, একথা খুব সত্যি, কিন্তু ঐ রুটি বেচারী জীবী নিজের জন্যই বানিয়েছিল যদিও…'

কথার মাঝেই কাণজী বলিয়া উঠিল—'আমি তো ভাবতাম ও হয়তো রাগের বশে ধূলিয়াকে বিষ দিয়ে থাকবে। কিন্তু…'

কিন্তু ও রাগ করেও তা করে নি'—বলিয়া ভগতজী সংক্ষেপে সব কথা ওকে শুনাইলেন। তারপর বলিলেন—'আর ভাই, ওর দিন ফুরিয়েছিল, তাই ও এভাবে চলে গেল।' কাণজীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, তাহার চোখে মনের তোলপাড় ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার বলিলেন, 'এতে কারো দোষ নেই কাণজী। বৃথাই ঐ বেটিকে দোষ দেওয়া হয়, কিন্তু তারই বা উপায় কি? এক আধজনকে তো বুঝান যায়, কিন্তু সারা গাঁয়ের লোকের মুখ কি করে বন্ধ করা যাবে?' 'ঠিক কথা' বলিয়া কাণজী চুপ করিয়া গেল দেখিয়া, 'যাক্ এই কথাই তোকে বলার ছিল।' বলিয়া তারপর স্তব্ধ কাণজীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'যা, তবে এখন যা! আর দেরি করিস না' তিনি উহাকে রাস্তায় আগাইয়া দিলেন।

'খুব ভাল হল, ভগতজী। তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে সত্যি কথাটা বলে দিলে।' তখন শ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগতজীর দিকে চাহিয়া কাণজী বলিল, 'কিন্তু ভগতজী!'

'আরে, আবার যদি তুই কথা শুরু করিস্ তবে অনর্থক দেরি হয়ে যাবে! আমি বলদ দুটো খেতের ধারে বেঁধে রেখে এসেছি—আর কারও খেতে যদি ঢুকে পড়ে তবে তো…।'

কাণজী আবার করুণ চোখে ভগতজীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তিনি ততক্ষণে খেতের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া কাণজী শুধু এইটুকুই বলিতে পারিল, 'আচ্ছা ভগতজী, চললাম।' তারপর

মাথা হেলাইয়া চলিতে লাগিল।

ভগতজী অনেকক্ষণ ধরিয়া উহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, গভীর বেদনার সঙ্গে বলিলেন, জানি না ভগবান মানুষকে হৃদয় ও বুদ্ধি দুইটি জিনিস একসঙ্গে দিয়া ভাল করিয়াছেন না, মন্দ করিয়াছেন?

রাস্তায় পা বাড়াইয়া কাণজীর মন বিলক্ষণ খারাপ হইয়া গেল। উহার ভাবনা হইল, 'ও যদি বিষ খেয়ে নিত? এভাবে যদি নিজের জীবন শেষ করে দিত? তাও তো ওর নিজের হাতে!' কাণজীর মুখ হাঁ হইয়া গেল, নিজের মনেই বকিতে লাগিল, 'যদি এরকম কিছু ঘটে, আমি দুনিয়ায় মুখ দেখাব কি করে? আমার মুখ দেখলে লোকের পাপ হবে।'

ফিরিয়া গিয়া জীবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া উহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হইল। কিন্তু সসম্মানে যেখান হইতে বিদায় নিয়াছে সেখানে আর ফিরিতে পারিল না। আর পাছে ফিরিয়া যায় এই ভয়ে জোরে পা চালাইয়া দিল। ভগতজীর উপর একটু রাগ হইল, 'বেশ লোক যাহোক, আমাকে আগে তো বলতে পারতেন!'

সে এমন জোরে ঠোঁঠ কামড়াইয়া ধরিল যে রক্ত বাহির হইয়া আসে। নিজের মনেই বলিল, 'আচ্ছা পাগলি, আমার কথা না-হয় থাক্, তুই তো একবার দেখা করতে পারতিস্।'

আবার হাসিও আসিল, 'তোমার নিজের কথা বল। এত খরচা করে এখানে এসেছিলে কেন?'

দেখা হল না।

কিন্তু অন্যদিকে জীবীর আত্মা—তাহার ভিতরকার সত্তা কি কহিতেছিল জীবী যদি সেই কথা বলিতে বসিত তাহাও বলিতে পারিত না। যখন সে কাণজীকে ভগতজীর বাড়ি হইতে দেখিল, তখন সে কি করিয়া মানিয়া লইতে পারিত যে তাহার সহিত দেখা না করিয়াই—তাহার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে যাইতে পারে। নাথী জল ভরিয়া ফিরিবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'জীবী বৌদিদি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি কাণা ভাইয়ের,' জীবী তখন 'না' বলিয়া জবাব দিয়াছিল। তখন তাহার আশ্চর্য লাগিয়াছিল। সে আবার বলিল, 'কেন, তোমার সঙ্গে দেখা না করিয়াই চলিয়া গেল?' 'না, না, কেন মিথ্যে কথা বলছ!'

জীবী একদম থামিয়া গেল। বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চলে গেল?' যখন নাথী জবাব দিল, 'তবে কি আমি মিছে কথা বলছি?' তখন তাহার মুখের উপর অনেক ভাবের প্রকাশ পাইল। মাথার উপর যে কলসী ছিল, তাহা যেন উড়িয়া গিয়াছে। মনের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে গিয়া যেন বিকল হইয়া গেল। এইভাবে তাহার মন দমিয়া যাইতেছিল। তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া নাথীর একটু ভয়ই লাগিল, বলিল—'চল না। পাগলীর মতো কি করছ?' জীবী পা বাড়াইল—কিন্তু তাহার হুঁশ ছিল না, সে কতবার জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি চলে গেছে?' কতবার প্রশ্ন করিল তাহা নাথীও গোনে নাই।

কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাডানো নাথীর পক্ষে কঠিন হইল।

র মনে হইল, যে এই সময়ে আকাশ মণ্ডলের নীচে সে একা পড়িয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সে এই একটি কারণেই বাঁচিয়া আছে। কখন কাণজীর সহিত নিজের অন্তরের কথা বলিবে—'শুনছ আমি বিষ দিই নি।'—সেই পর্যন্ত বাঁচিযা থাকা। কাণজী আসিযাছে দেখিযা তো সে খানিকটা খুশিও হইয়াছিল, তার সাহসও হইয়াছিল। কিন্তু যখন এই খবর শুনিল তখন তো বুঝিযা উঠিতে পারিল না যে কোথায যাইবে, কি করিবে।

জীবী কলসী নামাইয়া বাহিরে আসিল। ভগতজী কাপড শুকাইয়া বসিতে যাইবেন এমন সময জীবীর নজর তাঁহার উপর পডিল। জীবী সোজা ভগতজীর নিকট গেল। বাঁশের খুঁটির আডালে দাঁডাইযা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগতকাকা তোমার সাথা কি চলে গেল?'

এই ডাকে এমন কিছু ছিল যাহাতে ভগতজীর তো কথাই নাই, বড় বড় মুনি ঋষিরাও তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তো তাঁহার মনে হইল রাগ করেন, কিন্তু তখনই এক দীর্ঘশ্বাস নিলেন ও জিহ্বা সংবরণ করিলেন। শান্তভাবে বলিলেন, 'হাঁ গিয়েছে।' ভগতজীর ভয় ছিল হয়ত সে কাঁদিয়া উঠিবে, নয়তো অজ্ঞান হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল সেই ভয় অনর্থক।

ফিরিয়া আসিবার পর জীবীর ডাক শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার বিড বিড় করা কথা—'আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হল না।' বাড়ি পৌছিতে তাহার কষ্টের শেষ রহিল না। বুক ধড়ফড করিতেছিল।

একাই প্রশ্ন করিতেছিল—'আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না।' পায়ের নীচের মাটি যেন সরিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতেছিল। কান শোঁ শোঁ করিতেছিল। মুহূর্তের জন্য জীবীর মনে হইল, 'আমি কোথায় আছি।' পরমুহূর্তেই সে নিজে কোথায় সে কে ইত্যাদি প্রশ্ন কিছুই বাদ থাকিল না।

এখন যদি পৃথিবী সরিযা যায় আর নাই যায় তবে কি হইবে? এখন আকাশও হাজার গুণ জোরে ঘুরুক না। এখন যদি কাণজী তাহার সঙ্গে জন্মভোর দেখা না করে তাহাতে কি আসে যায়? হইলেও ক্ষতি নাই। এখন তো সে নিরানন্দ অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে সূর্য যেমন ওঠে তেমনই উঠিতেছিল, নিয়মানুযায়ী অস্ত যাইতেছিল, সেই বৃক্ষরাজ, সেই নদী, সেই নভোমণ্ডল। পৃথিবীর লোকজনও তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করিয়া যাইতেছিল। ইহার মধ্যে কোনও নূতনত্ব ছিল না। অন্যদিকে জীবীর জগতের সূর্য উঠিয়াই অস্ত যাইতেছিল। সে মধ্যাহ্নেই আকাশে তারা দেখিতে পাইতেছে এই মনে করিয়া চাহিয়া থাকিত। যখন সে কথা শুরু করিত ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় দুরূহ তত্ত্ব কহিত, অথবা সম্পূর্ণ নির্বাক হইয়া সমান্তরাল রেখার পরপারের রহস্য উন্মোচনের ভঙ্গিতে চাহিয়া থাকিত। লোকে কহিত, নিশ্চয়ই ধূলিয়ার প্রেতাত্মা উহার উপর ভর করিয়াছে। অন্য লোকে বলিত যে তাহারা রেশমায় নিকট হইতে জানিয়া আসিয়াছে যে এসব মিথ্যা, ধূলিয়া যখন জীবিত ছিল তখনই জীবীর উপর তুকতাক করা হইয়াছিল। তাহার পর লোকে ভাবিতে লাগিল, যে ঐ তুকতাকের দ্বারা মোহাবিষ্ট হইয়াই হয়তো সে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে। এইসব মনে করিয়া তাহারা আপন আপন কাজে চলিয়া যাইত কখনও কখনও ঘুরিতে ঘুরিতে সে খেতে পৌঁছাইয়া যাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিত—'তুমি তোমার স্বামীকে কেন বিষ খাইয়েছিলে?' সেই সময় 'স্বামী' শব্দটিকে অবলম্বন করিয়া সে বলিতে থাকিত—'আমার স্বামী? উনি তো বিদেশে চাকরি করতে গেছেন'—বলিয়া সলজ্জ হাসিতে শিশুর মতো সে বলিতে থাকিত, 'ও আমার জন্যে শাড়ি আনবে, বালাও নিশ্চয় আনবে বলেছে।' কখনও বা সে কথার মাঝখানে গালি দিতে শুরু করিত—'রেখে দাও ওই মুখপোড়ার কথা! ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। যখন ওর সঙ্গে দেখা হবে তখন ওর খোঁজ খবর নেব।'

এই প্রকার আত্মহারা অবস্থায় সে পৌঁছাইয়া গিয়াছিল। আর এই অবস্থায় হয়ত রাস্তার লোককে অনুনয় বিনয়ও করিতে থাকিত 'তাঁকে বোলো, জীবী তোমাকে খুব মনে রেখেছে। তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ, না? আমাকেও নিয়ে চল। আমার তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।' আর সেই পথিক, 'ভাগ পাগলী' বলিয়া প্রায়ই তাহাকে মারিতে যাইত। যদি নাও মারিত তবু ধাক্কা তো দিতই।

রাত্রে কখনও সে বুড়ির বারান্দায় মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিত নয়তো কোনো দয়ালু ব্যক্তির বাড়িতে সামান্য রুটি খাইয়া তাহারাই বারান্দায় আসিয়া এককোণে পড়িয়া থাকিত। কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাথার চুল এলোমেলো ধূলামাখা, একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে, স্নান তো কবে করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। একেকবার গাঁয়ের ছেলেপুলেরা ছুটিয়া আসে, 'ওরে পাগলী এসেছে, পাগলী এসেছে।'

এইসব দেখিয়া ভগতজীর মুখে 'আহা' বাহির হইতে চায়, বলে যে— 'হে ভগবান, একদিন যার নজরে পড়লে ভালো ভালো যুবক নিজেদের ধন্য মনে করত আর যার সঙ্গে কথা বললে আনন্দ বোধ করত, তার আজ এই দশা! কোথায় জন্মেছে, কোথায় মন দিল, কোথায় বিয়ে হল আর আজ কোথায় গিয়ে পড়ল।' ভগতজীর নিজের মনোভাব যেমন যেমন বদল হইতে থাকিল, তেমন তেমন মনে মনে বলিতে থাকিতেন 'না, না, ভগবান তুমিই মানুষ গড়েছ। কিন্তু শেষকালে মেয়েদের মন গড়ে তুমি হাত ধুয়ে ফেলেছ।'

দেওয়ালির পাঁচ দিন বাকী। কাণজীর নিকট হইতে কোনো জবাব না পাইয়া দাদা ভগতজীর নিকট পুনরায় চিঠি লেখাইতে আসিল— 'ভগতজী! কাণজীর কোনোও চিঠি আসে নি আর আমরা তার বিবাহের জন্য লক্ষ্মীপূজার দিন ঠিক করেছি। তুমি পরিষ্কার লিখে দাও যে ভুরা পটলের মেয়ে রূপীর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, এজন্য দেরী না করে যেন চলে আসে। কথাটা গোপন রাখার কি দরকার?'

শুধু ইহা নয়, হীরাও ভগতজীর কানে কানে কিছু বলিয়া সম্মতি জানাইয়া পাঠাইল—'সঙ্গে সঙ্গে এও লিখে দাও যে জীবী পাগল হয়ে গিয়েছে। যাতে ওর মনে যদি কিছু থেকে থাকে তাও যেন বের হয়ে যায়।'

বেচারা ভগতজী, তিনি এ সময় কিছু বুঝিতেই পারিতেছিলেন না, কখনও এই দুজনের কথা ভাল লাগিতেছিল, কখনও বা খারাপ লাগিত। এজন্য তিনি প্রথমবার সমস্ত গোলমাল রাখিয়া কাণজীকে শুধু লিখিলেন—'তোমাকে দিয়া কাজ আছে, তাই শীঘ্র এস।' কিন্তু তাহার এই লেখার ফল হইবে না দেখিয়া ইহার পর 'যা হবে তা হবে' বলিয়া ইহাদের কথামতো লিখিয়া দিলেন।

লক্ষ্মীপূজা পার হইয়া গেল। দেওযালিও আসিয়া পড়িল। কিন্তু না আসিল কাণজী, না আসিল চিঠি। পরিবর্তে নানা কটারা খবর আনিল যে কাণজী দেওয়ালির পর বাড়ি আসিবে না। দাদা ভগতজী ও হীরা তাহাকে অনেক রকম প্রশ্ন করিল, কিন্তু সকল প্রশ্নেরই এক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর। অনেক বার তো কাণজীর বিষয় কথা হইতে হইতে সে উঠিয়া যাইত।

দেওয়ালির দিন হীরার বাড়ি খাওযা-দাওয়া করিবার পর ভগতজী নিজের বারান্দায় বসিযা আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন 'পাগল রে! পাগল!' ছেলেদের চিৎকার ও বাজীর শব্দ। ভগতজী অমনি উঠিলেন এবং লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শিশুদের দলে আসিযা পৌঁছিলেন। শিশুদের ধমকাইয়া হটাইয়া দিলেন। জীবীকে লইযা হীরার বাড়িতে আসিলেন। কংকুকে বলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইলেন। বাহিরে আসিযা কংকুকে বলিলেন—'এই পাগলের দিকে একটু নজর রেখো। আর কিছু নয়, কোনো দিন যদি রুটি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর ওর দেখা পাও তো ডেকে এক টুকরা রুটি দিয়ে দিও। এর পক্ষে ও টুকুই যথেষ্ট।' এই বলিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় জীবীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। উহার অবস্থা দেখিয়া ভগতজীর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

এক আত্মা দুই দেহ

কার্তিকী পূর্ণিমা দিন দিন নিকটে আসিতেছিল। বারো মাসের পর বাওজী দেও জাগ্রত হয়, তাহার নাকাড়ার শব্দ শুনিয়াই যেন আশপাশের লোকেরা কাজকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে। দুই দিন পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে, গ্রাম হইতে কে কে যাইবে এবং কে কোন পোষাক পরিয়া আসিবে। পাপের বিচার যাহারা করিবে তাহারা পাপ ধুইতে যাইতেছে, যাহারা না করিবে তাহারা বাড়াইতেও যাইতেছে। এমন কেহ কেহ ছিল যাহারা নাগধারায় স্নান করিয়া ও খেলিয়া মুক্ত হইতে যাইতেছে। শেষে যাহারা পাপ ধুইতে যাইত তাহাদের পাপ বাড়িয়া যাইত আর যাহারা বাড়াইতে যাইত তাহাদের অনায়াসেই কমিত। অর্থলাভের জন্য যাহারা যাইত তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

'পৃথিবীর উপর যত তীর্থক্ষেত্র আছে সব নিজেরই ভিতর আছে' ভগতজীও একথা স্বীকার করিতেন তবুও তিনি এই পূর্ণিমার মেলায় না যাইয়া থাকিতেন না। গ্রামের লোকেরা দুই তিন দিনেই ফিরিয়া আসিত কিন্তু ভগতজী আট দশ দিনের জন্য বাসা বাঁধিতেন। এ বৎসরেও ভগতজীর দলের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। হীরা ও মনোর তো ছিলই, আরও দশ পনের জন আধবুড়ো ও যুবক যাওয়ার জন্য তৈয়ারি ছিল।

নানাও কার্তিক মেলায় যোগ দিয়া সোজা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিত 'এ বৎসর তুই কতবার এসেছিস্ নানা, তার মধ্যে তুই কুড়ি দিন ছুটি একেবারেই কাটিয়ে দিলি ?'

নানা হাসিয়া জবাব দিল—'যা হয় হোক। ভাইদের সঙ্গে যতদিন কাটাতে পারি সেই ভাল। আবার যদি ছুটি পাই তবে নেব না কেন ?'

'আচ্ছা ভাই, আচ্ছা', বলিয়া সকলে নানার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—'সত্যিরে ভাই! বিদেশের ব্যাপার। কে জানে কে বাঁচবে কে মরবে! এতো বটেই!'

অন্ধকার হইবার পূর্বেই পৌঁছিব ভাবিয়া গ্রামের দল ত্রয়োদশীর খুব ভোরেই রওনা পড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ দলের মধ্য হইতে নানা 'ওরে বুড়োদের সঙ্গে খোঁড়াতে গেলে আমাদের চলবে কেমন করে? কাল মুরগির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উঠব আর দুপুর হতে না হতে ঠিক বাবাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছব। সঙ্গে সঙ্গে একাদিন ঘরের কাজও করে দেব।'—এই বলিয়া নিজের সাথীদের লইয়া চলিল।

যেন হঠাৎ মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাবে নানা দুই এক জায়গায় বলিল—'বেচারি এই জীবীকে কেউ বাওজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে না! নাগধারাতে স্নান করার মাহাত্ম্য এত বেশি যে এই পাগল করার দেবতাও গুটিয়ে পালায়।'

তখন সামনের একজন লোক বলিয়া উঠিল—'বেচারিকে নিয়ে গেলে খুব পুণ্য হত।' মোড়ল অমনি জীবীকে নানারই ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। 'ওরে তুই তো নিশ্চয় যাবি নানা? যদি তোর মতো দুই-চারজন থাকে তবে বেচারিকে নিয়ে যা না। বল তো ওর খাওয়া দাওয়ার জিনিসপত্র আমার কাছ থেকেই এনে দিই। আমার তো বিশ্বাস ও ভাল হয়ে যাবে। বুঝেছ নানা, আমার পিসিরও ঐ রকম হয়েছিল, নাগধারার স্নান করে টাকায় আট আনা মতো সেরে গেল। এর জন্য এতখানি তো করাই চাই। বদল হয় তো এর ভাগ্য, আর না হলে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ফিরিয়ে পাঠানো।'

নানা রাজি হইল। 'আচ্ছা মোড়ল কাকা, কিন্তু রাত্রে ওকে নিজের কাছে এখানে শুইয়ে রাখতে হবে। না হলে মুরগির ডাকের সঙ্গে কোথায় খুঁজতে যাব। একবার গাঁয়ের থেকে বাইরে নিয়ে গেলে ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে যাব।'

'আরে সে কাজ আমাদের', বলিয়া মহল্লার লোকেরাও পুণ্যকর্মের জন্য হাত বাড়াইল।

মুরগি ডাকিতেই চারজন যুবক জীবীকে সামনে রাখিয়া মেলায় রওনা হইল।

পথে চলিতে চলিতে চলিতে নানা জীবীর সঙ্গে আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিল। কখন সে বাঁকা পথে চলিবার জিদ্ করিয়া বসিত, কখনো মারামারি করিতে যাইত।

'...ক কাটা আমাকে শহরে নিয়ে যাবে, এই বলে আমাকে ধোকা

দিচ্ছে, না?' এই বলিয়া পাথর ছুঁড়িতে যাইবে, কিন্তু নানা তাহাকে আবার বুঝাইত—'আরে না, না, জীবী বৌদি, আমরা তোমাকে তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।' ইহার পর জীবী হয়তো খুশি হইয়া উঠিত, নয়তো আরও রাগ করিত। ইহার মধ্যে খাইতে দিলে চুপ করিয়া থাকিত। রুটির টুক্‌রা চিবাইতে চিবাইতে বলিত— 'আরে তোমরা যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু তোমরা কি ওকে চেন? তোমাদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে, বুঝতে পার? সত্যি বলছি, পালাও।'

নানা ছাড়া সকলে হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসাও করিল—'তোমার উনি কোথায়? বেচারিকে তো বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছ।'

একবার বিষের নাম শুনিতেই জীবীর মেজাজ সপ্তমে উঠিল—'বিষ তো তোর মা দিয়েছিল!' পরে কাঁদিতেও লাগিল—'হায় হায় ওকে বিষ দিয়েছিল!' আর এইভাবে পথ চলিতে চলিতে যাত্রীদের কাঁদাইত, কখনও পেটে খিল ধরে এমন হাসাইতে হাসাইতে জীবী দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজী নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

কেবল পাহাড়ের নীচে অবস্থিত ভগবানের মন্দিরের আঙিনায় নয় বরং সমস্ত অঞ্চলই লোকে ভরপুর ছিল। পঁচিশ ত্রিশটি বাজারই ছিল। বাজারে শুধু মাল বিক্রয় করিতে বড় বড় শহরের নূতন নূতন ব্যাপারীরা আসিয়াছিল। হাজার হাজার লোক জাপানী খেলনার মতো এই দোকানদার এবং ইহাদের জিনিসপত্র দেখিতেছিল। এই প্রকারে এক এক পয়সায় 'জার্মানকো রাজা দেখো'র বদলে পর্দার উপর তুফানি সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চিলিমের ধোঁয়া দেখায় এইরূপ সিনেমাযন্ত্রে দিনে দুপুরে ভিড় জমিয়া যায়। রামলীলা আর যাত্রার বদলে 'বাণা-বেলীর' প্রাচীন শৃঙ্গার রসের নাটক অভিনয় হইবার কথা ছিল রাত আটটায়, সন্ধ্যা চারটা হইতে সে জন্য লোক বসিয়া থাকিল। সব চেয়ে বেশি দামের দুই টাকার টিকিটও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

ভোরবেলা হইতে রাত পর্যন্ত পনেরোটি নাগরদোলা চলিতেই থাকিল।

বাঘকে ছাগল যাহারা করিতে পারে (জ্ঞান থেকেই ইহা সম্ভব) সেই সারকাসের উপরে টাঙানো তাঁবুর দরজায় লোকের এত ভীড় যে তাহার মধ্য দিয়াই যাহা কিছু দেখা যায়। আবার 'ধড় কথা বলে' ও 'মাথা হেঁটে, [illegible]'

ইত্যাদি চমৎকার দৃশ্য দেখিতে লোকের কি ভিড়! মিঠাইয়ের দোকানে ও হোটেলাদি স্থানে ভাগ্যে থাকিলে জিনিসপত্র পাওয়া যায়। না হইলে ধাক্কা খাইয়া পিছনে হটিতে হয়। আর বাবাজীর বিশাল দরজার কথা আর কি বলিব? যদি নদীতে জলের বন্যা দেখিয়া থাকেন তবে সেখানকার ভিড অনুমান করিতে পারা যায়।

এ তো গেল প্রধান বাজারের কথা। বাহিরের অংশে চারগুণ ঘুরিতে-ছিল। প্রত্যেক পাহাড়ের উপর কিছু না কিছু ছিল। আর কিছু না হোক কোন সাধুর সমাধি তো অবশ্যই ছিল। সেখানে প্রদক্ষিণ না করিলে বাবাজীর দর্শন করাই ব্যর্থ হইয়া যায়। চুরাশি লক্ষবার জন্ম হইতে এইরূপে মুক্তি হয়। সাধারণত যে সব পাহাড়ের কোলে কদাচিৎ লোক দেখা যায়, আজ সেখানে প্রতিটি পাথরের উপর লোক। ইহা ছাড়া তরাইয়ের অন্য দিকে গাড়ি ঘোডা গাধা প্রভৃতি এত সংখ্যায় পডিয়াছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি কোন ক্রমে বসান হইয়াছে। অন্য দিকে বিক্রীর জন্য আনীত হাজার হাজার বলদ সমুদ্রের ফেনার মতো দেখাইতেছিল।

সন্ধ্যার পর মোটরে করিয়া লোকেরা আসিয়া নামিতেছিল।

এই পর্যন্ত নানা জীবীকে লইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখনই তো বাস্তবিক সাবধান হবার দরকার ছিল। বডই পরিশ্রমে গ্রামের লোকদের খুঁজিয়া বাহির করা হইল। জীবী খিল খিল করিয়া হাসিতেছিল, তাহার দিকে নজর পড়িতেই ভগতজী বলিয়া উঠিলেন ‘আরে, এই পাগলিকে এখানে কে আনল?’

নানা যেন গাঁয়ের লোকদের গণিয়া দেখিতেছিল এমন করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া উত্তেজনার সঙ্গে বলিল—‘কি করি ভগতকাকা অনেক মানা করলাম, কিন্তু মোড়ল বলল, নিয়ে যাও একবার নাগধারায় স্নান করাও, বাবাজী ঠিক করে দেবেন।’

‘ওরে বাবাজী কি আর ভাল করবেন? বাবাজী যদি ঠিকই করতে পারতেন তাহলে পাগলিই বা করলেন কেন?’ ভগতজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন।

নানাজী আবার এদিক ওদিক দেখিতে ভগতজীর গলা শোনা গেল—‘[illegible]দের খাওয়ার কি হবে?’

সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই নানা বলিল—'আমাদের কাছে রুটি ছিল। সন্ধ্যা সন্ধ্যা সূর্য ডুববার সময়ই খেয়েছি। কিছু খাওয়ার দরকার নেই।' অমনি দূর হইতে এক মোটর আসিতেছিল তাহার দিকে সে দেখিতে লাগিল।

একে তো হিম, তাহাতে উপর হইতে আশপাশে ঝর্ণা, সবদা জল পড়িতেছে, এজন্য মনোরম ঠাণ্ডা। কিন্তু আচ্ছাদন বস্ত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রত্যেকের এক এক জোড়া অতিরিক্ত কাপড়েই পরা ও বিছানার কাজ একসঙ্গেই চলিত। কিন্তু জীবীর কাছে তো তাহাও ছিল না। শেষে ভগতজীই দুঃখিত হইয়া তাহাকে নিজের ধুতি দিয়া আগুনের এক-প্রান্তে শোয়াইয়া দিলেন। দুইবার উলটা সোজা নানারকম কথা শোনাইয়া বক বক করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। নানাকেও কিছু কথা শুনিতে হইল, কিন্তু জীবীর ভার তো কমিল, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

চারদিকে চাঁদনী রাত হাসিতেছিল। সিনেমা ও নাটকের একদিকে রাখা মৃদঙ্গগুলি এবং আকাশের গম্বুজের নীচে যেসব ভক্ত বসিয়াছিল তাহাদের কণ্ঠ মাটিতে আসীন ভক্তদের তন্ময় করিয়া অদৃশ্য লোককে একটু যেন চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছিল—

> 'আমার ধরণীকে করেছি সালাম,
> আমরা তো বিশাল আকাশের পাখি···'

ভগতজী সারা রাত্র জীবীকে সামলাইয়া রাখিলেও চিন্তায় কাটাইলেন। সকাল হইতেই গ্রামের দুই তিনজন রোগীর সঙ্গে জীবীকেও নাগধারার কাছে লইয়া যাওয়া হইল। ভগতজী এইসব তথাকথিত নিয়মকানুন মানিতেন না, তবুও তিনি দলটিকে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু নানা ছিল সকলের পিছনে। তাহার চোখ দেখিয়া মনে হইতেছিল সেও রাত জাগিয়াছে। তাহার কান তো এখনও মোটরের শব্দের অপেক্ষায় আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিছনের দিকে বার বার তাকাইতেছে।

নাগধারায় হাজার হাজার লোক পড়িয়াছিল। কেহ দুলিতেছিল, কেহ বা জল ছিটাইয়া অন্যকে দোলাইতেছিল। একে তো কড়া ঠাণ্ডা, অন্যদিকে প্রসারিত চাদরের মতো শীতল জল। উপর হইতে [illegible] আসিয়া বিঁধিতেছে জলের ছাঁট। ইহাতে ভাল লোকের উপর [illegible]

হইবে না তো কি? জীবী তো নদীতে নামিতেই চায় না। তীরে আবর্জনার মধ্যেই বসিয়া পড়িল। কিন্তু লোকেরা এমনিতেই ছাড়িয়া দিবার পাত্র কি না! একজন তো পাশের লোকের দেখাদেখি জীবীকে একটা লাথিও বসাইয়া দিল। তীরে দাঁড়াইয়া ভগতজী কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় পিছন হইতে আওয়াজ আসিল—'ওরে বেকুব!' দেখা গেল, রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া কাণজী আসিতেছে।

'ভালই করছিলেন ভগতজী!' বলিয়া জীবীর দিকে কাণজী অগ্রসর হইল। ঐ যুবক এমনভাবে সরিয়া গেল যেন কাণজীকে দেখিয়া ভীত হইয়াছে। কাণজী জীবীকে হাত ধরিয়া উঠাইল। মুহূর্তের জন্য তাহার মুখের দিকে দেখিতে থাকিল। জীবীর চক্ষে পলক পড়ে না দেখিয়া এক ভারি নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। উহাকে এক পাশে আনিল। গালে মাটি লাগিয়াছিল মুছাইতে গিয়া 'তোমার এ কি অবস্থা' বলিয়া সামনে কালী দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে বলিল—'কালী এর কাপড়টা বদলে দে না!' বলিয়া জীবীকে কালীর জিম্মা করিয়া দিল। ভগতজী ছাড়া জন পঁচিশেক লোক জীবীর প্রতি কাণজীর ব্যবহার প্রিয়তমা পত্নীর মতো দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কাণজীর ব্যবহার নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল।

ভগতজীর দিকে ফিরিয়া বলিল—'কখন এলেন ভগতজী! ওহো, হীরাও এসেছে!'

'এদের কাছে আমার কোন মূল্যই নেই' ভাবিয়া নানা বলিয়া উঠিল—'আরে বাঃ কাণা ভাই। আমি তো কাল রাত থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।'

'কি করি ভাই? মোটরে জায়গা পেলে তবে তো?' বলিয়া কাণজী নিরুপায় ভঙ্গীতে হাসিয়া নানার দিকে তাকাইল। সামনের দিকে মোটর আসিতে দেখিয়া কাণজী বলিল—'কালী তুই একটু তাড়াতাড়ি কর।'

হীরা বলিল—'কিন্তু তুই হঠাৎ এলি কোথা থেকে? না চিঠির জবাব দিস্ না ডাকলে আসিস।' বলিয়া হীরা ছোট ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'তুই একেবারে এমনি হয়ে গেলি কেন রে কাণজী!'

[illegible]কিন্তু আমি এসেছি তো। আমরা সকলে একত্র হয়েছি। এর [illegible] কি চাই?' এই বলিয়া কাণজী পাশে কাপড় পরিবর্তনে ব্যস্ত

কালীর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। নানার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখন যাবে, না কাল?'

কাল যখন জীবীকে নানার সঙ্গে দেখিয়াছিল তখনই ভগতজীর সন্দেহ হইযাছিল। কাণজীর দিকে তাকাইয়া বলিল—'তুই কি আজই ফিরে যাচ্ছিস্?'

'হাঁ ভগতজী। ফিরে তো আমার কাল রাত্রেই যাওযার কথা ছিল, কিন্তু মোটর শালাই দাগা দিল। জায়গা না পেলে আর কি করে আসা যায়?'

'কিন্তু তুই হঠাৎ কেন এলি আর কেনই বা যাচ্ছিস্। তোর কথা কিছু বুঝতে পারি না কাণজী।' বলিয়া ভগতজী উদাসভাবে দেখিতে লাগিল। কিন্তু এখন এ সমস্ত দেখিবার বা শুনিবার বেশি অবসর কাণজীর ছিল না। হাসিযা বলিল—'তুমি তো এমনি, ভগতজী। সব তো জানো। সংক্ষেপে ভাই···' বলিয়া জীবীর দিকে তাকাইযা বলিল—'এর দশা তো দেখেছ ভগতজী।' কালীর দিকে লক্ষ্য করিযা, 'একে একটু মহাদেব পর্যন্ত নিযে চল না কালী। নানা একটু সাহায্য কর না ভাই'—বলিতে বলিতে চলিল।

ধাঁধায় পড়িয়া নানা বলিল—'কিন্তু কাণা ভাই। তুমি তো একে নাগধারায় স্নান করিয়ে নিতে বলেছিলে। একবার স্নান করিয়ে নি, তারপর মহাদেব দর্শন···'

নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কাণজী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—'পাগল হয়েছিস? সারা জীবনটাই ওর জলে গেছে, এখন এতে স্নান করে কি হবে?' আর নানার দিকে শুষ্ক হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—'এর দিক থেকে আর আমারও দিক থেকেও একটা ডুব তুই দিয়ে দে!'—কাণজী চলিতে চলিতে বলিল।

'কিন্তু অন্য কারো ডুবে···'

কাণজী আবার মাঝখানে বলিল—'তার কি ঠিক আছে ভাই, কারোর স্নানে অন্য কারোর পাপ কি ধুয়ে যায়? নে কালী একটু তাড়াতাড়ি চল।'

ভগতজী ছাড়া কেহ বুঝিতেই পারিল না যে কাণজী কি করিতে চ[illegible]

কাণজীকে ভগতজী ও তাহার দল যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করিয়া চ[illegible]

তাড়াতাড়িতে কিছুটা আগাইয়া কাণজীই পিছন ফিরিয়া দেখিল আর ভগতজীকে বলিল—'ভগতজী তো বুঝতে পেরেছেন, আমি একে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ভগতজী এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া চিন্তাপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিলেন—'আমি জানি কাণজী, কিন্তু এখন তুই এই অবস্থায় কি সুখেই বা নিয়ে যাবি ?'

কাণজীর গতিবেগ মন্দ হইল। বলিল—'সুখের কথা তো এখন যেতে দাও। কিন্তু এই পর্যন্ত তো হবেই ভগতজী যে এখন যেখানে সেখানে খাবারের টুকরো কুড়িয়ে খায় তার থেকে নিজের কাছে রাখলে আমার বেশি শান্তি হবে। যেদিন আপনার চিঠি পেয়েছিলাম সেদিনই আসবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভেবেছিলাম আপনারা সকলে যদি গোলমাল করেন, সেইজন্য নানাকেও কিছু জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

পিছনে হীরা ছিল, সে যেন সদ্য নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল—'তবে কি তুই একে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছিস্ কাণজী ?'

কাণজী সেই দৃঢ়তার সঙ্গে কিন্তু নিরুপায় স্বরে বলিল—'হ্যাঁ হীরা !' আর পিছনে কালী ছিল। তাহাকে বলিল—'কালী একটু তাড়াতাড়ি কর !' হঠাৎ কি মনে হওয়ায় পকেট হইতে তিন টাকা বাহির করিয়া ভগতজীকে দিয়া বলিল—'এই পয়সা দিয়ে কালীকে এক জোড়া শাড়ি কিনে দেবেন।' আর কালীকে কিছু বলিবার পূর্বেই তাহার নজর পড়িল মোটরের উপর, এখনই তাহা যেন রওনা হইবে। 'থাম' বলিয়া ডাক দিল। মোটরকে থামিতে দেখিয়া পিছনে তখনই ফিরিল। বক্ বক্ করিতে করিতে জীবী চলিতেছিল—জীবীর হাত ধরিয়া সে সামনে টানিয়া আনিল। মোটরের নিকটে আসিতেই দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া মোটরে চড়াইয়া ভগতজীর দিকে চাহিয়া বলিল—'ভগতজী ! হীরা ! বেঁচে থাকলে দেখা হয় কি না হয়, কিন্তু কখন কখন মনে তো করবেই। আমার দাদার কাছে…।' গলা পরিষ্কার করিয়া—'আমার দিক থেকে মাপ চেয়ে বলবে যে…' ইহার চেয়ে বেশি কিছু সে বলিতে পারিল না। আবার ফিরিয়া সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল। হতবুদ্ধি হীরা বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু ওরে [redacted]ী, না জাত, না পাঁত, তোর কি এমন করা উচিত ?'

[redacted]ওয়ালা বলিল—'ওঠ বসে পড়, পেট্রোল পুড়ছে।' কাণজী

মোটরের উপর পা রাখিতে রাখিতে এইটুকুই বলিল—'কেন আমার কি করা উচিত ছিল, হীরা? সে দিন অন্ধকার রাত্রে ও যে পিছনে পিছনে এসেছিল, সে কার মুখ চেয়ে?'

সমস্ত রাস্তা ধূলা উড়াইতে উড়াইতে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছিল। তাহার দিকে বিদ্যুৎ চমকে স্থির হইয়া যাওয়ার মতো চোখে দলের লোকেরা—'এ কি হইল।' বলিয়া চিন্তায় মগ্ন হইল।

সর্বপ্রথমে এক ভারি দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে ভগতজীই এই কথা বলিলেন—'ওর আর কিই বা হতে পারত। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন হল।'

হীরা নানার দিকে কাতর নয়নে এমন ভাবে দেখিতেছিল যেন এ সমস্ত ব্যাপারে তাহারই কৃতিত্ব। ভগতজী কুমার কানাইয়ার মতো কাণজীর জীবন ও তাহার উপর দুঃখের বোঝা যে চাপিল সে বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর কালীর নিজেরই চিন্তা ছিল—'হায় হায় রাঁড় আমার কাপড়টাও নিয়ে গেল।'

যখন সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল তখন সম্মুখে সমুদ্রের মতো মানবমেদিনী গর্জন করিতেছিল। পিছনে পাহাড়ের ঢালু প্রদেশ দিয়া উপরে মোটরের ঘ-র্-র-ঘ-র্-র্ আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। আর শেষে তো উহাও যেন বর্তমান মহাকালের প্রভাবে লীন হইতেছিল—এমন গভীর হইতে গভীরে···

পাহাড়ের মধ্যে উন্নতশির সমাজের দিকে তাকাইয়া এক ভারি শ্বাস লইয়া ভগতজী বলিলেন, 'বা রে মানুষ, তোর হৃদয়, একদিকে রক্তের কুলকুলি অন্যদিকে প্রীতির কুঞ্জ।' আর আকাশের দিকে আঙুল উঠাইয়া মন্দিরের শিখরে কলসের দিকে দেখাইয়া রহস্যময় হাসি হাসিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত